উমরাওজান

১৩৬৭

সুবর্ণরেখা
কলিকাতা

প্রথম প্রকাশ : ১লা বৈশাখ ১৩৬৭

প্রচ্ছদপট : কৃষ্ণেন্দু চাকী

প্রকাশক : ইন্দ্রনাথ মজুমদার
সুবর্ণরেখা ৭৩ মহাত্মা গান্ধি রোড কলিকাতা ৯

মুদ্রাকর : তারাশঙ্কর চৌধুরী
জে ডি প্রেস, ৫২এ কৈলাস বসু স্ট্রিট কলিকাতা ৬

মুখবন্ধ

লোকে আজও বলে, 'বানারস্ কা সুবহ্,' আর 'লখনৌ কা শাম্'। এই দুই শহরের দুটি অপরূপ রূপ।

বারণসীতে শান্ত স্নিগ্ধ প্রভাত মন্দ্রিত হয়ে ওঠে বেদগানে, স্তোত্র পাঠে।

আর সন্ধ্যের লখনৌ রণিত হয় চকিত হয় নৃত্যপরা নটিনীর নূপুরনিক্কণে। জলসা, মুশায়ারা, মজলিশের ঝাড়-লণ্ঠন, 'শমার' দীপ্ত আলোকরশ্মিতে।

আজকের উদ্যানময়ী লখনৌ-এ দূর অতীতের রহস্যময়ী, হাস্য-লাস্যে ভরা সেই নটিনীর নূপুরনিক্কণে তেমনি করে হয়ত-বা সন্ধ্যে ঘনিয়ে আসে না, তবে তার রসের কিছুটা আস্বাদ মিলবে 'উমরাওজান অদা'র বাস্তব জীবনভিত্তিক এই উপন্যাসে।

ভারতের বহুবর্ণবৈচিত্র্যময় জাতীয় সংস্কৃতিতে পারস্পরিক মেলবন্ধনের প্রচেষ্টায় এই চিরায়ত উর্দু উপন্যাসটি যা ১৮৯০ সালে ১৮৬৫ সালে প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনা'র মতোই প্রচণ্ড আলোড়ন তুলেছিল। মুসলিম সমাজে ও সাহিত্যে তার মূলানুগ অনুবাদ লাহোর সংস্করণ থেকে করতে গিয়ে যে চিন্তা-ভাবনায় নিয়ত তাড়িত হয়েছি তার পটভূমিটি এই :

খ্রীষ্টীয় একাদশ শতকের একবারে গোড়ার দিকে দিল্লির সুলতানশাহী প্রথম মুসলমানী আধিপত্য কার্যকরভাবে কায়েম করে ভারতকে কালক্রমে মুসলিম জগতের প্রভাবের বৃত্তে নিয়ে আসে যেমন রাজনৈতিকভাবে তেমনি সাংস্কৃতিক দিক থেকেও। সুলতানশাহীর আমলে ইসলামই হয় রাষ্ট্রীয় ধর্ম, আর আরবি ও ফার্সি ভাষা হয়ে ওঠে দরবারী ভাষা।

এই আমলের প্রধান মুসলিম কবি আমির খশরু ত্রয়োদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে (১২৫৩-১৩২৫) জন্ম নিয়ে চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম পর্ব পর্যন্ত ছিলেন সাহিত্য জগতের দীপ্ত সূর্য। ইনি ফারসি ভাষায় কাব্য রচনা করা ছাড়াও উর্দুতেও কবিতা রচনা করেন। আর এই উর্দু ছিল আরবি খাড়ি বোলি ইত্যাদি ভাষা মিশ্রিত, যাকে ইনি বলতেন 'হিন্দাবি'।

এমনিধারাই চলতে থাকে কয়েক শতাব্দী। চতুর্দশ শতকে মূল্যবান ঐতিহাসিক তথ্যগুলি সংকলন করতে গিয়ে জিয়াউদ্দিন বারানি ও শামস্ সিরাজ আফিফ্ সৃষ্টি করেন ফারসি আদর্শ গদ্য রচনা। এই ঐতিহাসিক সংকলনটির নাম দেন এঁরা তৎকালীন সম্রাট ফিরোজশাহ্ তুঘলকের সম্মানে 'তারিখ্-ই-ফিরোজশাহী'।

মুঘলশাহীর আমলে ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে সপ্তদশ শতাব্দী ও অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত ফারসি কবিতার চারটি স্তম্ভের অনেকেই সমকালীন রাজনৈতিক অস্থিরতার জন্য পর্যায়ক্রমে দিল্লি লখনৌ-এর রাজদরবার ও নবাব দরবারে সভাকবি হিসেবে কাব্য রচনায় নিমগ্ন থাকেন। এবং এঁদের অনেকেরই কবিতায় 'সুফী'বাদী প্রভাব প্রকট হয়ে ওঠে।

কিন্তু ১৮৫৭ সালের ব্যর্থ সিপাহী বিদ্রোহের পর ভারতের শেষ মুঘল সাম্রাজ্যের অবলুপ্তি ও সামন্ততান্ত্রিক প্রভুদের ক্ষমতা খর্ব হওয়ায় রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পটভূমি ও পরিপ্রেক্ষিতের আমূল পরিবর্তন ঘটে।

১৮৫৭ সালের অভ্যুত্থানটির পরাজয় ঘটলেও এর প্রধান চালিকাশক্তি ছিল কৃষক, কারুশিল্পবিদ ও সৈনিকরা। আর বিক্ষুব্ধ সামন্ততান্ত্রিক প্রভুদের কেউ কেউ করেছিলেন সহযোগিতা। এখানে লক্ষণীয়, এই কৃষক, কারুশিল্পবিদ ও শহুরে বণিকরা 'সুফীবাদে'র সমর্থক ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। 'সামন্তবাদী প্রভু'দেরও কেউ কেউ এর মানবিকতায় আকৃষ্ট হন ও পৃষ্ঠপোষকতা করেন।

তাই পরবর্তী কালে ভারতীয় জনজীবনে এর প্রভাব পড়ে প্রভূত আর সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রও এর থেকে বাদ যায়নি।

মির্জা মহম্মদ হাদি রুশোয়া ভূমিষ্ঠ হন লখনৌ-এ ১৮৫৭তেই। এঁর তেত্রিশ বছর বয়সে প্রকাশিত 'উমরাওজান অদা' উর্দু গদ্যসাহিত্যেই শুধুমাত্র সমৃদ্ধি আনেনি ভারতীয় সংস্কৃতির ত্রিবেণীধারায়ও তীব্র গতিবেগ সৃষ্টি করেছে। কিন্তু তৎকালীন মুসলিম মৌলবাদী যাজক সম্প্রদায় ও হিন্দু উন্নাসিক পণ্ডিতরা একে উপেক্ষা করলেও মুসলিম জনমানসে এটি একটি বিশেষ মর্যাদার আসন পায়। উর্দু কাব্যসাহিত্যে 'দবিরে'র খ্যাতি তখন মধ্য গগনে আর রুশোয়া গদ্যসাহিত্যে আনলেন নতুন রং ও ঢং। লখনৌ-এ নবাবী আমলের শেষ অধ্যায়ে নবাবদের অন্দরমহল থেকে সুরু করে, তাঁদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক আচার-আচরণের সাথে দেহপসারিণী, গুণ্ডা, চোর-ডাকাত ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিবেশের তথ্যসমৃদ্ধ এক অপূর্ব আলেখ্য আঁকলেন তিনি।

উমরাওজান ও লেখকের কথাবার্তার পরিসরে যে উপন্যাসটির আঙ্গিক গড়ে উঠল তার মর্মবস্তুটি ফুটে ওঠে এই কয়েকটি ছত্রে—

চিত্রকরে হেসে হেসে বুদ্ধিহরা
সে রমণী কয়
তুমি আজ পেয়েছ যে আমার
জীবন-পরিচয়,
তোমার লেখায় যেন ঠিক তার
প্রতিচ্ছবি রয়।

ভারতের দুটি বৃহৎ ধর্মীয় সম্প্রদায়, হিন্দু ও মুসলিম, যা আবার ক্ষেত্র বিশেষে

কালক্রমে একটি জাতি গঠনেরও গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে দেখা দিয়েছে, তাদের ঐতিহ্য, আচার-ব্যবহার, সামাজিক রীতি-নীতি উভয় সম্প্রদায়ের জনসাধারণ আমরা পরস্পর বিশেষ কিছুই জানিনে। এই জানা-বোঝার কাজে কণামাত্র সহায়তা করার দুর্নিবার আগ্রহই আমাকে অবিরত তাড়না করে ফিরেছে এই অনুবাদ করতে।

এই অনুবাদের কাজে সর্বপ্রথম যাঁর অকৃপণ সমর্থন ও সহযোগিতা পেয়েছি তিনি হচ্ছেন বর্ষীয়ান জননেতা, প্রাবন্ধিক মুর্শিদাবাদের শ্রদ্ধেয় রেজাউল করিম সাহেব। আমার সুহৃদ, ভ্রাতৃপ্রতিম, পথপ্রদর্শক কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কাছে আমি চিরঋণী প্রথম যৌবনের সুরু থেকে আজ অবধি। এবিষয়ে তাঁর মূল্যবান সময় দিতেও তিনি কার্পণ্য করেননি। বন্ধুবর রাধু গোস্বামী, রামকৃষ্ণ গোস্বামী, জেলা সমাজশিক্ষা আধিকারিক প্রণব নিয়োগী, এঁরা প্রত্যেকেই তাঁদের অকুণ্ঠ সহযোগিতা ও অকৃত্রিম অনুপ্রেরণা না যোগালে বইটির অনুবাদ হয়ত শেষ পর্যন্ত শেষ করাই হত না। 'সপ্তাহ' পত্রিকার সকলেই আমাকে অনবরত উৎসাহ দিয়ে পত্রিকায় বইটির ধারাবাহিক প্রকাশ করেন। এঁদের সকলের কাছেই আমি কৃতজ্ঞ। ধন্যবাদ বইটির প্রকাশক শ্রীইন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয়কেও।

এখন ভারতীয় জাতীয় সংহতি গড়ে তোলার মতো ব্যাপক দুরূহ সেতু-বন্ধনের কাজের ক্ষুদ্র একটি অংশে যদি কাঠবেড়ালী-প্রচেষ্টা আমার পাঠকবর্গের কাছে সামান্যতম সমাদরও পায় তবে নিজেকে ধন্য মনে করব।

লেখক পরিচিতি

মির্জা মহম্মদ হাদি রুশোয়ার জন্ম ১৮৫৭ সালে লখনৌ-এ। রুশোয়া বলেন, তাঁর পূর্বপুরুষরা এসেছিলেন পারস্য থেকে। তাঁর প্রপিতামহ অযোধ্যার নবাবের সেনাবাহিনীতে ছিলেন অ্যাডজুট্যাণ্ট। অযোধ্যার যে গলিতে তাঁর পরিবারবর্গ বাস করতেন আজো লোকে সেটিকে বলে 'অজিতুন কা গলি'।

ষোল বছর বয়সে মা-বাবাকে হারিয়ে রুশোয়া লালিত-পালিত হন তাঁর মাতুল হায়দর বখ্‌শের কাছে। তিনি ছিলেন তাঁর সময়ের বিখ্যাত হস্তলিপি বিশারদ। মাতুলটি যেমন রুশোয়াকে সস্নেহে লালন-পালন করেন তেমনি ভাগ্নেটির প্রচুর পৈতৃক বিষয়-আশয় নষ্ট করেন। আর শেষ পর্যন্ত রাজস্ব টিকিট জাল করার দায়ে দীর্ঘ মেয়াদে জেলে যান।

ম্যাট্রিকুলেশন পাস করে রুরকির টমসন ইনজিনিয়ারিং কলেজ থেকে ওভারসিয়রের ডিপ্লোমা নিয়ে রুশোয়া বেলুচিস্তানে রেললাইন বসানোর চাকরিতে যান। কিন্তু কিছুকাল পরেই সরকারি চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে লখনৌ-এ ফেরেন। এবার শুরু হলো শিক্ষকতা আর লেখা। তাঁর সাহিত্যগুরুদের একজন হলেন প্রখ্যাত উর্দু কবি 'দবির'।

মাতৃভাষা উর্দু ছাড়াও অসাধারণ মেধাবী রুশোয়া জানতেন ফারসি, আরবি, হিব্রু, ইংরেজি, লাতিন ও গ্রীক্ ভাষাও। সাহিত্য ছাড়াও তাঁর আগ্রহ ছিল জ্যোতির্বিদ্যায়, উচ্চতর গণিতে, ধাতুবিদ্যায়, তরল পদার্থের গতিবিজ্ঞানে ও রসায়নে।

১৮৮৭ সালে তিরিশ বছর বয়সে তাঁর প্রথম রোমান্টিক কাব্যগ্রন্থ 'লায়লা-মজনু' প্রকাশিত হয়। কিন্তু সমাদর লাভে এটি ব্যর্থ হয়। তারপর ১৮৯০ সালে 'উমরাওজান অদা' প্রকাশিত হয়ে উর্দু সাহিত্য জগতে তুমুল আলোড়ন তোলে। বলা যায়, বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী'র মতোই। বয়স তাঁর তখন তেত্রিশ। পঁচাত্তর বছরের সুদীর্ঘ জীবনে বিভিন্ন বিষয়ে তিনি লিখেছেন প্রচুর। তাঁর জীবিতকালেই তিনি এক প্রবাদ-পুরুষ হয়ে ওঠেন।

বিলাসী ও ইন্দ্রিয়সুখপরায়ণ এই ব্যক্তিটি ছিলেন কঠোর পরিশ্রমী আর খেয়ালী। ১৯৩১ সালের ২১ অক্টোবর তিনি টাইফয়েডে মারা যান হায়দরাবাদের ওসমানিয়ায়। তাঁর আরেকটি বিখ্যাত উপন্যাস হলো 'আখতারি বেগম'।

প্র স্তা ব না

আমারও কত না মজার ঘটনা
স্মৃতিতে রয়েছে ধরা
কিন্তু তাদের পরিণতি আজ
শোকের স্মরণ করা।

পাঠক! এই কাহিনীটির অপূর্ব আবির্ভাব ঘটে এইভাবে—

দিল্লির শহরতলির বাসিন্দা আমার বন্ধু মুনশী আহমদ্ হোসেন দশ বারো বছর আগে ভ্রমণক্লান্তি দূর করার মানসে লখনৌ-এ পদার্পণ করেন। চকে বারবণিতা পাড়ায় সৈয়দ হোসেনের ফটকের পাশে একখানি ঘর ভাড়া নিলেন তিনি। এখানে সন্ধ্যের শুরুতেই আকছার জ্ঞানী-গুণীর সমাগম হতে থাকে। মুনশী সাহেবের রুচি ছিল খুব উঁচু পর্যায়ের। নিজেও কখনো-সখনো কিছু বলতেন। আর বলতেন ভালোই। কিন্তু শোনার আগ্রহটাই ছিল প্রবল। তাই হরদম কবিতার চর্চা হতো। এই ঘরখানির পাশাপাশি ছিল আরেকটি ঘর। সেই ঘরে থাকতেন এক শিক্ষিতা বাঈজী। এই ব্যবসায়ের অন্য পাঁচজনার চেয়ে এঁর চালচলন ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। না কেউ এঁকে কোনো দিন রাস্তামুখে বসে থাকতে দেখত, না ছিল এখানে কারো যাতায়াত। দরজায় থাকত দিনরাত পর্দা ঝোলানো। চকের দিকের বাইরে যাওয়ার রাস্তা একদম বন্ধ। গলির দিকের দরজা দিয়েই নোকর-চাকরের ছিল আসা-যাওয়া। আর যদি মাঝে মাঝে কোনো গানের আওয়াজ না পাওয়া যেত তবে এখানে কেউ আছে কিনা তা মালুমই হতো না।

যে ঘরখানিতে আমাদের আড্ডা জমত সেই ঘরে একটি ছোট্ট জানালা ছিল। কিন্তু সেটি থাকত বন্ধ।

একদিন তো যথারীতি জলসা চলেছে। গজল পড়া হচ্ছে আর সভার লোকে বাহবা দিচ্ছে। আমি একটি কবিতা পাঠ করতেই ওই জানালার দিক থেকে আহ্, আহ্, তারিফ ভেসে এল। আমি চুপ মেরে গেলাম। আর সভাস্থ সকলেরই মনোযোগ গেল সেই দিকে। মুনশী আহমদ হোসেন চেঁচিয়ে বললেন, 'আড়াল থেকে বাহবা দেয়া ঠিক নয়। কাব্য চর্চার শখ থাকে তো এই সভায় এসেই আমাদের কৃতার্থ করুন না!' এর কোনো জবাব মিলল না। আমি পুনরায় গজল পড়া শুরু করে দিলাম। পড়া শেষও হয়ে গেল। এর কিছুক্ষণ পরেই একজন চাকরানী এসে জিজ্ঞেস করল, 'আপনাদের মধ্যে মির্জা রুশোয়া সাহেব (হচ্ছেন) কে?' সভার লোকে আমাকে দেখিয়ে দিল। চাকরানী বলল, 'বিবি সাহেবা আপনাকে একটু স্মরণ করেছেন।' আমি বললাম, 'কে বিবি

সাহেবা ?' চাকরানী বলল, 'বিবি সাহেবা নাম জানাতে নিষেধ করেছেন। এখন আপনার যেমন আজ্ঞা।' চাকরানীর সাথে আমি যাওয়াই ঠিক করলাম। সভার সকলেই আমার সাথে ঠাট্টা শুরু করে দিল, 'হ্যাঁ সাহেব, কেন নয় ? জনাব নিশ্চয়ই বিবি সাহেবার সাথে আগে থেকেই পরিচিত, নচেৎ এইভাবে ডেকে পাঠান কেমন করে ?' মনে মনে ভাবতে শুরু করে দিলাম, কে এমন পরিচিত আমার ! এদিকে চাকরানীটি বললে, 'হুজুর, বিবি সাহেবা আপনাকে বিলক্ষণ চেনেন। তবেই তো আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছেন।' শেষ পর্যন্ত যেতেই হলো। দেখেই চিনতে পারলাম, উমরাওজান অদা !

উমরাওজান : আঃ (দেখামাত্রই) আপনি তো দেখছি ভুলেই গেছেন !

আমি : কেমন করে বুঝব, আপনি এই ককেশাস্ পর্বতেই হাজির আছেন ?

উমরাওজান : আমি তো আকছার আপনার স্বর শুনি, কিন্তু ডাকার সাহস হয়নি। আজ আপনার গজল শুনেই বেসামাল হয়ে পড়লাম, আর হঠাৎ মুখ থেকে আহ্ শব্দটি বেরিয়ে গেল। কোনো একজন সায়েব বললেন, 'এদিকে আসুন' নিজের জায়গাতেই নিজে লজ্জিত হয়ে পড়লাম। জিভে এল, চুপ করে থাকি কিন্তু মন মানলে না। তাই পুরনো পরিচয়ের সূত্রে আপনাকে কষ্ট দিলাম । মাফ করবেন। আচ্ছা, ওই কবিতাটি আবার একটু পড়ুন তো ?

আমি : মাফ তো কিছুতেই করা যাবে না। আর কবিতাও পড়ব না। তবে আপনার শখ হয়তো ওখানেই সশরীরে চলুন।

উমরাওজান : যেতে আমার কোনো আপত্তি নেই। তবে সেখানে অন্য কোনো সায়েবের অস্বস্তির কারণ না হয়ে উঠি।

আমি : আপনার মাথা ঠিক আছে তো ? সেরকম জায়গায় আপনাকে যেতে বলছে কে ? ঘরোয়া সভা, আপনার আগমনে সেটি আরও স্বাদিষ্ট হয়ে উঠবে।

উমরাওজান : তা না হয় হলো, কিন্তু যেন খুব বেশি ঘরোয়া না হয়ে পড়ি।

আমি : আজ্ঞে না, আমি ছাড়া আর কেউ ততটা হতে পারবেন না।

উমরাওজান : আচ্ছা, তবে কাল আসব।

আমি : এখনই নয় কেন ?

উমরাওজান : দেখছেনই তো কী অবস্থায় বসে আছি।

আমি : ওখানে তো কোনো গানের আসর বসছে না। ঘরোয়া আড্ডা মাত্র। চলে চলুন।

উমরাওজান : ওঃ মির্জা ! আপনার কথার জবাব দেয়া মুশকিল ! আচ্ছা, চলুন। আমি আসছি।

আমি উঠে চলে এলাম। কিছুক্ষণ পরেই শাড়ি বদলে চুল আঁচড়ে উমরাওজান সাহেবা হাজির হলেন। গুটি কয়েক কথায় সভার সকলকে এঁর কবিতা ও গানের চমৎকারিত্বের ব্যাখ্যা করে দিলাম। সকলে ভীষণ আকৃষ্ট হয়ে গেলেন। আড্ডায়

আসার সময় ওঁর ধারণা ছিল যে সকলেই নিজ নিজ লেখা পড়বেন, উনিও পড়বেন। বাস্তবিক পক্ষে এটা একটা চমৎকার জলসা হয়ে পড়ল। সেই দিন থেকেই উনি হরদম সন্ধ্যেবেলায় আসতেন। আর একঘণ্টা দুঘণ্টা বসে থাকতেন। কখনো-বা কবিতা পড়া হতো, কখনো-বা উনি গাইতেন গান। সভা খুশিতে মশগুল হয়ে যেত। এই রকম একটি জলসার কথা এখানে লিখছি। এই রকম মুশায়ারায় কেউ গোলমালও করত না, বা কেউ অনুরোধও জানাত না। স্রেফ নির্ঝঞ্ঝাট আড্ডায় সকলেই নিজ নিজ তাজা লেখা গজল পড়তেন।

কবিতা পাঠের আসর—মুশায়ারা

কাকে এ দগ্ধ হৃদয়ের কথা
বলা যায় প্রাণ খুলে
কালের চলার পথে আমি এক
হায়রে বাউণ্ডুলে।

রুশোয়া: কী আর বলব, উমরাওজান সাহেবা এই কলিটি তো আপনি অবস্থানুযায়ী বলেছেন। অন্য কোনো কবিতা পড়বেন না কেন?

উমরাওজান: সেলাম, মির্জা সাহেব আপনার মাথার দিব্যি। এই ক'টি কলি মাত্র মনে আছে। খোদা জানেন, কবেকার কথা এটি। মুখের কথা আর কতদিনই-বা মনে থাকে? খাতায় টুকে না রাখলে সবই হারিয়ে যায়।

মুনশী সাহেব: আর ঐ ছত্রটি কী, আমি তা শুনিনি।

রুশোয়া: আপনি তো তদারকিতেই ডুবে রয়েছেন, শোনে কে?

এতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই যে, আজকের জলসার জন্য মুনশীজী বড় পরিপাটি করে ব্যবস্থা করেছেন। গরম কাল। রোদ প্রচণ্ড কড়া। সন্ধ্যে পর্যন্তও ভীষণ গরম। ঘরে জলের ছিটে দিয়ে মেঝেতে সাদা কার্পেট বিছিয়ে দেয়া হয়েছে। বারান্দায় সারি দিয়ে রাখা কুমোর বাড়ি থেকে সদ্য আনা কুঁজো-গুলোতে যেন তাজা মাটি ও জলের গন্ধ। পানগুলি সুগন্ধি। হুঁকাগুলিতে জড়ানো ফুলের মালা। আর তামাকের গন্ধে সারা পরিবেশটি আমোদিত। চাঁদের কিরণ ছাড়া আর একটি মাত্র মোমবাতির শিখা কাঁচের ঢাকনিতে কাঁপছে 'শমা'। যিনি যখন আবৃত্তি করছেন, তাঁর সামনেই তখন এই 'শমা' রাখা হচ্ছে।

কবিতা পড়া চলছে।

মুনশী সাহেব: তা বেশ আপনিই বন্দোবস্ত করুন, বান্দা কবিতা শুনবে।

রুশোয়া: মাফ করুন! এই মাথা-পাগল-করা কাজ আমার দ্বারা হবে না।

মুনশী সাহেব: আচ্ছা, ঐ কলিটি কী ছিল?

উমরাওজান: আমি পেশ করছি:

পুজো-আর্চার পথ গেছি ভুলে
পৌঁছে কাবায়
তবু বিশ্বাস রয়েছে অটুট
খোদার কৃপায়।

মুনশী সাহেব : খুব বলেছেন!

খান সাহেব : চমৎকার কলি বলেছেন, কিন্তু এই যে 'ভুলে গেছি'—কেন?

উমরাওজান : কী হয়েছে খান সাহেব, আমি পঙক্তি বলছি—

খান সাহেব : খোদার কৃপায় পঙক্তিটির মধ্যেই তো রয়েছে স্বাদ। আপনারই মুখ থেকে শুনে ভালো লাগছে।

রুশোয়া : ব্যস, আপনার উৎপাত শুরু হয়ে গেল। নিন, কবিতা শুনতে দিন খান সাহেব! সবাই যদি আপনার মতো দার্শনিক হন তবে তো কাব্য পাঠের মজা চলে যাবে।

প্রত্যেকটি ফুলের রং ও গন্ধ পৃথক।

খান সাহেব : (কিছুটা পেঁচার মতো মুখ করে) ঠিক!

রুশোয়া : উমরাওজান, বেশ, আর কোনো গজল পড়ুন।

উমরাওজান : দেখুন, মনে পড়লে বলছি। (কিছুক্ষণ বাদে)

বিরহের রাত হয় অফুরান। (সমবেত কণ্ঠে) ওয়াহ্, ওয়াহ্! শোভানাল্লা! কী আর বলি?

উমরাওজান : (নমস্কার করে) এই কবিতাটিতে মনোযোগ দিন :

চাইলে চেঁচিয়ে
আকাশ ফাটাতে পারো
তবু সে নালিশ
কানে যাবে না কো কারো।

রুশোয়া : কী চমৎকার কবিতা পড়লেন! (সভার সকলেই তারিফ করলেন।)

উমরাওজান : আপনাদের কৃপা। নমস্কার, নমস্কার।

প্রভু : তোমার গলির গরিবসর্বহারা
ধন-দৌলত গ্রাহ্য করে না তারা॥

সভার সকলে বেশ, বেশ।

উমরাওজান : নমস্কার।

কিছু-না কিছুতে প্রাণ ঢেলে দেওয়া
জেনো দরকার বিস্তর
নইলে জীবন থোড়-বড়ি-খাড়া
আর খাড়া-বড়ি-থোড়।

রুশোয়া : আহ্ খান সাহেব! এই কবিতাটিতে মনোনিবেশ করুন।

খান সাহেব : শোভানাল্লা, সত্যি কী কবিতাই না শোনালেন!

উমরাওজান : শ্রদ্ধেয়রা সকলেই আমার সম্মান বাড়িয়ে দিচ্ছেন। নইলে আমি-বা কে আর আমার আসল বনিয়াদই-বা কী।

সে আবার ফিরে আসবেই ঠিক।
সেই ভরসায়
সর্বক্ষণ রেখেছি নজর
খোলা দরজায়॥

খান সাহেব : এটিও বেশ বলেছেন।

পণ্ডিতজী : কী চমৎকার প্রকাশের ঢং।

উমরাওজান : (নমস্কার করে) কোন্ আশায়-বা
রাখি আজ আমি নজর
টানে না আমাকে
কোনো অভিযোগ ওজর।

খান সাহেব : কেমন সুন্দর বললেন! ফারসি টপ্ টপ্ ঝরে পড়ছে।

মুনশী সাহেব : যা-ই হোক-না কেন, রচনাটি সুন্দর।

উমরাওজান : নমস্কার,
হে নিষাদ,
বাঁধা পড়ে যে প্রেমের জালে
কখনো আকাশে
বল, সেকি পাখা মেলে?

সভাজন : বেশ, বেশ!

উমরাওজান : নমস্কার,
সত্যি-সে কেন
হায়, ভুল করে
আমার এহাল আনে না নজরে

খান সাহেব : হ্যাঁ, হওয়া দরকার। বেশ বলেছেন।

উমরাওজান : উপসংহারটিতে মন দিন—
অদা কখনই এ কথা মানে না।
মনের খবর মন জানে না॥

খান সাহেব : উপসংহারটি কী বললেন। এটি আপনি আপনার নিজের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করলেন। আর লোকের রায় এর উল্টো।

উমরাওজান : ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার রকমটি যা-ই হোক-না কেন, আমি একটি কবিতা বলেছি।

রুশোয়া : বেশ, আবার একটু পড়ুন তো। [উমরাওজান পুনরায় পড়লেন।] আমার তো মনে হয় এই রচনার দুটো দিকই এই কবিতায় বেরিয়ে আসতে পারে।

খান সাহেব : আসল কথাটি মির্জা সাহেব কি বলছেন ?

সভ্যজনগণ : গজলটির প্রথম লাইন থেকে শেষ অবধি একই রং।

আগা সাহেব : বিষয়টি প্রকাশের ঢংটিই দেখুন।

পণ্ডিত সাহেব : কেমন আলোকপাত করেছেন।

উমরাওজান : (উঠে দাঁড়িয়ে) নমস্কার।

মুনশী সাহেব : এবার আপনার কিছু নির্দেশ।

খান সাহেব : মশায়, মাফ্ করুন। আমার কিছুই মনে পড়ছে না।

রুশোয়া : কিছু তো পড়ুন !

খান সাহেব একটির প্রথমাংশ আর দুটি কবিতা পড়লেন।

মেলে না শরাব
হায় এক ফোঁটা
রাত্রে তোমার
অবকাশ কোথা ॥

রুশোয়া : কী চমৎকার তির্যক ! অর্থাৎ চতুর্দশীর রাত।

খান সাহেব : নমস্কার,

কবিতায় মেলে কেবল মুখের
তারিফ দেদার
তাদের মধ্যে উপুড়-হস্ত
হচ্ছে কে আর ?

রুশোয়া : চমৎকার তির্যক ? অর্থাৎ শুক্লা চতুর্দশীর রাত।

খান সাহেব : নমস্কার,

হালকা স্বভাবে তার
বাসনা আমার
আগে মিটে যেত
মেটে না কো আর।

রুশোয়া : এ কবিতার জবাব নেই।

খান সাহেব : নমস্কার।

(এরপর জনৈক সাহেব হাজির হলেন। হাতে তাঁর লণ্ঠন।)

খান সাহেব : কে এই সাহেবটি ? জোছনা রাতে লণ্ঠনেরই-বা প্রয়োজন কী ?

নবাব সাহেব : হুজুর, বোকামি তো হয়েছে, মাফ করবেন।

খান সাহেব : কিছু মনে করবেন না নবাব সাহেব। যা হবার হয়ে গেছে।
(নবাব সাহেব হাজির হলে সকলেই সম্মান দেখালেন। গজল পড়ার ফরমাশ হলো।)

নবাব সাহেব : আমি তো আপনাদেরই আকর্ষণে হাজির হয়েছি। আমার যে কিছুই মনে নেই।

শেখ সাহেব : জনাব, গজল পড়তেই হবে।

নবাব সাহেব : আচ্ছা, যা কিছু মনে আসছে, তুলে ধরছি—

মদনের বান
ছুঁড়ে বার বার
হৃদয় গাঁথে বা
একটিতে তার।

সভার সকলে : আহ্, কী কবিতাই বললেন!

নবাব সাহেব : নমস্কার। (এরপর চুপ করে রইলেন।)

রুশোয়া : আর কিছু নির্দেশ দিন!

নবাব সাহেব : হায় আল্লা, আর কিছু মনেও আসছে না।

মুনশী সাহেব : এবার আপনার বাগ্মিতার প্রকাশ দেখি।

পণ্ডিতজী : দু-তিনটে কবিতা নমুনা হিসেবে উপস্থিত করছি—

দোঁহে এক হলে মাঝখানে এসে
হানা দেয় অমনি সে
এ পোড়া কপালে মধুর পানীয়
পরিণত হয় বিষে।

সভার সকলে : বাহবা!

পণ্ডিতজী : মৌলবীর ধর্ম চর্চা
সে তো শুরু হালে
জেঁকে বসে আছে মূর্তি কাবায়
সেই কোন্ কালে।

নবাব সাহেব : আমি বলতে পারিনে। তবে বলেছেন বেশ।

পণ্ডিতজী : বলুন আর না-ই বলুন, কথাটি খাঁটি। এই কবিতাটিতে মন দিন—

সত্যের পদচিহ্নে কেবল
যে মাথা নোয়ায়,
সে নকিব হেঁট হয় না কখনও
আর কারো পায়।

সভার সকলে : বেশ, বেশ।

পণ্ডিতজী : দিস্তা দিস্তা তার চিকুরের
লিখে প্রশস্তি
হয়েছি বেদম হয়রান
কী অস্বস্তি।

রুশোয়া : এটি খাস লখনৌয়ি রসিকতা।

পণ্ডিতজী : আপনি আবার দিল্লির হলেন কবে?

রুশোয়া : আচ্ছা, কবিতা পড়ুন। আমি তো মাত্র কথার কথা বলেছি।

পণ্ডিতজী : আরম্ভে ছিল হৃদয় গোলাপ
বাসনার উদ্যানে
আজ সেই মনে তৃণ-কণ্টক
ব্যথা ও বেদনা আনে।

নবাব সাহেব : দেখুন, কেমন কবিতা পড়েছেন।

খান সাহেব : ভাবের গভীরতার দিকে মনোনিবেশ করুন।

পণ্ডিতজী : শেষ পঙক্তিটি শুনুন—
হে অদা করোনি
সে ঋণ স্বীকার।
পেয়েছ খোদার
করুণা অপার॥

খান সাহেব : শোভানাল্লা, লোকের আনন্দবর্ধক, উপকারক।

রুশোয়া : খান সাহেব, আপনার জন্যে কবিতা পড়াও মুশকিল।

সভাজনরা : শোভানাল্লা, কী গজলই না পড়লেন!

পণ্ডিতজী : আপনার কৃপা, প্রতিপালন, প্রভুত্ব, হে আল্লা, আপনিই লোকের অন্নদাতা।

মুনশী সাহেব : আপনি, শেখ সাহেব, এবার আপনি কিছু নির্দেশ করুন।

শেখ সাহেব : (মুচকি হেসে) জী আমার তো কিছুই মনে নেই।

খান সাহেব : মনে নেই, কিন্তু সত্তরটি গজল রয়েছে পকেটে হয়ত-বা।

শেখ সাহেব : ও আল্লা, চারটি মাত্র কবিতা ঠিকঠাক করে নিয়েছি।

রুশোয়া : তবে পড়ছেন না কেন?

শেখ সাহেব : পেশ করছি—
প্রার্থনা হলে স্বতঃস্ফূর্ত
সেটাই সত্যিকার
সেই খাঁটি কথা যা কেউ কখনও
করে না অস্বীকার।

সভাস্থ সবাই : খাসা!

শেখ সাহেব : নমস্কার,

তুমি দেখি ইউসুফের মতো
ঘোরো এ-বাজার সে-বাজার
তুমি তো প্রার্থী হয়ে আসোনি কো
কি আছে তোমার লজ্জার?

রুশোয়া : কী চমৎকার রসিকতা!

শেখ সাহেব : নমস্কার,

সেরা সে হৃদয় যা সুন্দরীর
চাহনিতে জমে না যায়
সেরা সে জিনিস যার মূল্যের
ক্রেতা খুঁজে পাওয়া দায়।

খান সাহেব : অতি চমৎকার!

শেখ সাহেব : নমস্কার,

মিথ্যে দোহাই তুমি দিও নাকো
প্রেমের হন্তার।
বিশ্বাস কি করে করি
হাতে তার বিনা তলোয়ার॥

ইত্যবসরে একটি লোক এসে মুনশী আহমদ হোসেনের হাতে একখানি লেখন দিলেন।

মুনশী সাহেব (চিরকুটটি পড়ে) নিন, মির্জা সাহেব। উনি এখানে আসবেন না, কিন্তু তাজা গজল পাঠিয়েছেন।

লোকটিকে আমি জিজ্ঞেস করলাম, উনি করছেন কী?

লোকটি : (মুচকি হেসে) জী হুজুর, সন্ধ্যে হতেই সিকান্দার বাগ থেকে নাদায় করে অনেক বিলাতি ফুলগাছ এনেছেন। সেগুলি গোল ঘরের ধারে ধারে পাথরের মধ্যে সাজিয়ে রাখছেন আর মালি জল দিয়ে চলেছে।

রুশোয়া : আজ্ঞে হ্যাঁ, উনি নিজের কাজ থেকে ফুরসুৎ কোথায় পাবেন যে কাব্য পড়ার আসরে এসে হাজির হবেন।

মুনশী সাহেব : বেশ, তবে গজল পড়ে দিন। হায় আল্লা, জলসাটি কেমন পানসে হয়ে গেল। না আসেন তো না-ই এলেন। গজলটি তবে পড়ে দিন।

রুশোয়া : আমার লেখা কিছু পড়তে হবে না তো?

মুনশী সাহেব : হ্যাঁ, ভালোই মনে পড়েছে, বেশ প্রথম আপনারই লেখা পড়ুন।

রুশোয়া : প্রশ্ন করো না তুমি কি করে যে
যায় বয়ে জীবনের দিন,
জীবন্ত অথবা মৃত, বিরহে
সে নিঠুরের, প্রেমে উদাসীন।
প্রতিদ্বন্দ্বীকে দেখে
প্রেমিকের গালির ছলনা
ওরে কেউ বল না তোরা
মনের সাথে সে-ও তো প্রতারণা।
প্রেমিকের ক্ষত চিহ্ন দেখে
খুশিতে মন ডগমগ, তবে
নুনের ছিটে পড়বে যখন তাতে
বল দেখি কেমন মজা হবে।
তাহার চুম্বন সে তো প্রচণ্ড চাতুরী
বহু প্রেমিকের মন করেছে যে চুরি॥
প্রেমিকের নাম জপে, বিচ্ছেদের ব্যথায়
সে মরে।
সে জন তো শুনবেই যে লোক
বদনামেরে ডরে॥
আমার কপাল যদি কখনও-বা ভাঙে
ফেরে নাকো সে বরাত আর।
কুঞ্চিত এলোমেলো কেশদাম কারো
ফিরে পায় পারিপাট্য তার॥
কখনো সে লতায়েছে কাঁধে,
কখনো-বা ভেঙেছে মুকুর
চুল নিয়ে কত ভাঙচুর,
আবার সে চুল তার বাঁধে॥
যৌবনের ওড়না পরা লাবণ্য তোমার
ছলকি ছলকি চলে যায়।
সেই ইশারার টানে আজ দেখছি আমার
এই প্রাণ রাখা হলো দায়॥
বিলসিত রূপের ঠমকে যদি
সতীত্বের হয় অপমান।
বল দেখি কেন তবে একারণে
দেয় লোক ধন-মান-জান॥

প্রতিটি গজলের 'বাহবা' মিলল সভা থেকে। আর রুশোয়া প্রতিবারেই মাথা নত করে শ্রদ্ধা জানালেন।

এরপর মির্জা অদার পাঠিয়ে দেয়া গজল পড়তে শুরু করলেন :

কাল রাতে কোনোখানে বিলম্বে তাঁহার।
দুনিয়া আমার চোখে হলো অন্ধকার॥
ঘনায়ে আসিছে সত্য
নিত্য মোর মরণের ক্ষণ।
হে জীবন, তবু আজ
ভরে গেছে আমার এ মন॥
অবুঝ কামনাগুলো
দেবে নাকো আমারে বাঁচিতে।
শত্রুতা করেছে তারা
জ্ঞানবুদ্ধি সকলি হরিতে॥
কী হলো তোমার বলো,
হে মোর মরণ
ত্বরা করে এস চলে,
দ্বিধায় জড়িত কেন তোমার চরণ॥
খবর পেয়েছো তুমি
আমার যে সব হারালাম।
প্রশ্নের অতীত এতো
জীবনের শেষ পরিণাম॥
কথা ছিল তাঁর সাথে
আজ মিলিবার।
পথে যেতে দেরি হলো
দম নেই আর॥
ভেবেছিলাম, কুঁড়েমিটা
হটিয়ে দেব শেষে।
বদমাশ তুই জমেই গেলি
আমার পাশে এসে॥
কলুষ কামনাগুলি
দমে যাওয়া স্বভাবে মার্জার
আস্কারায় ফুলে ফেঁপে
পেয়ে গেছে বাঘের আকার।

মির্জা জলসায় আজ
হাজির হব না
বড়ই হয়েছে দেরি, অপেক্ষায় ?
তবু ও তো না।

আকস্মিকভাবে জলসায় হাজির বাইরের জনৈক কবি মজহরুল হক এবার তাঁর কবিতা পাঠ শুরু করলেন :

কবির আসরে আজ একী হলো হাল
ভাঁড়ামির কবলে সে হয়েছে নাকাল ॥
ধ্রুপদী শিল্পকে আজ ভ্যাংচায় ফ্যাশান
বাগ্মীর সভায় তোলে হাসির তুফান ॥
বিদ্রোহী কেতন কেউ তোলে না তো আর
কবিতার তারিফ তো আরো মেলা ভার ॥
বক্তার বক্তব্যে আজ প্রয়োজন হলে
শিষ্টাচারেরও সীমা যেতে হবে দলে ॥
ব্যঙ্গ আর বিদ্রূপের এই প্রহরণ
প্রয়োগ করে না কেউ শুধু অকারণ ॥
জ্ঞান-বাণী দিয়ে কবি করেন গমন।
সঙ্গীরাও চলে তাঁর সাথে অগণন ॥
একা একা কবি কবে যাবে কোন্‌খানে।
মুরুব্বিরা তাঁর সাথে চলেন সেখানে ॥
যাঁর সাথে শিষ্যভক্ত ভিড় না জমায়।
কখনো গজল তার কদর না পায় ॥
একধারে তারা সবে করে ওয়াহ্, ওয়াহ্।
আর ধারে অন্য জনে করে আহ্, আহ্ ॥
ওয়াহ্ কেমন ছড়িয়ে আছে মোতি।
ওয়াহ্, বাক্যে আছে জ্ঞানের জ্যোতি
কেউ-বা বলে আহ্, কেমন গল্পের ঢং।
কেউ-বা বলে, আসলে এটি নতুন রং ॥
এর চেয়ে ভালো করে বলবে কী আর কেউ।
আপনার চেয়ে ওস্তাদ আর আছে কোথায় কেউ ॥
একালের আপনিই তো অসামান্য এক।
মির ও মির্জা আসলে তো অহং-এর ভেক ॥
সৌন্দর্য ফুটিয়ে তোলা তাদের নাগাল বার।
নেইকো কোনো বর্ণগন্ধ, নামই শুধু সার ॥

ওদের কাব্যে আছে কোথায় ক্ষুরের তীক্ষ্ণ ধার।
আপনি হলেন সবার সেরা দোহাই আল্লার॥
খোদার দোহাই, আপনি ভালো ঢের।
একমাত্র আপনি ভালো, দোহাই খোদার ফের।
কল্পনার গতি তোমার ছোটে তীব্রতর।
অভিনব বলে তারে চিনি বরাবর॥
খোদার গুণাবলী, দোষ খোদাতেই প্রকাশ।
তোমার মধ্যে সত্যি তারি ঘটেছে বিকাশ॥
তোমার সামনে সাধ্য কার মুখটি খুলবার।
বলবে কিছু এমনতর শক্তিই-বা কার॥
এই চিন্তাধারাতেও তোমার অধিকার।
সম্মোহনী এই যে চিন্তা অংশ আছে তার॥
মনে মনে চিন্তা আমি করেছি অপার।
তুমিই কেবলমাত্র উপমা তোমার॥
তুমি এমন, তুমি কেমনতর
একমাত্র আমি জানি তুমি যেমনতর॥
আপনার যে মূল্য কত, কী পরিচয় ধরেন।
জিজ্ঞেস করুন আমার কাছে, আপনি
কী তার জানেন॥
শূন্যে সৌধ তৈরি করা তাই আপনার কাজ।
বর্ণনায় পরিয়ে দেন শেষ কথাটির সাজ॥
জন্মেছে যে এমন কবি, খোঁজটি কোথায় তার।
জন্মায়নিকো জন্মাবে না, কোনোকালে আর॥
কখনো-বা উড়ে যায়, কখনো লুটায়, হায়
অবান্তর কল্পনার অবাধ বিস্তার।
তুলনা রহিত বলে রটে যায় তারিফটি তার
এরি ফলে অপরের মনে দুঃখভার
এধারে একের মুখে কবিতার হয় নিঃসরণ।
ওধারে অপরজনা টুপি ছুঁড়ে দেখাচ্ছে
ক্রোধের লক্ষণ॥
যার মনে এ কবিতা তুলেছে রণন।
অপার আনন্দে সে তো রয়েছে মগন॥
এদিকে অপরে যদি ক্রোধে নেয় লাঠি।
আশ্চর্যের কিছু নয়, কথাটি তো খাঁটি॥

এমন কথাটি আজ নয়কো অদ্ভুত।
ঘটেছে তো হামেশাই, বহুত, বহুত॥
প্রতিবাক্যে থেমে থেমে কবিতার চলেছে
পঠন।
তারিফে চলেছে তার শিরের নমন॥
বাহিরে প্রকাশ পায় কত যে বিনয়।
অন্তরেতে কিন্তু গর্ব মাথা তুলে রয়॥
এই নিয়ে চলে কত নর্তন-কুর্দন।
হয়ে পড়েন আত্মপ্রশংসা মগন॥
প্রতিটি বাক্যের চলে বিশদ বর্ণন।
প্রতিটি কথার চলে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ॥
কেন ভালো লাগবে না প্রশংসা-গরিমা।
আমি এর যোগ্য, লোকে জানে সে মহিমা॥
ঈশ্বর না করুন এ কেমন চক্রাকারে খেলা।
ঈশ্বর না করুন এ কেমন নরকের ঠেলা॥
একে বলে সূক্ষ্ম বিচারজ্ঞান।
এটি হলো সুন্দরের ধ্যান॥
যেমনতর কবি নামধারী।
তেমনতর পৃষ্ঠপোষক তারি॥
মিথ্যের সমাদরে কোথায় যে সত্যের ঠাঁই।
সত্যহীন সৌন্দর্যের কোনো মূল্য নাই॥
কোনো গূঢ় তত্ত্ব আছে, কি-ই-বা স্বাদ এর।
কে-বা সেই প্রশ্ন তোলে,—কি-ই-বা
হাওয়ার ফের॥
ধরো যদি এতে দোষ করেছি অশেষ।
কি হবে আমার গতি বুঝি আমি বেশ॥
স্পষ্ট কথার আমি পাব পুরস্কার।
মনস্কাম তাতে পূর্ণ হবেই আমার॥
নেই কোনো প্রয়োজন, ভয় ও ভাবনা।
সত্যি কথা তবে কেন বলে চুকাব না॥
পক্ষপাত করা—সে তো আমার হয় না।
আর তা আমার ধাতে কখনো সয় না॥
কাব্যের আঙ্গিকে যদি অন্তর না হয় ভরপুর।
শিল্পের সজ্জায় যদি লেগে থাকে

অতৃপ্তির সুর॥

আর একে দেওয়া হয় কবিতা এ নাম।

এমন কাব্যকে তবে দূর হতে প্রণাম॥

সভার সকলেই এই কবিতার বিচার-বিবেচনাটির বড়ই সমাদর করলেন। প্রত্যেকটি কবিতার উপর শ্রোতৃবৃন্দ তারিফ করে যেতেই থাকলেন। মুনশী সাহেব শুনতে শুনতে আত্মহারা হয়ে পড়লেন। উমরাওজান তন্ময় হয়ে গেলেন। আর আমার মনের যে কী অবস্থা তা যদি কেউ আমার মনকে জিজ্ঞেস করে।

মুনশী সাহেব : হ্যাঁ, জনাব আগা সাহেব, এবার আপনি কিছু বলুন।

আগা সাহেব : বহুত আচ্ছা, একটি কলি শুনুন তবে—

ধেনো মদের বোতলটি আর সিদ্ধ মটরদানা

গরম গরম কোথাও জুটে যায়

তখন কেবল মনটি আমার

একটুখানি শান্তি ফিরে পায়।

সভার সবাই : আগা সাহেব চমৎকার কলি শোনালেন।

আগা সাহেব : মহোদয়গণ! এ আর কি-ই-বা শুনলেন। আরেকটি শুনুন—

গাঁথব বেছে পঙক্তি দুটি সৌন্দর্যের সার।

শেষের চরণ দুটির হবে তুলনা মেলা ভার॥

সভাজনবৃন্দ : নিঃসন্দেহে ভালো হয়েছে।

আগা সাহেব : নিন, এখন কবিতা শুনুন—

এ কবিতাটির লক্ষ্য হচ্ছেন নবাব সাহেব। উনি জালি শার্ট আর হালকা বাদামী রঙের মিহি মখমলের পায়জামার ফাঁস ঢিলে করে দিয়ে বসে আছেন। আর সুন্দর নকশাকাটা একখানি পাখা হাতে হাওয়া খাচ্ছেন।

শীতের দিনে থাকলে কাছে

শীতের কষ্ট কি-ই-বা আর।

তোমার কাঁধের কেশপাশে

শাল কম্বল সবই ছার॥

সকলে : সাবাস!

আগা সাহেব : কবিতা শুনুন—

বলে যাব, মনে যার প্রেমের অঙ্কুর নব

মেলে দেয় ডানা

নিরুপায় সে মজনুও মন তার শান্ত রাখে

চলন্ত উটের মাঝে দেখা পেয়ে

লায়লার নিশানা॥

পণ্ডিতজী : শোভানাল্লা! এ উপায়হীনতা কেমন উপায় বের করে দিল!

সভাজনরা : কী গভীর ধারণা ! এমনিধারা জ্ঞান, না হলে নেই।

আগা সাহেব : না-ই হোক। আচ্ছা, এখন এই কবিতাটি শুনুন—

বলছি, প্রেমিক তোমার শোকে
সংযমের বাঁধ থাক।
ঘরের রাস্তা বন্ধ হবে, যদি থাকে
চোখের জলের পাঁক॥

শেখ সাহেব : বেশ বলেছেন।

রুশোয়া : (খান সাহেবকে) আপনি নীরব কেন ? কিছু সমালোচনা করুন।

আগা সাহেব : হঁ্যা, জনাব। নীরব প্রশংসা ঠিক নয়।

খান সাহেব : না বুঝেই আপনাকে তারিফ করছি, এমনটি ভাববেন না বলেই চুপ করে আছি।

আগা সাহেব : এরকম উল্টো বুঝ্ আমার নেই মশায়।

সভার সকলে কথাটির উপর হেসে লুটোপুটি খেতে লাগলেন।

আগা সাহেব : কবিতা শুনুন—

ঈর্ষা বা পর এই রূপেতে দেখবে আমায়
তার দুটি নয়ন।
টেরা-চোখে হয় দিসে
আকার প্রেমিকজন

সভাসীনরা : শোভানাল্লা, কী চমৎকার কল্পনা।

আগা সাহেব : মুরগী লড়াতে তাঁর যদি ইচ্ছে যায়।
শখ সে তো শৈশববেলায়॥
তকলিটি ঝোলে যদি একটি সুতায়।
ঘুড়ি বা কাগজ বাঁধা কি-বা আসে যায়॥

এ কবিতাটিরও লক্ষ্য নবাব সাহেব এই জন্য যে ওঁর সরকারি তদারকিতেই একটি বড় ঘুড়ির শোভাযাত্রা বেরিয়েছিল।

আগা সাহেব : দরজা কুলুপ আঁটা
কে বলবে ঘরে যে কী আছে
কবিতার গূঢ়তত্ত্ব কে বুঝবে, চাবিকাঠি
নেই যার কাছে॥

রুশোয়া : আগা সাহেব, কী আর বলব। উমরাওজান একটু শুনলেন কী কবিতা উনি পড়লেন।

উমরাওজান : শোভানাল্লা। আমি প্রথমেই বুঝেছি। উনি মালিক, যা ইচ্ছে তাই বলুন।

আগা সাহেব : তা পরিষ্কার বলছেন না কেন যে, নরকের দারোয়ান আমি। আচ্ছা, শুনুন—

যেমন করেই পারি
পয়সা-কড়ি, মণ্ডা-মিঠাই—
তাতেও যদি হারি
বাক্‌চাতুরী দিয়ে
ছোকরা নাগরটিকে আমার
নেবই ফুসলিয়ে।

সকলে : আহা, কেমন বলেছেন!

আগা সাহেব : প্রয়োজনে শুধু চাই
চটির একটি ঘাই
অথবা গালির কলধ্বনি।
মরি কী মজাই হবে
নাগরটি বশে রবে
হলেও সে শঠ চূড়ামণি॥

খান সাহেব : ঠিক। কিন্তু আপনার কবিতাটি শালীনতার সীমা ছাড়িয়েছে।

আগা সাহেব : জনাব, একালে কে-ই বা শালীন!

একি খোদার দোয়া
না আশমানে পাওয়া,
তোমার মতো চন্দ্রাননা কে আর কবে।
আমার মতো নোকর কে-ই-বা হবে॥

নবাব সাহেব : ভালো, কিন্তু কবিতাটির লক্ষ্য কে?

আগা সাহেব : এটি আপনি-ই তো ভালো বোঝেন। কেননা, আপনার মতো সুহৃদের মহানুভবতার মধ্যেই এই গূঢ় রহস্যটি লুকিয়ে আছে।

খান সাহেব : আপনি জবাব দিন।

আগা সাহেব : আপনি কি-ই-বা জবাব দেবেন। কবিতা শুনুন—

অযোগ্যা সে পেতে ভালবাসা
চিত্ত যার তুরগ-চঞ্চল।
অবলা অদাকে তবু ভালবাসি, তাই
ভুলি তার চাপল্য সকল॥

সবাই : ভা-রি হিম্মত!

আগা সাহেব : আচ্ছা, তা না-ই-বা হলো। এটি শুনুন—

ডানায় ভর যখন যাবে উড়ে
ফেলব ফেঁড়ে আমার হৃদয়খানি

চোখের বাইরে গেছ যদি জানি
আঁখি দুটি ফেলব তখন ফুঁড়ে।

সবাই : খু উ ব!

আগা সাহেব : নেই কো কোনো কাজল, চিরুনি,
বা গয়নাগাঁটি
নেই কো কোনো বেশভূষারও পরিপাটি।
নিরাভরণ তোমার পরিচয়
বয়ে আনে কি যেন এক জানার বিস্ময়॥

উমরাওজান : উহুঁ! তবে কি দিনরাত চুল বেঁধে মুখে পাউডার মেখে বসে থাকব!

আগা সাহেব : সাদাসিধের মজাই এখানে। আরেকটি মজা খরচের সাশ্রয়।

(এই ঠাট্টাটিতে উমরাওজানের কত খ্যাতি)

আগা সাহেব : টাকা যদি আমার কাছে চান উনি
চুপি চুপি দেবই আমি তখুনি।
নেই কো কোনো বকবকানি,
কচ কচ, কলকলানি॥

খান সাহেব : উপরের কবিতার লাইনটিও লাগসই। সেই শঠের ইঙ্গিত চলে আসছে।

(উমরাওজান হেসে লুটোপুটি খাচ্ছেন)

আগা সাহেব : বেশ, তবে এখন এমন কবিতা পড়ব না। আমার প্রিয় হতমান হচ্ছেন। সুন্দর কল্পনা শুনুন!

তাজা কোমল (সুন্দর) কোমরে (তোরণে) তার
রসের উপচি (উপরে পড়া বস্তু) বানাব
হেন সূক্ষ্ম (গোপন) বস্তু কি যে তা
বুঝবে না নাচমনারা জেনো।

খান সাহেব : তা না হয় বুঝলাম, আপনার হুকুমে আমার মনটি এই রকমই। কিন্তু দোহাই আল্লার 'উপাচ' কথাটির অর্থটি বুঝিয়ে দিন।

আগা সাহেব : যাক গে, ইচ্ছে হয় শুনুন। যাঁরা গোনেন, গণনার বদলে খালির (×) চিহ্ন দেন, এর ফলে অর্থটি দাঁড়ায় এই যে কোমর (স্থান) খালি। একটি লাইন মাঝখান থেকে আরেকটি লাইনকে কাটল। এর থেকে প্রকাশ পায় প্রিয়ের কোমর (স্থান) কাটা গেল আবার জোড়া দেয়া হলো।

খান সাহেব : কেমন করে?

আগা সাহেব : আপনি এই সূক্ষ্ম জিনিসটির কথা জিজ্ঞেস করবেন না। যা হোক, ধরা যাক, 'উপচি'টি গুণের নমুনা জমা করেছে। মজা এই যে, নমুনার

কোনো মাপ নেই, উদ্দেশ্য পূরণ করে আসলে 'কোমর'টি জানা থেকেই দেহের দুটি অংশকে জুড়েছিল।

সভাজনরা : হজরত, ব্যস সূক্ষ্ম কল্পনার হদ্দ হয়ে গেল! যারা এত সব বিদ্যে জানবে তারাই আপনার কবিতা বুঝতে পারবে।

আগা সাহেব : এই জন্যই তো আমি রামা-শ্যামার সামনে কবিতা পড়িনে। আফসোস, শ্রদ্ধেয় ওস্তাদ আজ বেঁচে নেই। নইলে এই কবিতায় কিছু বাহবা মিলত। বুঝতে পারার আর আছেই-বা কে! যা হোক, কবিতা শুনুন। মনে অস্বস্তি হচ্ছে সমঝদার কেউ নেই বলে।

অহো, ডাকু একটু সবুর কর
কর শেষ বিচারের দিন বদল
ভীত ত্রস্ত, এলোমেলো হলে কাব্যদল
নামবে যে বড়ই বিপদ-ঢল।

সকলে : শেষের চরণটি আবার পড়তে আজ্ঞা হোক। আগা সাহেব আবার পড়লেন।

নবাব সাহেব : আহ্, কী কড়া কাব্যিক নাম।

আগা সাহেব : মাফ করতে আজ্ঞা হয়, এইরকম কিছু একটি হয়েছে, কিন্তু অশালীন কিছু নয়। একে উঁচু বংশের দিক থেকে আপনার এই অনুগত ভৃত্যের পূর্বপুরুষগণ বনে প্রান্তরে মারদাঙ্গা করে বেড়াত, দ্বিতীয়ত ওস্তাদ 'চোর' এই কাব্যিক নামে অভিহিত হতেন। এটি ঠিক উচিত হয়নি। (ওঁর আত্মা লজ্জা না পান!) পূর্বসূরীদের বিষয়বস্তু চুরি করে একটু অদল-বদল করে পড়তেন। কবিতাগুলি সব পড়ে দেখুন, কদাচিৎ একটি নতুন মিলবে। যখন ছাইরঙা ঘোড়া কলমের লাগাম আমার হাতে এল তো আমার কুলশীলক বৃত্তিটাকে নিজের পদমর্যাদা অনুযায়ী 'ডাকু' এই ছদ্মনামটি নিলাম। আর কিছু না হোক, এটি তো তুখোড় হওয়া বটে। গোলামের রীতিটিই এই যে, অতীত ও বর্তমানের কবিদের কবিতাগুলি নিজের ব্যবহার করার জন্য চুরি করে দখলে নেব।

কবিতা পাঠের আসর শেষ হওয়ার পর ফলসার জমানো বরফ দুটি করে মাটির ভাঁড়ে পান করে যে যার ঘরে ফিরে গেলেন। অতঃপর টেবলক্লথ বিছিয়ে উমরাওজান, মুনশী সাহেব আর আমি খানা খেয়ে নিলাম।

মুনশী সাহেব : (উমরাওজানকে) প্রথমেই যে চরণটি আপনি পড়েছিলেন সেটি আবার একটু পড়ুন তো!

উমরাওজান : কাকে এ দগ্ধ হৃদয়ের কথা
বলা যায় প্রাণ খুলে
কালের চলার পথে আমি এক
হায়রে বাউণ্ডুলে

মুনশী সাহেব : আপনি এই চরণটি পড়ার পর আমার মনে হয়েছে যে, আপনার জীবনকাহিনীটি নিঃসন্দেহে কৌতূহলোদ্দীপক হবে। আপনি যদি এটি ব্যক্ত করেন তবে এটি উপাদেয় না হয়ে যাবে না।

আমিও মুনশী সাহেবের এই বক্তব্যের সমর্থন জানালাম, উমরাওজান এটি এড়িয়ে যেতে চাইছিলেন।

আমাদের উদার-হৃদয় মুনশী সাহেবের আগের থেকেই গল্প-কাহিনী পড়ার শখ ছিল। আলিফ্-লয়লা, আমির-হামজা ইত্যাদি কাহিনী ছাড়াও পারসি কবি শাদির 'বোস্তান'-এর কথাও খুব দ্রুত তাঁর চোখের ওপর দিয়ে ভেসে গেল। এমন কোনো উপন্যাস ছিল না যা তিনি পড়েননি। কিন্তু লখনৌ-এ কিছুদিন থাকার পর এই চমৎকার ভাষাটির খাঁটি বোলচালের গুণ প্রকাশ পেয়ে গেলে তিনি ঔপন্যাসিকদের অপ্রাসঙ্গিক গল্পের কৃত্রিম গোঁড়ামি মিশেল দেয়া অন্তঃসার-শূন্য ছবিগুলি মন থেকে মুছে ফেললেন। লখনৌ-এর কৌতুকপ্রিয় লোকের কথাবার্তা তাঁর খুবই পছন্দ হলো। উমরাওজানের কবিতার এই প্রথম চরণটি তাঁর মনে যে প্রভাব বিস্তার করে সে-কথা আগেই বলেছি। মোটের উপর, মুনশী সাহেবের শখ আর আমার উৎসাহে উমরাওজান বাধ্য হয়ে নিজের জীবনকথা বলতে স্বীকার করেন।

কোনো সন্দেহ নেই যে, উমরাওজানের জীবনচিত্রটি ছিল খুবই খাঁটি। আর তা হবে না-ই-বা কেন? একে তো তিনি ছিলেন শিক্ষিতা, তার উপর আবার খুব উঁচুতলার বেশ্যা মহলে লালিতা-পালিতা। শাহজাদা, নবাবজাদাদের সঙ্গে উঠতেন-বসতেন। শাহের অন্তঃপুর অবধি ছিল তাঁর যোগসূত্র। তিনি নিজের চোখে যা দেখেছেন অপরে তা কানেও হয়ত শোনেনি।

আত্মকথা উনি যেভাবে বলে যাচ্ছিলেন আমি সেইভাবেই গোপনে লিখে রাখছিলাম। শেষ হলে পর আমি খসড়াটি তাঁকে দেখাই। এতে উমরাওজান প্রথমে খুবই চটে গিয়েছিলেন। কিন্তু তখন আর কী করা। শেষ অবধি বুঝে-সুঝে তিনি চুপ করে গেলেন। নিজে আদ্যোপান্ত পড়ে এখানে-সেখানে যেটুকু বাকি থেকে গিয়েছিল তা ঠিক করে দেন।

আমি উমরাওজানকে নবাব সাহেবের সাথে তাঁর সাক্ষাৎকারের সময় থেকেই জানতাম। এঁদের দুজনের সাথেই আমার প্রায়ই ওঠা-বসা চলত। এই জীবনীটিতে যা-কিছু আমি লিখেছি তার প্রত্যেকটি বাক্যই যে সত্য সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু এটি তো আমার নিজের রায়। বিচারকরা কিন্তু যেমনটি চান তেমনভাবেই বিচার-বিবেচনা করতে পারেন।

মির্জা রুশোয়া

১

কোন্ কাহিনীর স্বাদ ভালো
বলতে কি পারো
দুঃখের যে স্বাদ আমি পেয়েছি জীবনে
নাকি আর কারো।

শুনুন মির্জা রুশোয়া, এই বিরক্তিকর কথাটি আমাকে কী জিজ্ঞেস করছেন! আমার মন্দ-ভাগ্যের বর্ণনায় কী এমন মজা আছে যে আপনি এর এত অনুরাগী হয়ে উঠেছেন। আমার মতো একটি দুঃখিনী, হতভাগী, দেশছাড়া, গৃহহীন পরিবার-পরিজন থেকে বিচ্ছিন্ন, একটি লজ্জাজনক বংশের ইহলোক ও পরলোকে ঘৃণ্য জীবনের কথা শুনলে আমার মনে হয় আপনি খুশি হবেন না।

আচ্ছা, তবে শুনুন, আর বেশ ভালো করেই শুনুন।

বাপ-দাদার নামের গৌরবে নিজের গরিমা প্রকাশ করায় লাভ কী? আর সত্যি বলতে কি, আমার তা মনেও নেই। হাঁ, ফৈজাবাদে শহরের প্রান্তে একটি মহল্লায় ছিল আমার ঘর, আমাদের বাড়িটি ছিল পাকা। আর আশপাশে ছিল কিছু কাঁচা বাড়ি, কিছু ঝুপড়ি, কিছু টালির ছাদওলা বাড়ি। বাসিন্দারাও হচ্ছে তেমনিধারা, কিছু ভিস্তিওয়ালা, কিছু নাপিত, ধোপা, কাহার। আমাদের বাড়ির মতো উঁচু বাড়ি আরও একখানা ছিল ঐ মহল্লায়। ঐ বাড়িটির মালিকের নাম দিলবর খাঁ। বাবা ছিলেন বউ-বেগমের কবরখানার পাহারাদার। কী যে ছিল তাঁর পদ আর মাইনেই-বা ছিল কত টাকা, তা আমার জানা নেই। এইটুকু মাত্র স্মরণ আছে যে লোকে তাঁকে জমাদার বলে ডাকত।

আমার ভাইকে সব সময়েই আবদারের প্রশ্রয় দিতাম, আর সেও আমার এত অনুগত ছিল যে এক মুহূর্তও আমাকে ছেড়ে থাকত না।

বাবা যখন সন্ধ্যেবেলায় কাজ সেরে বাড়ি ফিরতেন খুশির আবেগে ভাই-বোনদের কাউকেই কিছু বলতাম না। তাঁর কোমর জড়িয়ে ধরতাম। ভাই 'বাবা বাবা' বলে দৌড়াত, তাঁর জামা ধরে টানত। বাবা খুশিতে প্রাণভরে হাসতেন, আমাকে চুমু খেতেন, পিঠে হাত বোলাতেন। ভাইকে কোলে নিয়ে আদর করতেন। আমার খুব মনে আছে উনি কখনো খালি হাতে ঘরে ফিরতেন না। কখনো-বা হাতে আছে দুখানা আখ, কখনো-বা আছে বাতাসা অথবা তিলের নাড়ুর দোনা। যখন সেগুলি ভাগ-বাটোয়ারা করে দিতেন সে সময়ে

ভাই-বোনদের মধ্যে বেশ মজার লড়াই হোত। ও আখ ছিনিয়ে নিয়ে যেত আর আমি মিঠাইয়ের দোনা হাতিয়ে নিতাম। সামনে টালি-ছাওয়া ঘরে বসে মা খানা বানাতেন। বাবা এদিকে বসতেই আমার বায়না শুরু হয়ে যেত, 'বাবা, হায় আল্লা! আমার গড়েটা আনোনি। ছাখো পায়ের জুতো আমার কিরকম ছিঁড়ে গেছে। তোমার তো কোনো খেয়ালই থাকে না, ছাখো তো আমার বালা সোনারের দোকান থেকে এখনো তৈার হয়ে এল না। ছোট কাকার মেয়ের দুধের বরাদ্দ বেড়েছে। আর কী পরেই-বা যাব? ঈদের সময় নিদেন একজোড়া নতুন কাপড় তো চাই, হ্যাঁ, আমি নতুন কাপড় পরব, হ্যাঁ, নতুনই পরব।'

মা খানা বানিয়ে আমাকে ডাকেন। আমি গিয়ে রুটির থালা আর বাটিতে ব্যঞ্জন তুলে নিয়ে আসি। চাদরখানা বিছিয়ে মা খানা বের করে দিতেন। সব মাথা এক জায়গায় জড়ো হয়ে আমরা রাতের খাওয়া শেষ করতাম। আল্লার কী আশীর্বাদ! বাবা রাতের নমাজ পড়ে শুতে যান। ভোর হতেই বাবা নমাজ পড়তে শুরু করেন। আর আমিও লাফ দিয়ে উঠে বসেই ফরমায়েশ শুরু করতাম—

'বাবা আমার, আজ যেন ভুলে যেয়ো না, গড়েটা অবিশ্যি নিয়ে আসবে। বাবা, সন্ধ্যেবেলায় অনেক পেয়ারা আর নারেঙ্গা নিয়ে আসবে...।'

বাবা সকালের নমাজ সেরে রোজকার প্রার্থনা পড়তে পড়তে ভাঁড়ার ঘরে গিয়ে কবুতরদের দানা দিতেন। আর দুয়েকটি গুজব রটাতেন। এরই মধ্যে মা ঝাঁট-পাট শেষ করে দুপুরের খাবার রেঁধে নিতেন। কেননা, বাবা সকাল ৯টা বাজার আগেই চাকার করতে বেরিয়ে পড়তেন। মা সেলাই-ফোঁড়াই নিয়ে বসতেন। আমি ভাইকে নিয়ে হয়ত-বা কোনো মহল্লায় যেতাম, কিংবা দরজার সামনে তেঁতুল গাছতলায় চলে যেতাম, সমবয়সী ছেলেমেয়েরা সেখানে এসে জুটত। ভাইকে বসিয়ে রেখে নিজে খেলায় মজে যেতাম। হায়, সে কী দিনই না ছিল; ছিল না কোনো ভাবনা-চিন্তা, ভালো খেতাম, ভালো পরতাম। কেন না সমবয়সী ছেলেমেয়েদের মধ্যে আমার চাইতে ভালো অবস্থার আর কাউকে নজরে পড়ত না। মন ছিল না অবাধ্য, চোখেও ছিল না কোনো বিদ্বেষ। যেখানে থাকতাম সেখানে আমাদের বাড়ির চেয়ে আর কোনো বাড়ি উঁচু ছিল না। আর সবগুলিই ছিল এককামরা অথবা টালি-ছাওয়া ঘর; আমাদের বাড়ির সামনা-সামান ছিল দুটি বারান্দা। সদর বারান্দার আগে টালির ছাউনি দেয়া দুটো কামরা ছিল। সামনের দালানের একটি রান্নাঘর আর আরেক দিকে ঘরের সিঁড়ি। পাকা বাড়ির একটি ঘরে টালির ছাদ আর দুটি ঘরের ছাদ পাকা। রান্নাবান্নার বাসন-কোসন ছিল প্রয়োজনের চেয়েও বেশি। দু-চারটে কাপাসের কার্পেট আর সাদা চাদরও ছিল। মহল্লার লোক এসব জিনিস চাইতে আসত আমাদের বাড়ি,

আমাদের বাড়িতে ভিস্তি জল তুলে দিত আর মহল্লার মহিলারা নিজেরাই আমাদের কুয়ো থেকে জল নিতেন। বাবা যখন উর্দি পরে ঘর থেকে বেরোতেন লোকে খুশি হয়ে সালাম জানাত। মা পাল্কি চড়ে নেমন্তন্নে যাওয়ার সময় প্রতিবেশিনীরা পায়ে পায়ে সিকি মাইল তাঁর সাথে যেত।

রূপে চেহারায়ও আমি আমার সমবয়সীদের চেয়ে ভালো ছিলাম।

সুন্দরীদের মধ্যে আমি গণ্য হব না তা ঠিক, তাহলেও কিন্তু এখন যে ছিরি হয়েছে তেমনটি ছিলাম না। ফুটন্ত চাঁপা রং ছিল আমার।

নাক, ছিরি-ছাঁদও যাহোক, এরকম খারাপ ছিল না। মাথাটি ছিল উঁচু ধরনের, ডাগর ডাগর ছিল চোখ দুটি। শিশুসুলভ ফোলা ফোলা গাল ছিল। নাকটি যদিও খুব সুন্দর ছিল না তবুও তনুশ্রী বয়স অনুযায়ী ভালোই ছিল, যদিও আজ আর তা নেই। গরবিনীদের মধ্যে গুনতি আমার তখনো ছিল না, এখনো নেই। ফ্যাশনমত সিল্কের পায়জামা আর ছোট ছোট একরকম ফুলদার কাপড়ের জামা, সূক্ষ্ম মসলিনের ওড়না, হাতে তিনগাছা করে রুপোর চুড়ি। গলায় হার (তোক)। অন্য মেয়েদের ছিল নাকে রুপোর নথ আর আমার ছিল সোনার। কানে সদ্য-সদ্য ছিদ্র করে নীল সুতো পরানো ছিল কেননা, সোনার কানবালা তৈরি করতে দেয়া হয়েছিল।

আমার বিয়ের সম্বন্ধ হয়েছিল আমার পিসিমার ছেলের সাথে। নবছর বয়স থেকেই বাগদান করা হয়। আমাদের তরফে বিয়ের জন্য তাগাদা দেয়া হচ্ছিল। পিসিমার বিয়ে হয় নবাবগঞ্জে। পিসেমশায় ছিলেন আমাদের জমিদার। পিসিমাদের সংসার আমাদের সংসারের চেয়ে সম্পন্ন ছিল। বাগদত্তা হওয়ার আগে মায়ের সাথে আমি বারকয়েক গিয়েছিলাম, ওখানে কারখানাও ছিল। ওদের বাড়িটি ছিল কাঁচা, কিন্তু বেশ প্রশস্ত। দরজায় ছিল খড়ের ছাউনি। গাই, বলদ, মহিষ ঘরে বাঁধা। ঘি দুধ ছিল পর্যাপ্ত পরিমাণে। আনাজ তো ভূরি ভূরি আর ভুট্টার সময় তো বড় বড় ঝুড়ির ভাটি চলে আসত। ঝুড়ি ঝুড়ি তেঁতুল পড়ে থাকত, আখের গাদা, কে কত খাবে।

আমি আমার দুলহাকেও (অর্থাৎ যার সাথে আমার বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক করা হয়েছিল) দেখেছিলাম, বলতে-কি সাথে খেলেছিও। বাবা বিয়ের যৌতুক ইত্যাদি জিনিসপত্রের পুরো ব্যবস্থাও করে ফেলেছিলেন, আরো কিছু টাকার বন্দোবস্ত করার ফিকিরে ছিলেন। মুসলিম বছরের সপ্তম মাস রজবে বিয়ের ব্যবস্থা ঠিক হয়ে যায়।

রাতে মা-বাবা যখন আমার বিয়ের কথাবার্তা বলতেন আমি চুপি চুপি শুনতাম আর শুনে মনে মনে খুব খুশি হতাম। আহা! আমার ভাবী বর করিমনের (একটি ধনাঢ্যের মেয়ে, যে ছিল আমার সমবয়সী) ভাবী বরের চেয়ে কত ভালো ছিল! সে তো ছিল কালো কালো, আর আমার দুলহা ছিল ফর্সা ফর্সা। করিমনের ভাবী

বরের মুখে কেমন যেন বড় বড় দাড়ি আমার ভাবী বরের তো ভালো করে দাড়িই গজায়নি। করিমনের ভাবী বর একটি ময়লাটে ধুতি বেঁধে থাকে, মুগের মতো রংয়ের একটি পাঞ্জাবি পরে আমার ভাবী বর ঈদের দিন কী ঠাটেই না আসত! সবুজ গোলাপী পায়জামা, সেই রংয়ের সাথে মিশিয়ে টুপি, মখমলের জুতো, করিমনের ত্থলহা মাথায় একটি ফেটি বেঁধে খালি পায়ে চলে।

সংক্ষেপে, নিজের অবস্থায় আমি বেশ খুশিই ছিলাম, আর কেন-ই-বা খুশি হব না, এর চেয়ে ভালো অবস্থার কথা আমার কল্পনায় আসত না। আমার সব ইচ্ছেই তাড়াতাড়ি পূরণ হতো বলে মনে হতো।

যতদিন নিজের বাবা-মায়ের ঘরে ছিলাম কোনো আঘাত পেয়েছি বলে আমার মনে নেই। তবে একবার খেলতে যাওয়ার সময় আমার আঙুলের একটি আংটি হারিয়ে যায়। সেটি ছিল কমদামী রুপোর, মনে হয় এক আনার বেশি নয়। এটা এখন বলছি, সে সময়ে আশ্চর্যের কী ছিল যে, কোনো জিনিসের দাম জানতাম না। আংটিটির জন্য এত কেঁদেছিলাম যে চোখ ত্থটো ফুলে গিয়েছিল। মার কাছে সারাটি দিন লুকিয়ে রেখেছিলাম। কিন্তু রাতে আঙুল খালি দেখে মা ব্যাপারটা জানতে চাইলেন আর তখন বলতেই হলো। মা আমার গালে এমন একটি চড় কষালেন যে, আমি চিৎকার করে কাঁদতে থাকি, হিক্কা উঠে গেল। এরই মধ্যে বাবা এসে গেলেন। তিনি আমায় আদর করে শান্ত করলেন, মা-র ওপর অসন্তুষ্ট হলেন। তবে আমি শান্ত হলাম।

নিঃসন্দেহে বাবা আমাকে মায়ের চাইতে বেশি ভালবাসতেন। বাবা আমাকে কোনোদিন ফুলের ছড়িটিও ছোঁয়াননি। মা সামান্য সামান্য কথাতেই মেরে বসতেন। মা ছোট ভাইটিকে খুব ভালবাসতেন। ছোট ভাই-এর জন্য আমি বহুত মার খেয়েছি, তবু কিন্তু আমার তার উপর গভীর ভালবাসা ছিল। মায়ের বিরুদ্ধাচরণ করে কখনো কখনো কয়েকটি প্রহর হয়ত-বা তাকে কোলে নিইনি। কিন্তু যখনই সে মায়ের চোখের বাইরে গিয়েছে তখনই গিয়ে তাকে গলা জড়িয়ে ধরেছি, কোলে তুলে নিয়েছি, আদর করেছি। যখন দেখেছি মা আসছেন, তাড়াতাড়ি কোল থেকে নামিয়ে দিয়েছি, আর ও ফের কাঁদতে শুরু করেছে। এতে মা ভাবলেন, আমিই ওকে কাঁদিয়ে দিয়েছি।

এ সবকিছুই ছিল, কিন্তু মা আমার আঙুল দেখার পর থেকেই অস্থির হয়ে উঠলেন। খাওয়া-দাওয়ার খেয়াল নেই, রাতের ঘুম চলে গেল। কারো কাছে-বা চাইছেন আশীর্বাদ, কারো কাছে-বা তাবিজ। আমার বিয়ের পণের জন্য নিজের গলার হার খুলে নিয়ে বাবাকে দিয়েছিলেন, বলেছিলেন—এটাতে অল্প কিছু রুপো মিশিয়ে আবার তৈরি করে দাও। ত্থয়েকটি নতুন নতুন গহনা পালিশ করিয়ে দাও। ঘরের পুরনো বাসনপত্র ত্থ-চারটি রেখে দিয়ে বাকি সব আলাদা করে দাও, কেননা সেগুলি কলাই করাতে হবে। বাবা বরং বলেছিলেন, নিজেদের ভবিষ্যতের

কথা খেয়াল রেখো। মা বলেন, ওহো, মশায়, হবে! তোমার বোন জমিদারের বিবি, সেও তো জানবে যে ভাই মেয়েকে কিছু দিয়েছে। তোমার বোনের শ্বশুর-বাড়িতে অনেক আছে। শ্বশুরবাড়ির বদনাম হয়ে যাবে। আমার মেয়ে পোশাক গয়না না নিয়ে গেলে লোকে বিদ্রূপ করবে।

মির্জা রুশোয়া সাহেব, আমার মা-বাবার ঘর আর ছেলেবেলাকার অবস্থাটির পুরো নকশা আপনার সামনে এঁকে দিলাম। এবার আপনি বুঝতে পারবেন, এইরকম অবস্থায় আমি খুশি ছিলাম কি অখুশি ছিলাম। আমার মতো নির্বোধের বিচারে তো এইটিই আসে যে আমি ভালোই ছিলাম।

যাযাবরী শুরুর দুঃখের অনুভূতির কারণটি আমি তো বুঝি, কিন্তু একজন অকৃত্রিম সুহৃদকে কি-ই-বা বোঝাবে? আমি হরদম সাধারণ লোককে বলতে শুনেছি যে, বেশ্যা জাতিকে আবার মনে রাখা বা প্রশংসা করার কী আছে, কিছু যে করে না সেটাই কি কম (?) কেননা, তারা এমন ঘর আর এমন পরিবেশে লালিত-পালিত হয় যেখানে খারাপ ছাড়া আর কোনো জিনিসেরই কথাবার্তা হয় না। মা-বোনদের যা দেখে তেমনি ধারা অবস্থাতেই থাকে। কিন্তু যেসব মেয়েরা মা-বাবার ঘর ছেড়ে খারাপ পথে যায়, তারা সেখানে মরে যেখানে জল মেলে না।

আমার অবস্থা যতটুকুই আমি বলেছি ততটুকুই বলে ছেড়ে দেব আর তারপর বলব যে, ব্যস্ এরপর আমি যাযাবরী হয়ে গেলাম। তার ফলে এই ধারণা হবে যে হতভাগিনীর শাদি হতে দেরি হয়, তার ফলে কারো সাথে চোখ বিনিময় করে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে, আরেকটির সাথে মেলামেশা চলে। তারপর এর সাথেও বনিবনা হয় না। শেষ অবধি ধীরে ধীরে এটিই পেশা হয়ে যায়। হামেশা এই ঘটনাই ঘটছে। আমার জীবনে বহু বউ-বেটিকে খারাপ হয়ে যেতে দেখেছি, শুনেছি। এর কারণও আছে কয়েকটি। একটি হচ্ছে, সেয়ানা হয়েছে, মা-বাপ বিয়ে দেয়নি। দ্বিতীয়টি হল, বিয়ে নিজের পছন্দমাফিক হয়নি, মা-বাপ যেখানে পেরেছেন ঠেলে দিয়েছেন, বয়সের হিসেব নেননি, চেহারার ছিরি-ছাঁদ দেখেননি, মেজাজের বিবেচনা করেননি। স্বামীর সাথে বনিবনা না-হওয়ায় একলা বেরিয়ে পড়েছে। অথবা যৌবনে আকাশ মাথায় ভেঙে পড়েছে, বিধবা হয়ে গেছে। দেরি সয়নি, আরেকটিকে নিয়েছে। অথবা কুসংসর্গে পড়ে ভবঘুরে হয়ে গেছে। কিন্তু হতভাগিনী অপদার্থ আমাকে কপাল ও দুর্ঘটনা নিরুপায় করে এমন একটি জঙ্গলে ছেড়ে দিল যেখান থেকে বিপথে যাওয়া ছাড়া আর কোনো পথ ছিল না। দিলবর খাঁ, যার বাড়ি ছিল আমার বাড়ির কাছেই, ডাকাতদের সাথে মুখপোড়াকে পাওয়া যায় লখনৌতে। দিলবর খাঁ জেল খেটেছে কয়েক বছর। জানিনে, সে সময়ে কার সুপারিশে সে জেল থেকে খালাস পায়। আমার বাবার উপর ছিল তার একটা ভয়ানক বিদ্বেষ। কারণটি এই যে ফৈজাবাদে সে যখন গ্রেপ্তার হয় তখন তার চালচলন সম্বন্ধে অনুসন্ধানের জন্য আমাদের মহল্লা

থেকে যেসব লোক ডাকা হয় বাবা ছিলেন তাদের মধ্যে একজন। বেচারি ছিলেন একজন অকপট মনের সত্যবাদী। তদন্তকারী কর্তা যখন তাঁর হাতে কোরাণ দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'ওহে জমাদার, তুমি সত্যিই বল তো এ লোকটি কেমন?' বাবা তার চালচলন সম্বন্ধে সাফ সাফ সব বলে দিলেন। আর তাঁর সাক্ষ্যেই দিলবর খাঁর জেল হয়ে গেল। এ কথাটি শুনেছিলাম আমি মায়ের কাছ থেকে। সেই বিদ্বেষই সে মনে রেখে দিয়েছিল। সে জেল থেকে বেরিয়ে আসার পর বাবাকে জব্দ করতে একটি পায়রা পেয়ে গেল। একদিন সে বাবার পায়রা মেরে ফেলল। পায়রা আনার জন্য গেলে সে দিল না। বাবা দিতে চেয়েছিলেন চার আনা আর সে চায় আট আনা। বাবা তো চাকরি করতে চলে গেলেন। খোদা জানেন, আমি ঝটপট কেন বেরিয়েছিলাম। দেখছি কি যে, সে তেঁতুল গাছের তলায় দাঁড়িয়ে রয়েছে, বলল, 'চলো বেটা, তোমার বাবা পয়সা দিয়ে গেছেন, কবুতরটি নিয়ে যাও'। আমি ওর ফাঁদে পড়ে গেলাম। ওর সাথে চলে এলাম। ঘরে গিয়ে দেখি মরা পাখিটা নেই। ঘর খালি। এদিকে আমি ঘরে যেতেই ও ভেতর দরজা বন্ধ করে দিল। চিৎকার করতে চাইলাম, ও আমার মুখে ছেঁড়া ন্যাকড়া গুঁজে দিল। আমার দুটো হাত রুমাল দিয়ে দিল বেঁধে। এই বাড়িটির আরেকটি দরজা ছিল অন্যদিকে। আমাকে মাটিতে বসিয়ে রেখে নিজে গিয়ে সেই দরজাটি খুলল। পীরবক্স বলে ডাকতে পীরবক্স ভিতরে এল। দুজনে মিলে আমাকে একটি গরুর গাড়িতে চাপিয়ে গাড়িটি চালিয়ে বেরিয়ে পড়ল। আমি হতভম্ব, নিথর। তলার শ্বাস তলায়, উপরটি উপরে, করবই-বা কি। কোনো সুযোগ নেই। কলাবাগানের ভিতরে রয়েছি। দিলবর খাঁ দুচাকার গাড়ির ভিতর আমাকে হাঁটুর নীচে চেপে বসে আছে। হাতে ছুরি মড়াটার চোখ থেকে রক্ত ঝরছে, পীরবক্স গাড়ি হাঁকাচ্ছে, গরুগুলো যেন উড়ে চলেছে।

কিছু পরেই সন্ধ্যে হয়ে গেল। চারদিকে আঁধার ছেয়ে গেল। শীতকাল। শন্ শন্ হাওয়া বইছে। ঠাণ্ডায় আমার শিরাগুলি কাঁপছে। দম বেরিয়ে যাচ্ছে, চোখে জল আসছে। মনে আসছে, হায় কী বিপদেই না পড়লাম। বাবা হয়ত চাকরি থেকে ফিরে এসেছেন, আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন। মা ...। ছোট ভাইটি হয়ত খেলছে। ও কেমন করে টের পাবে যে তার বোনটি কী বিপদে পড়েছে। মা বাবা ভাই কাজির দালান, উঠোন, রসুইখানা, বাড়ির সব আমার চোখের সামনে ভাসছে। একদিকে এইসব চিন্তা-ভাবনা আর আরেকদিকে প্রাণের ভয়। দিলবর খাঁ থেকে থেকেই ছুরি দেখাচ্ছে। আমার মনে হচ্ছিল, যে কোনো মুহূর্তে ছুরিটা আমার কলিজা ফুঁড়ে দেবে। এখন আর মুখে ছেঁড়া কাপড় নেই। কিন্তু ভয়ের চোটে মুখ থেকে আওয়াজ বেরোল না। এদিকে আমার এই অবস্থা আর ওদিকে দিলবর খাঁ ও পীরবক্স হেসে হেসে কথা বলছে, আমার মা-বাবার উপর

আর আমার উপর কথায় কথায় গালি পাড়ছে।

দিলবর খাঁ : দেখলে ভাই পীরবক্স, সিপাইয়ের ছেলে বার বছর বাদে নিজের বদলা নিয়েছে। এখন কেমন ছটফট করে ফিরতে হবে।

পীরবক্স : ভাই, প্রবাদ পুরো করলে, তোমার কয়েদ হলো তো বার বছর হয়েছে।

দিলবর খাঁ : পুরো বারটা বছরই হয়েছে, ভাই, লখনৌ-এ কত কষ্টই না পেয়েছি, যাক, ও-ও তো কিছুদিন স্মরণ করবে। এটা তো আমার পয়লা ঘা দেয়া ...। আমি তো ওকে জানেই মেরে দেব।

পীরবক্স : এ মতলবও আছে নাকি ?

দিলবর খাঁ : কী বুঝছ, তুমি। জানে না মারি তো পাঠানের বাচ্চা-ই নই।

পীরবক্স : তুমি ভাই খাঁটি বংশের ছেলে, যা বলবে তা করে দেখাবে।

দিলবর খাঁ : দেখবে।

পীরবক্স : আর এর কী করবে ?

দিলবর খাঁ : কী করব, এখানেই কোথাও মেরে নালায় পুঁতে দেব। রাত থাকতেই ঘরে চলে যাব।

একথা শুনে নিজের মরার বিষয়ে স্থিরনিশ্চয় হয়ে গেলাম। চোখে জল রুদ্ধ হয়ে গেল। মনে একটা ধাক্কার মতো লাগল। ঘাড় বেঁকে গেল। হাত-পা নেতিয়ে গেল। এ অবস্থা দেখেও দয়া হলো না। আর আমার বুকে জোরে একটা ঘুষি মারল। আমি যন্ত্রণায় কুঁকড়ে গেলাম, প্রায় পড়ে যাই আর কি।

পীরবক্স : একে তো মেরে ফেলবে, আর আমার পয়সা ?

দিলবর খাঁ : গলিতে গলিতে জল।

পীরবক্স : কোথা থেকে দেবে ? আমি তো অন্য কিছু বুঝেছিলাম।

দিলবর খাঁ : বাড়ি চল, আর কোথা থেকে না পারি তো পায়রা বেচে টাকা দেব।

পীরবক্স : তুমি বোকা। পায়রা বেচবে কেন ? আমি একটা কথা বলি না।

দিলবর খাঁ : বল।

পীরবক্স : লখনৌ-এ গিয়ে ছুকরিকে বেচে পয়সা করে নিই।

যখন থেকেই নিজের মরার বিষয়ে স্থিরনিশ্চয় হয়ে গিয়েছিলাম তখন থেকেই দুজনের কথা ঠিকমত কানে শুনতে পাচ্ছিলাম না। এমন মনে হচ্ছিল, যেন কারা স্বপ্নে কথাবার্তা বলছে। পীরবক্সের কথা শুনে আমার মন কিছুটা ঠাঁই পেল। মনের গহন থেকে পীরববক্সকে আশীর্বাদ করতে লাগলাম। কিন্তু এখন কেবল আশা যে পীড়নকারীটি কী বলে।

দিলবর খাঁ : আচ্ছা দেখা যাবে। এখন তো চলে চল।

পীরবক্স : এখানে একটুখানি দাঁড়িয়ে যাও না। ঐ সামনের গাছটার নিচে

আগুন জ্বলছে। একটুখানি আগুন নিয়ে আসলে হুঁকো ভরব।

পীরবক্স তো আগুন আনতে চলে গেল। তখন আমার এই খেয়াল হলো যে, পীরবক্স আসতে আসতে এ আমার কাজ না শেষ করে ফেলে। প্রাণের ভয়টা বড় খারাপ। একদফা জোর চিৎকার করে উঠলাম। চিৎকারে দিলবর খাঁ আমার মুখে কষে কষে দু-তিনটে ঘুষি লাগাল, 'হারামজাদী চুপ না করবি তো ছুরি ঢুকিয়ে দেব।'

পীরবক্স : (কিছুটা দূর অবধি গিয়ে থাকবে) না ভাই না, এরকম কাজ করবে না, তোমাকে আমার মাথার দিব্বি। আমার ইচ্ছেটা পূরণ করতে দাও।

দিলবর খাঁ : আচ্ছা যাও, আগুন তো নিয়ে এসো।

পীরবক্স চলে গেল আর কিছু পরেই আগুন নিয়ে এল। হুঁকো ভরে দিলবর খাঁকে দিল।

দিলবর খাঁ : (একবার হুঁকো টেনে) তো একে কত টাকায় বিক্রি করা যাবে। আর বেচবে কে ? কোথাও আবার ধরা না পড়ি। তাহলে আরো মুশকিল হবে।

পীরবক্স : এর ভার আমার। আমি তো বেচে দেব। আরে মিঞা, তোমার কথা ধরবে কে ? লখনৌ-এ এব্যাপার ঘটছে দিনরাত। আমার শালাকে জান ?

দিলবর খাঁ : করিম !

পীরবক্স : হ্যাঁ, ওর রুটি এর পরেই। বহুত ছেলে মেয়ে ধরে নিয়ে গেছে। লখনৌ-এ গিয়ে দরদাম করবে।

দিলবর খাঁ : আজকাল আছে কোথায় ?

পীরবক্স : কোথায় থাকবে ? লখনৌ-এ গোমতীর ওপারে ওর শ্বশুরবাড়ি, ওখানেই হবে।

দিলবর খাঁ : ভালো ছেলেমেয়েরা কত করে বিক্রি হয় ?

পীরবক্স : যেমন চেহারা হবে।

দিলবর খাঁ : ভালো, এ কতকে বিক্রি হবে ?

পীরবক্স : শ'-দেড় শ', তোমার যেমন বরাত হবে।

দিলবর খাঁ : ভাইয়ের কথা, শ'-দেড় শ', এর চেহারাই বা কী। এক শ'-ই তো বেশি।

পীরবক্স : আচ্ছা, তাতে কী। নিয়ে তো চলো। মেরে ফেললে আর লাভ কী ?

এরপর দিলবর খাঁ পীরবক্সের কানে ঝুঁকে কিছু বলল, যা আমি শুনতে পাইনি। পীরবক্স জবাব দিল : ও তো আমি বুঝেইছিলাম। তুমি কেমন করে এমন বেওকুফ হলে ?

রাতভর গাড়ি চলল, আমার জীবন ছিল শ্বাস-প্রশ্বাসে। মৃত্যু ঘুরছিল চোখের

সামনে। শক্তি ছিল না, রং ছিল না, আপনি হয়ত শুনেছেন, শূলের উপরও ঘুম আসে। কিছু পরেই চোখ বুজে গেল। আল্লাকে ভয় করে পীরবক্স গরুর কম্বল দিয়ে আমাকে ঢেকে দিল। রাতে বারকয়েক চমকে উঠি। চোখ খুলে যাচ্ছিল, কিন্তু ভয়ে চুপচাপ পড়ে ছিলাম। শেষ অবধি একবার মুখ থেকে ভয়ে ভয়ে কম্বলটি সরিয়ে যা দেখলাম তাতে মনে হলো যে গাড়িতে আমি একাই রয়েছি। পর্দার ভিতর থেকে উঁকি মেরে দেখি যে সামনে কিছু কিছু কাঁচা বাড়ঘর। একটি বেনের দোকান, দিলবর ও পীরবক্স কিছু কিনছে, গরু বড় একটি গাছের তলায় ভুষি খাচ্ছে। দুটো তিনটে গেঁয়ো বসে আগুন তাপাচ্ছে, ছিলিম টানছে। কিছু পরে পীরবক্স গাড়ির পাশে এসে কিছু ভাজা চানা দিল। রাতভর আমি ছিলাম খিদেয় কাতর। খেতে শুরু করলাম। কিছু পরে সে এক লোটা জল এনে দিল। আমি একটুখানি খেয়ে আবার চুপ করে পড়ে রইলাম।

গাড়িটি বহুক্ষণ এখানে থেমে রইল। ফের পীরবক্স গরুগুলিকে গাড়িতে জুতল। দিলবর খাঁ হুঁকো সেজে নিয়ে আমার পাশে এসে বসল।

গাড়িটি রওনা হলো। আজ দিনভর আমাকে বেশি কোনো পীড়ন করা হয়নি। না দিলবর খাঁ বের করল ছুরি, না পড়ল আমার উপর তার ঘুষি, কোনো হৃদ্যতাও না। দিলবর খাঁ আর পীরবক্স দুজনেই জায়গায় জায়গায় হুঁকো সেজে নিয়ে টানতে থাকল, কথাবার্তা বলতে লাগল। কথাবার্তা বলতে বলতে ক্লান্ত হয়ে পড়লে কিছু গান গাইতে শুরু করল। একজন গাইছে আর দ্বিতীয়জন চুপ করে শুনছে। শুনছে আর কী-ই-বা, ভাবছে এখন কী কথা বলবে, তবু কিছু কথা বেরুল। এইসব কথাবার্তায় হরদম এমনও হতে থাকল যে নিজেদের মধ্যে গালাগালিও চলল। জামার আস্তিন গুটানো হলো, কোমর বাঁধাও চলল। একজন গাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়ল তো আরেকজন। সেখানেই গলা চেপে ধরার জন্য তৈরি। শেষে দুজনেই কথায় ঢিল দিল। কথাবার্তা ক্রমে ক্রমে শেষ হয়ে গেল। আবার সখ্য হয়ে গেল। বন্ধুত্বের কথা হতে থাকল। যেন কোনো ঝগড়াই হয়নি।

একজন : তোমার আমার মধ্যে ঝগড়ার কথাই-বা কী ছিল।

দ্বিতীয় : কথাটাই-বা ছিল কী।

প্রথম : আচ্ছা, বেশ, কথাটা যেতে দাও।

দ্বিতীয় : যেতে দাও।

২

ওহে ব্যাধ,
বন্দিনীর এ প্রথম রাতে
অনুমতি দাও তারে
পাখা ঝাপটাতে।

বন্দীদশার প্রথম রাতের অবস্থাটি তো আপনি শুনেছেন। সেই অসহায়তা দমবন্ধ না হওয়া অবধি ভুলব না। নিজেরই বিস্ময় লাগে কী করে জানটা বেঁচে গেল। হায়, কী কঠিন প্রাণই না ছিল, যে দম বেরুল না! ওরে নফর দিলবর, পৃথিবীতে যাহোক সাজা তো দিয়েছিস, কিন্তু তাতে আমার মনে কী শান্তি! মুখের দলাদলা মাংস যদি কেটে কেটে কাক চিলকে খাওয়াতিস তবুও আমার মুখ থেকে আহ্ শব্দ বেরুত না। মনে হচ্ছিল কবরের মধ্যে তোর উপর নরক দিনরাত খসে খসে পড়ছিল। আর খোদা চান তো শেষ বিচারের দিন এর চেয়েও খারাপ অবস্থা হবে।

হায়, আমার মা-বাবার কী অবস্থা হয়েছে। প্রাণে কী দুঃখই-না দিচ্ছে।

ব্যস, মির্জা সাহেব, আজ এই পর্যন্তই বললাম, বাকি কাল বলব। এখন আমার প্রাণ যেন বেরিয়ে আসছে। মন যেন চাচ্ছে খুব চিৎকার করে কাঁদি

আপনি আমার এ ভবঘুরে দিনগুলি কেটে যাওয়ার কথা শুনে কী আর করবেন। ভালো হয় যে এই পর্যন্তই থাকতে দিন। আমি তো বলছি দিলবর খাঁ যদি আমাকে মেরেই ফেলত তো ভালো হতো। এক মুঠো ধুলোয় আমার সব লজ্জা ঢেকে যেত। মা-বাবার সম্মানে দাগ লাগত না। দেশের ও ধর্মের অসম্মান তো ঘটত না।

হ্যাঁ, আমি আরেকবার মাকে দেখেছি। কবে তাঁকে দেখেছি, তা এক যুগ হবে! এখন খোদা জানেন, তিনি বেঁচে আছেন, না, মরে গেছেন। শুনেছি যে, ছোট ভাইয়ের মাশাআল্লাহ্ নামে চোদ্দ-পনের বছরের একটি ছেলে আছে, দুটি মেয়ে আছে। আমার কোনো অধিকার নেই, তবু মন চায় একবার দেখে আসি। এমন দূরও কিছু নয়। মাত্র একটি টাকায় লোকে ফৈজাবাদ পৌঁছে যেতে পারে। কিন্তু কী করব, আমি নিরুপায়। সেকালে যখন কোনো রেল চলত না, লখনৌ থেকে ফৈজাবাদ ছিল চার দিনের পথ। কিন্তু পাছে বাবা পিছু নেন, দিলবর খাঁ সেই ভয়ে, জানি না কোন্ ঘুরপথে আমাকে নিয়ে এল যে আমি আট দিনে লখনৌ

পৌঁছলাম। আমি হতভাগিনী কি জানি যে লখনৌ কোথায়? কিন্তু দিলবর খাঁ আর পীরবক্সের কথাবার্তা থেকে এটুকু বুঝেছিলাম যে এই লোকেরা আমাকে সেখানেই নিয়ে যাচ্ছে। বাড়িতে আমি লখনৌ-এর নাম শুনতাম, কেননা আমার নানা এখানেই কোনো মহল্লায় সিপাহীর কাজ করতেন। ঘরে তার কথাবার্তা হতো। একবার উনি ফৈজাবাদেও গিয়েছিলেন। আমার জন্য নিয়ে গিয়েছিলেন অনেক মিঠাই আর খেলনা। আমি ওঁকে বেশ ভালো করেই জানতাম।

লখনৌতে গোমতীর ওপারে করিমের শ্বশুরবাড়িতে ওরা আমাকে নামাল। ছোটমত কাঁচা ঘর। করিমের শাশুড়ী মতী ধোয়ার কাজ করে বলে মনে হলো। সে আমাকে ঘরে নিয়ে গেল। একটি কুঠরিতে বন্ধ করে দিল। ভোরেই লখনৌ পৌঁছেছিলাম। দুপুর পর্যন্ত আটক রইলাম। আবার কামরার দরজা খুলে গেল। একটি জোয়ানের মতো মেয়েছেলে (করিমের স্ত্রী) তিনটে রুটি, একটি মাটির ভাঁড়ে এক চামচ মুসুরীর ডাল আর এক ঘটি জল আমার সামনে রেখে চলে গেল। এ সময়ে এই জিনিসগুলিই উপাদেয় হয়ে উঠল। আট দিন হয়ে গেল ঘরে তৈরি খানা কপালে জোটেনি। রাস্তায় ছাতু আর চানা ছাড়া কিছু মেলেনি।

আধবদনার মতো জল খেয়ে মাটিতে পা ছড়িয়ে দিয়ে শুয়ে পড়লাম। খোদা জানেন কতক্ষণ শুয়ে ছিলাম। কেননা ঐ আঁধার কুঠরিতে দিন রাত বোঝা সম্ভব না। এরই মধ্যে কয়েকবার চোখ খুলে গেল। চারদিকে আঁধার—আশেপাশে কেউ নেই। কখনো ওড়নায় মুখ ঢেকে পড়ে থাকি পরে ঘুম আসে। তিন-চারবার যে চোখ খুলে গেল তারপর আর ঘুম আসে না। জেগে পড়ে রইলাম। এর মধ্যে ডাইনী মূর্তি করিমের শাশুড়ী বিড়বিড় করে বকতে বকতে ভিতরে এল, আমি উঠে বসলাম।

'ঠাকরুণ তো শুয়ে থাকছেন। রাতে চিৎকার করতে করতে গলা পড়ে গেল। ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে তুললেও দম পর্যন্ত নেয়নি। আমি তো ভাবলাম সাপ শুঁকে গেছে। আরে, এবার ঠাকরুণ উঠে বসেছেন।'

আমি চুপ করে শুনতে থাকি। বেশ বকাবকি করার পর জিজ্ঞেস করল—

'পেয়ালা কোথায়?'

আমি হাতে উঠিয়ে দিলাম। ও নিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেল। কুঠরির দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

কিছুক্ষণ পরে করিমের স্ত্রী এল। এই কুঠরিতে একটি জানালা ছিল, সেটি সে খুলে দিল। আমাকে বাইরে নিয়ে এল।

একটি ভাঙাচোরা মতো পোড়ো বাড়ি। এখান থেকে আকাশ দেখার ভাগ্য হলো। কিছুক্ষণ বাদেই আবার সেই অন্ধকার কুঠরিতে বন্ধ করে দিল। আজ খাবার জন্যে মিলল অড়হরের ডাল আর মোটা দানা জোয়ার।

এইভাবে কাটল দুদিন। তৃতীয় দিনে আমার চেয়ে বয়সে দু-তিন বছরের

বড় আরেকটি মেয়েকে নিয়ে এসে এই কামরায় বন্ধ করল। খোদা জানেন, করিম কোথা থেকে একে ফুসলিয়ে নিয়ে এসেছিল। কীরকম হয়রানিতে কাঁদছিল। এর আসাটা আমার কাছে আশীর্বাদ হয়ে গেল। ওর কান্নাকাটি চুকে গেলে চুপিচুপি কথাবার্তা হতে লাগল।

একটি বেনের মেয়ে, নাম রামদেই। সাতাপুরের পাশে একটি গাঁয়ে ও থাকত। আঁধারে ওর চেহারা দেখা গেল না। যখন পরের দিন নিয়মমাফিক জানালাটা খুলে গেল তখন ও আমাকে দেখল, আমিও ওকে দেখলাম। ফর্সা ফর্সা, বেশ ভালো নাক নক্সা, লম্বায় একটু বেঁটে।

ছ দিনের দিন ঐ আঁধার কুঠুরি থেকে ওর মুক্তি ঘটল। আমি ওখানেই রয়ে গেলাম। কপালে আবার সেই নির্জনবাস।

পুরো দুটো দিন একলাই ওখানে থাকলাম। তৃতীয় দিন রাতের বেলায় দিলবর খাঁ আর পীরবক্স এসে আমাকে বাইরে বের করে ওদের সাথে নিয়ে চলল। প্রথমে একটি মাঠ, আবার একটি বাজার হয়ে রাস্তা দিয়ে আবার একটি পুলের উপর আসলাম। নদীতে তরঙ্গ খেলছে। ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। আমি কাঁপতে কাঁপতে যাচ্ছিলাম। কিছুদূর পরে আবার একটি বাজার মিলল। এটি পেরিয়ে একটি অপ্রশস্ত গলিপথে অনেকদূর যেতে হলো। পা আর চলছিল না। এরপর আর একটি বাজার। এ বাজারে বেশ ভিড়, রাস্তা পাওয়া ভার। এবার একটি বাড়ির দরজায় এসে পৌছলাম।

মির্জা রুশোয়া সাহেব আপনি কি বুঝতে পেরেছেন এ বাজারটি কী ধরনের? এটি ছিল সেই বাজার যেখানে রয়েছে আমার ইজ্জত বিক্রির দোকান, মানে, চক। আবার এটা হচ্ছে সেই বাড়ি যেখানে থেকে সুনাম দুর্নাম, ধন মান, গৌরব অগৌরব—যা কিছু দুনিয়ায় আমার পাওনা ছিল সেসব মিলেছে। তার মানে, আমার সামনে এখন খানুমজানের বাড়ির দরজাটি খোলা। অনতিদূরেই সিঁড়ি, বেয়ে উপরে গেলাম।

বাড়িটির আঙিনা দিয়ে সদর দালানের ডাইনের দিকে একটি প্রশস্ত দালানে খানুমজানের কাছে গেলাম।

খানুম সাহেবাকে আপনি দেখে থাকবেন। সে সময়ে ওঁর বয়স ছিল পঞ্চাশের কাছাকাছি। কি ভারিক্ক চেহারার ছিলেন তিনি। রং তো ছিল শ্যামবর্ণ। কিন্তু এরকম গম্ভীর রুচিকর পোশাকের স্ত্রীলোক দেখিনি বা শুনিনি। মাথার চুলের সামনের গোছাগুলি বেশ সাদা, ওঁর চেহারায় বেশ দেখাচ্ছিল। মাথায় সাদা সূক্ষ্ম মসলিনের চুড়িদার দোপাট্টা, পরনে সোনালি সুতোর ঢিলে পায়জামা, হাতে বড় বড় নিরেট সোনার ব্রেসলেট। কানে সাদা দুটো দুল। মেয়ে বিসমিল্লা-জানের রং-ঢং ছিরি-ছাঁদ সব একই রকমের। কিন্তু মায়ের সেই মহিমাশ্রী কই? খানুমের সেদিনের চেহারাটি আমার আজও মনে আছে। কার্পেটে মোড়া একটি

নিচু পালঙ্কে তিনি বসেছিলেন। পদ্মফুলের পাপড়ির মতো কাঁচের মধ্যে বাতি জ্বলছিল। চমৎকার নকশাকাটা পানদান সামনে রয়েছে, খোলা লম্বা নল দিয়ে গড়গড়া টানছিলেন। সামনে নৃত্যপরা শ্যামলী মেয়েটি (বিসমিল্লাজান)। আমরা যাওয়ার পর নাচ বন্ধ হলো। সব লোক কামরার বাইরে চলে গেল। মামলা তো প্রথমেই চুকে গিয়েছিল।

খানুমজান : এই ছুকরিটি ?

দিলবর খাঁ : জি, হাঁ।

আমাকে পাশে ডেকে নিলেন। চু চু শব্দ করে বসালেন থুতনিটি তুলে চেহারাখানা দেখলেন।

খানুমজান : আচ্ছা, তা আমি যা বলেছি তা আমার কাছে মজুত রয়েছে। দ্বিতীয় ছুকরিটির কী হলো ?

পীরবক্স : ওর মামলা তো মিটে গেছে।

খানুম : কততে ?

পীরবক্স : দুশো টাকায়।

খানুম : বেশ, কিন্তু কোথায় হলো ?

পীরবক্স : এক বেগম সাহেবা নিজের ছেলের জন্য কিনে নিয়েছেন।

খানুম : ছিবি-ছাঁদে ভালোই ছিল। ঐ রকম টাকা আমিও দিতাম, কিন্তু তুমি ব্যস্ত হলে—

পীরবক্স : আমি আর কী করি, আমি তো অনেক বুঝিয়েছি, কিন্তু আমার শালা শুনল না।

দিলবর খাঁ : চেহারা তো এরও ভালো। আগে আপনার পসন্দ।

খানুম : যাহোক, লোকের বাচ্চা তো বটে!

দিলবর খাঁ : বেশ, যা আছে সে তো আপনার সামনে হাজির আছে—

খানুম : আচ্ছা, তোমারই জিদ বজায় রইল। একথা বলে হুসেনিকে ডাকলেন। হুসেনি, শ্যামবর্ণা মোটাসোটা মাঝবয়সী একটি স্ত্রীলোক এসে সামনে দাঁড়াল।

খানুম : হুসেনি!

হুসেনি : খানুম সাহেবা!

খানুম : গহনার বাক্সটি আন।

হুসেনি গিয়ে গয়নার বাক্সটি নিয়ে এল। খানুম সাহেবা সেটি খুললেন। এক কাঁড়ি টাকা দিলবর খাঁয়ের সামনে রাখলেন। পরে জেনেছি, সওয়া শো টাকা দিয়েছিলেন।

এর মধ্য থেকে কিছু টাকা পীরবক্স তার রুমালে বাঁধল। (শুনেছি পঞ্চাশ টাকা) বাকিটা দিলবর খাঁ রাখল নিজের থলেতে। দুজনে সালাম জানিয়ে বেরিয়ে গেল। ঘরে রইলাম খানুম সাহেবা, পিসি হুসেনি আর আমি।

খানুম সাহেবা : (হুসেনিকে) হুসেনি, মেয়েটি তো এত টাকায়ও কিছু চড়া দামের হয়নি বলেই মনে হচ্ছে।

হুসেনি : চড়া ? আমি তো বলছি সস্তা-ই হয়েছে !

খানুম : সস্তাও খুব একটা হয়নি, তবে চেহারা তো বেশ সাদাসিধে খোদা জানেন, কার মেয়ে। হায়, মা-বাপের কী হাল-ই যে হয়েছে ! খোদা জানেন, কোথা থেকে এদের এভাবে ধরে আনে। খোদার ডর নেই একটুও। বোন হুসেনি, আমরা বিলকুল নির্দোষ। পাপ-তাপ যা কিছু ওদের ঘাড়েই পড়বে, আমাদের কী ! আর এখানে না বিকোলে অন্য কোথাও তো বিকোত !

হুসেনি : খানুম সাহেবা, এখানে ও ভালোই থাকবে। শোনেননি অভিজাতদের ঘরে ক্রীতদাসীদের কী হাল হয় ?

খানুম : শুনব না কেন ? এই তো সেদিনের খবরে জানি, সুলতান জাহান বেগম তার বাঁদীকে তার স্বামীর সাথে কথা বলতে দেখে তাকে শিক ছ্যাকা দিয়ে মেরে ফেলেছে।

হুসেনি : এরা পৃথিবীতে যা খুশি তাই করছে। শেষ বিচারের দিন এইসব বিবিদের উপর বাজ পড়বে।

খানুম : বাজ পড়বে, নরকে আচ্ছা ধোলাই হবে।

হুসেনি : বেশ হবে, মুখপুড়িদের এই সাজাই ঠিক।

এরপর হুসেনি পিসি খুব মিনতি করে বলল, 'বিবি ছুকরিকে আমার কাছে দিন, আমি লালন-পালন করি। জিনিস তো আপনারই, আমি সেবা করব।'

খানুম : তুমিই পালন কর।

এ পর্যন্ত হুসেনি পিসি দাঁড়িয়েছিলেন। এই কথাবার্তা হওয়ার পর আমার পাশে এসে বসলেন, আমার সাথে কথা কইতে শুরু করলেন—

হুসেনি : খুকি, কোত্থেকে এসেছ ?

আমি : (কেঁদে) বাংলা থেকে।

হুসেনি : (খানুমকে) বাংলা কোথায় ?

খানুম : আহা, বোকা নাকি ? ফৈজাবাদকে বাংলাও বলে।

হুসেনি : (আমাকে) তোমার বাবার নাম কী ?

আমি : জমাদার।

খানুম : তুমিও তো কষ্ট দিচ্ছ ! ভালো রে, ও নাম কী জানবে, এখনো তো শিশু।

হুসেনি : বেশ, তোমার নাম কী ?

আমি : আমীরন।

খানুম : ভাই, এ নাম আমার পছন্দ নয়, আমি তো উমরাও বলে ডাকব।

হুসেনি : শুনলে তো খুকি, উমরাও বলে ডাকলে সাড়া দেবে। বিবি যখন 'উমরাও' বলে ডাকবেন, তুমি বলবে, 'জি'।

সেইদিন থেকে আমার নাম হয়ে গেল উমরাও, কিছুকাল বাদে আমি যখন রাঁড়ী বলে গণ্য হলাম, লোকে ডাকতে লাগল 'উওরাওজান' বলে।

খানুম সাহেবা মরার দিন পর্যন্ত ডাকতেন উমরাও বলে, হুসেনি পিসি বলতেন উমরাও সাহেবা। এরপর হুসেনি পিসি আমাকে তাঁর নিজের ঘরে নিয়ে গেলেন। ভালো ভালো খাবার খাওয়ালেন, মিঠাই খাওয়ালেন, হাত-মুখ ধুইয়ে দিয়ে নিজের পাশে শুইয়ে রাখলেন।

আজ রাতে মা-বাবাকে স্বপ্ন দেখলাম। বাবা যেন চাকরি করার পর বাড়ি ফিরেছেন, মিঠাইয়ের ঠোঙা হাতে, ছোট ভাইটি সামনে খেলছে, তাকে মিঠাই বের করে দিচ্ছেন। আমাকে জিজ্ঞেস করছেন, যেন আমি আরেকটি ঘরে রয়েছি। মা রয়েছেন রান্নাঘরে। এরি মধ্যে বাবাকে দেখেই দৌড়ে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। কেঁদে কেঁদে নিজের কথা বললাম।

স্বপ্নে এত কেঁদেছি যে হেচকি উঠতে লাগল। হুসেনি পিসি আমার ঘুম ভাঙিয়ে দিলেন। চোখ মেলতেই কী দেখলাম, সে ঘর, না সে বাড়ি, বাবা-ই বা কোথায় মা-ই বা কই, হুসেনি পিসির কোলে শুয়ে কাঁদছি। হুসেনি পিসি চোখ মুছিয়ে দিচ্ছেন। ঘরে বাতি জলছিল, দেখলাম হুসেনি পিসির চোখ দিয়েও দরদর অশ্রু ঝরছে।

ব্যাপারটা হলো এই যে, হুসেনি পিসি ছিলেন মহৎ অন্তঃকরণের স্ত্রীলোক। আমাকে এত স্নেহ করতে লাগলেন যে, অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই নিজের মা-বাবার কথা ভুলে গেলাম আর না-ভুলেই-বা করতাম কী? একেই তো নিরুপায়, তার উপর আবার নতুন ঢং, নতুন রং, ভালো ভালো খাবার, যা আমি কখনো স্বপ্নেও দেখিনি। তিনটি মেয়ে বিসমিল্লাজান, খুরশিদজান, আমিরজান খেলতে, দিনরাত নাচগান করতে, জলসায়, আমোদ-প্রমোদে, মেলায়, বাগানে বেড়ানোয় —সর্বত্রই। এমন কোনো আরাম-বিলাস ছিল না যার কোনো যোগাড় ছিল না।

মির্জা সাহেব, আপনি বলবেন যে, আমার মনটা ছিল বড় কড়া, অতি অল্পেই মা-বাবাকে ভুলে গিয়ে খেলাধুলোয় মজে গিয়েছিলাম। আমার বয়সও ছিল কম কিন্তু খানুমের বাড়িতে এসেই আমার মনটা যেন এই জ্ঞানসমৃদ্ধ হয়ে উঠল যে, এখানেই এখন থেকে আমাকে জীবনভর কাটাতে হবে। যেমন নতুন কনে নিজের শ্বশুরবাড়ি গেলেই মনে করে যে সে দু-এক দিনের জন্য এখানে আসেনি বরং সারাটা জীবন তাকে এখানে কাটাতে হবে, ঠিক তেমনি ছিল আমার অবস্থা। রাস্তায় মুখপোড়া ডাকাতদের হাতে যে কষ্টটা পেয়েছিলাম তার তুলনায় খানুমের আশ্রয় তো স্বর্গ। মা-বাবার সাথে মিলিত হবার কোনো সম্ভাবনাই আমার ছিল না বলে মনে হলো। আর যে জিনিসটি অসম্ভব তার আশাও আর থাকে না। ফৈজাবাদ থেকে লখনৌ ছিল মাত্র ৪০ কোশ। কিন্তু সে সময়ে আমার মনে হয়েছিল বহুত দূর। ছেলেবেলার বোধ-বুদ্ধি আর এখনকার বোধ-বুদ্ধিতে বড়ই তফাত মনে হয়।

৩

বহে না তো জীবনের ধারা
এক খাতে চিরকাল।
ভালো হয় মানসিক প্রবণতা যদি
চলে তার সাথে রেখে তাল॥

মির্জা রুশোয়া সাহেব : খানুমের বাড়ির কথাটি হয়ত-বা আপনার মনে থাকবে, কত কামরা, আর সেগুলিতে কত বাঈজি। বিসমিল্লা (খানুমের মেয়ে। আর খুরশিদ ছিল আমার সমবয়সী। ওদের আজও মহিলাদের মধ্যে গুনতি করা হয়নি, ওদের বাদ দিয়ে বাকি দশ এগারজন থাকত আলাদা আলাদা কামরায়। তাদের প্রত্যেকের জন্য সেবা করার দাস-দাসী ছিল পৃথক। প্রত্যেকের দরবার ছিল পৃথক। ওরা সবাই ছিল সুন্দরী। সবারই গা-ভরা গহনা, ঝলমলে শাড়ি, আমরা যে সাদা আটপৌরে কাপড় পরতাম, সেগুলি ওদের ঈদ বা বকরঈদের সময় পছন্দ হতো না। খানুমের বাড়িটি ছিল যেন একটি পরীস্তান। যে কামরাতেই যাও-না কেন হাসি, মজা, গান-বাজনা ছাড়া আর কিছুরই চর্চা ছিল না। আমি অবশ্য ছিলাম কম বয়সী। কিন্তু স্ত্রীজাতিসুলভ অন্তর্জাত জ্ঞান ছিল বেশ।

নিজের মতলবটি বুঝেছিলাম। বিসমিল্লা ও খুরশিদজানকে নাচতে গাইতে দেখে আমার নিজেরই মনে নাচ-গানের ইচ্ছে জেগে ওঠে। নাচ গানের বদলে নিজে গুনগুনাতে ও পা নাড়তে লাগলাম। এই সময়ে আমাকেও তালিম দেয়া শুরু হয়ে গেল। গানে ছিল আমার বেশ স্বাভাবিক নৈপুণ্য আর গলার স্বরও ছিল ধ্রুপদী গানের উপযুক্ত। সা-রে-গা-মা শেষ করার পর ওস্তাদ গান গাওয়া শুরু করিয়ে দিলেন। ওস্তাদ একেবারে গোড়া ধরে শিক্ষা দিতেন। প্রত্যেকটি গানের স্বর তার ব্যাখ্যার কথা মুখস্থ করাতেন আর সেইটিই গাওয়াতেন, সাধ্য কী যে কোমল স্বরকে কোমলতর করি, শুদ্ধকে অশুদ্ধ করি বা তার মাত্রা বদলাই আর আমারও খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করা বা তর্ক করা ছিল স্বভাব। গোড়ার দিকে ওস্তাদজি (খোদা করুন তাঁর আত্মা লজ্জা না পায়!) আমার কথায় আমল দিতেন না।

একদিন খানুম সাহেবার সামনে রামকেলি গাইছিলাম। (ষষ্ঠ স্বরটি চড়া গাইলাম) ওস্তাদজি খেয়াল করলেন না। খানুম সাহেবা আবার গাইতে বললেন, আমিও আবার আগের মতোই গাইলাম। ওস্তাদজিও বেহুঁশ। খানুম সাহেবা

বিস্মিত হয়ে তাকালেন।

আমি ওস্তাদজির মুখের দিকে চেয়ে রইলাম, ওস্তাদজি মাথা নিচু করলেন। খান্নুম তো বেশ একহাত নিলেন।

খান্নুম : ওস্তাদজি, এ হচ্ছে কী? রামকেলিতে প্রধান স্বর রে ষষ্ঠ স্বর থেকে, আর সেইটিই ভুল! আপনাকে জিজ্ঞেস করি ষষ্ঠ স্বর কোমল না চড়া?

ওস্তাদ : কোমল।

খান্নুম : আর ছুকরি! তুই কী গাইলি?

ওস্তাদ : চড়া।

খান্নুম : তো আপনি ভুল ধরিয়ে দিলেন না কেন?

ওস্তাদ : আমার খেয়াল ছিল না।

খান্নুম : বাঃ, খেয়াল কেন থাকল না। এই জন্যই তো আমি দ্বিতীয়বার গাইতে বললাম। তবুও আপনি মুখে যেন ছোলা ভরে দিয়ে বসে রইলেন! আপনি মেয়েদের এইভাবেই শিক্ষা দেন! একজন সমঝদারের সামনে যদি মেয়েটি এমনিধারা গাইত তবে তিনি কী আমার চৌদ্দ পুরুষকে থুকতেন না?

এবারে ওস্তাদজি তো খুবই ছোট হয়ে গেলেন। নির্বাক রইলেন। কিন্তু কথাটি মনে রাখলেন। ওস্তাদজি নিজেকে ভাবতেন একজন সেরা গাইয়ে, আর ছিলেনও তিনি সত্যিই উঁচুদরের। সেদিন খান্নুম তাঁকে এইভাবে ঠোকায় তিনি বেশ অস্বস্তি বোধ করলেন।

একদিন দৈবক্রমে এমন হলো যে আমি 'সুহা' গাইছিলাম। খান্নুমও সেখানে উপস্থিত। আমি ওস্তাদজিকে জিজ্ঞেস করলাম, এতে গান্ধার হবে কোমল না অতি-কোমল।

ওস্তাদজী : অতি-কোমল।

খান্নুম : খাঁ সাহেব, হে খোদা! তাও আমার সামনে?

ওস্তাদ : কেন?

খান্নুম : আপনি আবার আমায় জিজ্ঞেস করছেন, কেন? সুহায় গান্ধার অতি-কোমল? বেশ, আপনি গান তো!

ওস্তাদ : (গাইলেন) গান্ধার কোমল গেয়েছি।

খান্নুম : ব্যাস, এখন আপনিই বুঝুন! নিজেই কোমল গাইলেন আর মেয়েটিকে শেখাচ্ছেন অন্য, না আমাকে পরীক্ষা করছেন? খাঁ সাহেব, ধুলোয় চুমু খেয়ে বলছি যে আমি অবশ্য বেশি কিছু জানিনে আর ভালো গাইতেও পারি না, কিন্তু কানে আমি কী না শুনেছি! আমিও গান একটি মামুলী পরিবার থেকে শিখিনি। মিঞা গোলাম রসুলকে আপনি জেনে থাকবেন—এসব কথায় লাভ কী! কিন্তু শেখাতে যদি হয় তো মন লাগিয়ে শেখান। নচেৎ মাফ করবেন, আমাকে অন্য কোনো বন্দোবস্ত করতে হবে। মেয়েদের মাটি করবেন না।

ওস্তাদজি 'যথেষ্ট হয়েছে' বলে উঠে চলে গেলেন। কয়েকটি দিন আর এলেন না। খানুম নিজেই শিক্ষা দিতে লাগলেন। কিছু দিন বাদে বাজিয়ে মধ্যস্থতা করলেন। পরস্পরের শপথাদির পর আবার মিল হয়ে গেল। এইদিন থেকেই ওস্তাদজি ঠিক ঠিক শেখাতে লাগলেন। আর না-শিখিয়েই বা করেন কী। তিনি তো আর খানুমের বিষয়ে এতটা জানতেন না। সারাটি জীবনভর আমি বুঝতে পারছিনে যে ওস্তাদজি বেশি জানতেন, না খানুম বেশি। কেননা এমন অনেক কথা খানুম বলে দিতেন যা ওস্তাদজি জানতেন না অথবা জেনেও বলতেন না। অনেকবার শপথ কাটাকাটি হয়েছে, তবুও এসব লোক পুরোপুরি সব বলতেন না। আমার এমনিতর একটা ধারণা হয়ে গিয়েছিল যে, যে কথাটি আমি বুঝতাম ওস্তাদজি বলছেন না বা আমি ভালো করে বুঝতে পারছি না, ওস্তাদজি চলে যাওয়ার পর সেটি আমি খানুম সাহেবাকে জিজ্ঞেস করে নিতাম। আর তিনিও আমার এই আগ্রহ দেখে খুব খুশিই হতেন। বিসমিল্লাকে অনেক বকাঝকা করেছেন। তার জন্য অনেক চেষ্টা করেছেন। কিন্তু টপ্পা ঠুংরি ছাড়া সে আর কিছু শিখতে পারেনি আর এই গানেও সে অনেক সময় তাল থেকে সরে যেত। খুরশিদের গানের গলা ছিল না। চেহারাটি তার ছিল ভালো, কিন্তু গলা যেন চেরা বাঁশ। নাচে অবশ্য সে ছিল ভালো, আর এইটিই সে শিখেছিল।

ওর বায়না হতো শুধু নাচিয়ে হিসেবে আর সামান্য সাদাসিধে কিছু গান তার সাথে, সে কেবল বাঈজি নামের জন্যই।

খানুমের নাচিয়েদের মধ্যে বেগাজানের বেশ নাম ছিল। কিন্তু চেহারাখানা ছিল এমনি যে, রাতে যদি দেখ তো ভয় পেয়ে যাবে। তাওয়ার তলার মতো কালো। তার উপর বসন্তের দাগ, সেগুলি ভরাতে গেলে এক পোয়া মাংসের কিমা দরকার। চোখগুলি লাল, নাক চ্যাপটা আর মাঝখানে চাপা, ঠোঁট পুরু, লম্বা লম্বা দাঁত। পরিমাণের চেয়েও মোটাসোটা বেঁটেখাট, লোকে বলে বাচ্চা হাতি। কিন্তু গলা ছিল বেশ ভালো, এ বিষয়ে জ্ঞানগম্যিও ছিল বেশ। এরই গলায় শুনেছি স্বরের মূর্ছনা। যখনই আমি ওর ঘরে গিয়েছি, ফরমায়েস করে উত্যক্ত করেছি।

আমি : বাঈজি, একটু সা-রে-গা-মা শোনাও না।

বেগা : শোনো, সা রে গা ধা নি।

আমি : এটা মানিনে, আলাদা করে গাও।

বেগা : ছুকরি, তুই তো বড় জ্বালাচ্ছিস। নিজের ওস্তাদের কাছে বলিসনে কেন?

আমি : খোদার দোহাই, তুমিই বল।

বেগা : সা রে গা মা পা ধা নি দেখ, ৪ ৩ ২ ৪ ৪ ৩ ২ বাইশ হয়েছে।

আমি : (দুষ্টুমি করে) এসো আমি গুনিনি, আবার বল।

বেগা : যা, আর এখন বলব না।

আমি : আহ্, আমি তো বলিয়েই ছাড়ব।

বেগা : (আবার ঐটি বলল) নে, আর জালাসনে।

আমি : হাঁ, এবার শুনেছি, নি-এ তুই, না ?

বেগা : হাঁ, তুই।

আমি : তবে তো ঠিক বাইশ হয়েছে। আচ্ছা, নাও, তিনটি স্কেলই বলে দাও।

বেগা : নাও, এখন চল। কাল এস।

আমি : আচ্ছা, তানপুরা নিচ্ছি, কিছু গাও।

বেগা : কী গাইব ?

আমি : ধানেশ্রী।

বেগা : কী গাইব, খেয়াল, ধ্রুপদ, ঐকতান ?

আমি : আল্লার দোহাই ধ্রুপদ গাও।

বেগা : নে, শোন্—

নয়ন ভরে প্রিয়ের দেখা পেলে
শরীর জুড়োয় তবে
তাঁর দরশন পেলেই আমার
জনম সফল হবে।
মুখে ইষ্টনাম জপি জানি নাকো
কবে দেখা পাই।
দেবতার খোঁজ দিলে তারি পায়ে
মাথাটি নোয়াই।

খানুম সাহেবার নাচিয়েদের স্রেফ নাচ-গানের তালিমই দেয়া হতো না, লেখা-পড়া করার জন্য মক্তবও ছিল। মৌলবী সাহেব চাকরি করতেন। নিয়মমাফিক আমাকেও মক্তবে পাঠানো হলো। মৌলবী সাহেবের চন্দ্রকান্ত চেহারা, সাদা সযত্ন পাকানো দাড়ি, সিল্কের কাপড়, হাতে লাল পোখরাজ আর চন্দ্রকান্তমণির আংটি, পবিত্র মক্কার মাটি দিয়ে তৈরি জপমালার পুঁতি, নমাজ পড়ার সময় কপালে ঠেকিয়ে জিরিয়ে নেবার জন্য সেটিতে বাঁধা ছোট একটি ফলক চেন অনেক দামের রুপোর বাঁট বাঁধানো নকশাকাটা ছড়ির বাঁট, ছোট বেঁটে হুঁকো, আফিং ও চায়ের কাপ, সবই আজো যেন আমার চোখের উপর ভাসছে। কী ছিল তাঁর মার্জিত রুচি। মানুষটিও ছিলেন এমন চমৎকার যে কোনো এক সময়ে আচমকা হুসেনি পিসির প্রেমে পড়ে গিয়ে আজ অবধি তার মর্যাদা দিয়ে আসছেন। আর হুসেনি পিসিও এঁকে শাস্ত্রসম্মত স্বামীর মতোই মনে করেন। বুড়োবুড়ীর মধ্যে এমনি সব মজার কথাবার্তা হতো যে জোয়ান জোয়ানীদেরও

তা ছিল আকাঙ্ক্ষার বস্তু। ওঁর বাড়ি ছিল জৈদপুরের দিকে। খোদার দয়ায় ঘর-গেরস্তি বাড়ি, স্ত্রী, সেয়ানা ছেলেমেয়ে সবই ছিল বর্তমান। কিন্তু নিজে যখন তিনি লখনৌ-এ শিক্ষা নিতে এলেন তখন থেকে লখনৌ-এই রয়ে গেলেন। হয়ত-বা দুবার দেশে গিয়েছিলেন। আত্মীয়-স্বজন দেখা করতে হলে এখানেই চলে আসতেন। বাড়ি থেকে কখনো-সখনো কিছু কিছু জিনিসপত্তর আসত। খানুম সাহেবা দশটা করে টাকা দিতেন। এ সবই যেত হুসেনি পিসির কাছে। খাওয়া পরা আফিং তামাক সব ব্যবস্থা হুসেনি পিসিই করতেন। তহবিলদারও ছিলেন তিনি। জামাকাপড় হুসেনি পিসিই তৈরি করিয়ে দিতেন। খানুম সাহেবাও মৌলবী সাহেবকে বহুৎ মান্য করতেন। আর বলতে-কি মৌলবী সাহেবের খাতিরেই খানুম সাহেবা হুসেনি পিসিকেও মান দিতেন।

আপনি এটি হয়ত বুঝেছেন যে আমার লালন-পালনের ভার নিয়েছিলেন হুসেনি পিসি। এজন্য মৌলবী সাহেব আমার উপর বিশেষ যত্ন নিতেন। তিনি যে আমাকে কী ভাবতেন তা তো আমি নিজে বলতে পারব না। ভদ্রতা রক্ষা করে তো চলতেনই আর অন্য মেয়েদের চেয়েও বেশি আমায় তাড়না করতেন, আমার মতো বেঢপ কাঠের কুঁদোকে উনিই মানুষ করে তুলেছেন। ওঁরই শ্রীচরণের কৃপায় আমি খ্যাতিমানদের বাড়িতে গিয়েছি আর প্রাপ্যের চেয়েও বেশি মান পেয়েছি। ওঁরই দৌলতে আপনাদের মতো জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিদের মুখ খুলতে সক্ষম হয়েছি। রাজদরবারে অংশ নিতে সক্ষম হয়েছি। আল্লার দয়ায় বেগম মহলে যেতে পেরেছি।

মৌলবী সাহেব খুবই করুণা করে আমাকে শিখিয়েছিলেন। অনিক শেষ হওয়ার পর মৌলবী সাহেব করিমা, মামকিমা, মাহমুদনামার শুদ্ধ পাঠ শিখিয়ে আহমদনামা শিখিয়ে দিলেন। তার পরে ধরিয়ে দিলেন গুলিস্তা। দুটি করে লাইন মাত্র পড়াতেন। আমাকে পড়া বিশেষ করে কবিতা মুখস্থ করতে হতো। অচিরেই আমি প্রতিটি শব্দের অর্থ বুঝতে শিখলাম ও গঠননীতি বিশ্লেষণ করতে শিখলাম। তিনি বানান ও চিঠি লেখা শেখাতেও বেশ পরিশ্রম করেছিলেন। গুলিস্তা পড়ার পর আর সব ফারসি কিতাব জলবৎ হয়ে গেল। যেন আমি পুরনো পড়া পড়ছি। আরবি ব্যাকরণও পড়ি, আর পড়ি ন্যায়শাস্ত্রের কিছু অংশ। মৌলবী সাহেবের কাছে সাত-আট বছর পড়েছি। কবিত্ব করার শখের আগেরবারের কথা আপনি নিজে সব জানেন। এখানে সেটি আর ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন দেখি না।

৪

আমি তো নই তাদের দলে
পড়ে যারা তোতার মতো।
প্রেম, নিষ্ঠার পাঠশালাতে
জানার সাথে মানবে কত।।

মক্তবে ছিলাম আমরা তিনটি মেয়ে আর একটি ছেলে—গৌহর মির্জা। ছেলেটি ভয়ানক শয়তান আর বজ্জাত। সব মেয়েদেরই পেছনে লাগত। কারো গালে হয়ত মারলে চড়, কারো-বা বিনুনি ধরে টানলে, কারো-বা কানে লাগালে ঘুষি, দুটি মেয়ের বিনুনি দিলে-বা এক সাথে বেঁধে। কখনো-বা কলমের নিবটি দিলে ভোঁতা করে, আবার কখনো দোয়াত উল্টে দিলে বইয়ের উপর। ওর দুষ্টুমিতে আমরা হতাম হয়রানের একশেষ। মেয়েরা মারও দিত তাকে রীতিমত। মৌলবী সাহেবও যথোপযুক্ত শাস্তি দিতেন। তবুও কখনো দুষ্টুমি করতে ছাড়ত না। সবার চেয়ে সে দুষ্টুমি করত আমার সাথেই বেশি। কেননা, আমি ছিলাম নতুন আর সরল, আর ছিলাম মৌলবী সাহেবের অনুগত। মৌলবী সাহেবকে বলে বলে মারও খাওয়াতাম, কিন্তু কিছুতেই বাগ মানানো যেত না। শেষে ভাঙচি দিতে দিতে আমারও বিরক্তি এসে গেল। আমার নালিশ মতো মৌলবী সাহেব ওকে এমন কঠোর সাজা দিতেন যে শেষে আমিও ভয় পেয়ে গেলাম।

গৌহর মির্জার মক্তবে আসার হেতুও ছিলেন হুসেনি পিসি।

নবাব সুলতান আলি খাঁ একজন সম্ভ্রান্ত বংশীয় জমিদার ছিলেন, থাকতেন তোপ দরজায়। গাইয়ে বন্নুর সাথে তাঁর ছিল ভালবাসা। এঁদেরই ছেলে গৌহর মির্জা। এঁদের ভালবাসায় ছেদ পড়ে অবশ্য বহুদিন হলো কিন্তু ছেলেটিকে পালনের জন্য দশ টাকা মাসোহারা দিতেন। আর বেগম সাহেবাকে লুকিয়ে মাঝে মাঝে তাকে দেখেও আসতেন। বন্নু থাকতেন কাজিবাগে, ওখানেই ছিল হুসেনি পিসির ভাইয়ের বাড়ি। দুটো বাড়ির মাঝখানে খিড়কির দরজা। গৌহর মির্জা ছেলেবেলা থেকেই ছিল জাতবজ্জাত, মহল্লার লোকজনের প্রাণ ছিল ওর জ্বালায় কণ্ঠাগত; কারো-বা বাড়িতে সে ঢেলা মারত। কোনো ছেলেকে মুনিয়া পাখি দেখাবার জন্য বলত, সে পাখির খাঁচা দেখালে খাঁচার দরজা দিত খুলে। সব মুনিয়া উড়ে গেল। দফায় দফায় লোককে কষ্ট দিত। মা শেষে নিরুপায় হয়ে পাড়ার মসজিদের

একটি বিদ্যালয়ে মৌলবী সাহেবের কাছে পাঠালেন। এখানেও সে নিজের দুষ্টুমিটা ছাড়লে না। সব সহপাঠীকেই সে জ্বালাতন করতে শুরু করে দিল। কারো-বা জামায় ছাড়লে ব্যাঙ, কারো টুপি ছিঁড়ে দিলে। একটি মেয়ের জুতো কুয়োয় ফেলল।

একদিন মৌলবী সাহেব নমাজ পড়ছিলেন। ছোকরাটি তাঁর নতুন সৌখিন জুতোজোড়া পুকুরে ভাসিয়ে দিয়ে নিজে বসে নমাজ পড়া দেখছিল। এরই মধ্যে কখন মৌলবী সাহেব তার ঘাড়ে গিয়ে পড়েছেন। গৌহর মির্জা বেশ মার খেল। মৌলবী সাহেবের মারের চোটে তার মুখ লাল হয়ে গেল। তিনি ওর কানটি ধরে বন্নুর বাড়িতে নিয়ে গেলেন আর দরজায় দাঁড়িয়ে বললেন, নাও তোমার ছেলে নাও, একে আমি পড়াব না। এই কথা বলে তো মৌলবী সাহেব চলে গেলেন। যেন তার উপর ভারি অন্যায় করা হয়েছে এমনি ভাব দেখিয়ে গৌহর মির্জা কাঁদতে কাঁদতে ঘরে এল। এই সময়ে নিতান্তই আকস্মিকভাবে হুসেনি পিসি বন্নুর বাড়িতে তার সাথে কথা বলছিলেন। ছেলেটির অবস্থা দেখে তিনি ভয় পেয়ে গেলেন। তার কান্না দেখে সব ব্যাপারটা না-বুঝেই মৌলবী সাহেবকে গালমন্দ পাড়তে লাগলেন হুসেনি পিসি: এ কোথাকার মৌলবী! কসাই না গুরুমশাই, চড় মেরে ছেলেটির মুখ লাল করে দিয়েছে। দেখ, কান মলে রক্ত বার করেছে। রক্ষে কর, কে এরকম মৌলবীর কাছে ছেলে পড়াবে? আমাদের মৌলবী সাহেবও তো ছেলে পড়ান। কত আদর দিয়ে, কী চমৎকার তিনি পড়ান। বন্নু সাথে-সাথেই বলল: হুসেনি পিসি তোমার মৌলবী সাহেবের কাছেই একে নিয়ে যাও।

হুসেনি পিসি: নিয়ে তো যাবে, কিন্তু অনেকটা দূর যে!

বন্নু: তোমার ভাইকে দিয়ে সকালে পৌঁছে দেব, সন্ধ্যেবেলায় নিয়ে আসব।

হুসেনি পিসি: আচ্ছা তবে পাঠিয়ে দিও।

মৌলবী সাহেবকে কিছু বলার ছিল না। এজন্য হুসেনি পিসির খাসা সেবকের উপর পুরো ভরসা ছিল। জানতেন যে, মৌলবী সাহেব অস্বীকার তো করবেন না।

দ্বিতীয় দিনে আলিবখস (হুসেনি পিসির ভাই-এর নাম) গৌহর মির্জাকে সাথে করে মাথায় মিষ্টির ডালি নিয়ে হুসেনি পিসির বাড়ি পৌঁছল। হুসেনি পিসি ভারি খুশি হয়ে মিঠাই সব বাটোয়ারা করে দিলেন। ছেলেটিকে দিলেন মৌলবী সাহেবের পাশে বসিয়ে।

গৌহর মির্জা সবচেয়ে বেশি জ্বালাতন করত আমাকেই। ন্যায় বা অন্যায় যেভাবেই হোক-না কেন সে সর্বদাই আমায় ঈর্ষা করত। মৌলবী সাহেব ওকে খুবই মারতেন। কিন্তু ও আমাকে জ্বালাতন করা ছাড়েনি। এইভাবেই কয়েকটি বছর কেটে গেল। শেষপর্যন্ত আমার একটা আপস হয়ে গেল।

অথবা এইভাবে বলা যেতে পারে যে, জ্বালাতনটা আমার ধাতস্থ হয়ে গেল।

গৌহর মির্জা আর আমার বয়সের কিছুটা তফাত ছিল। ও ছিল বোধহয় আমার চেয়ে দু-এক বছরের বড়। যে সময়কার অবস্থার কথা বলছি সে সময়ে আমার বয়স ছিল বছর তের আর ওর চোদ্দ কি পনের।

গৌহর মির্জার জ্বালাতনে আমার বেশ মজা লাগত। গলার স্বর ছিল ওর বেশ মিষ্টি—গায়িকার ছেলে তো! অঙ্গভঙ্গি করে গানের ভালো ব্যাখ্যা করতে পারত। গানের সুরে তার সারা অঙ্গ বাজনার তারের মতো কাঁপতে থাকত। মৌলবী সাহেব মক্তবে না থাকলে বেশ ভালো জলসা বসত। কখনো-বা আমি গাইতাম আর ও অঙ্গভঙ্গ করত, আর কখনো-বা ও গাইত আর আমি তাল দিতাম। গৌহরের গলার স্বরে আকৃষ্ট হতো অনেক বাঈজিই। হরেক কামরায় পড়ত ওর ডাক। আর ওর সাথে আমার যাওয়াটাও একটি প্রয়োজন হয়ে দেখা দেয়। কেননা আমি সঙ্গে না থাকলে ওর গানের শব্দ বেরোত না। সবচেয়ে বড় কথা আমিরজান ছিল ওর গানের ভক্ত। মির্জা সাহেব, আপনার বোধহয় আমিরজানের কথা স্মরণ আছে।

রুশোয়া : হ্যাঁ, মনে আছে, বলে যাও।

উমরাও : সে সময়ে আমিরজান ছিল মুক্তখারউদ্দৌলা বাহাদুরের মাইনে করা। দোহাই আল্লা। তার তখন ভরা যৌবনের ঠাট-ঠমক। যৌবন তার জাগতে শুরু করেছে।

ফুটছে সবে চাঁপা কলির রংটি তার
মোহিনী মুখ সরলতায় ভরা
আঁকা-বাঁকা চালচলনটি
জ্ঞান-বুদ্ধিহরা।
তেরছা চোখের চাউনি তার
ধা-সুষমা ঝরা

বেঁটেখাট পাতলা চেহারা, নরম নরম হাত-পা।

রুশোয়া : আমি যখন তাকে দেখেছি, আলনায় তুলে রাখার মতো। চেহারা এত বিশ্রী হয়েছিল যে তাকানো যায় না।

উমরাও : কোথায় দেখেছিলেন?

রুশোয়া : তাঁর ঘরেই দেখেছিলাম যাঁর ঘরের সামনে শাহ সাহেব গেরুয়া কাপড় পরে জপের মালা হাতে সাধারণের দানের আশায় দাঁড়িয়ে থাকতেন, আর কোনো লোক বেরুলেই তাকে সালাম জানাতেন। কাউকে কিছু বলতেন না।

উমরাও : বুঝেছি। ওই শাহ সাহেব ওর ভক্তদের একজন ছিলেন।

রুশোয়া : জি হাঁ, আমি কি না জানি!

উমরাও : আচ্ছা, তাহলে আপনি ওখানেই থাকেন?

রুশোয়া : ওঁরই পড়োশি।

উমরাও : ওঁর অবস্থাটা এখন কেমন ?

রুশোয়া : ও এখন এক ডাক্তারের জন্য মরছে।

উমরাও : কোন্ ডাক্তার ?

রুশোয়া : আপনি জানেন না, নাম বললেও বুঝবেন না। আর বলেই-বা কী লাভ ?

উমরাও : তবু যাহোক, কিছু বলে দিন। আমি বুঝে যাব—

রুশোয়া : ওই বাজার

উমরাও : খুব জানি, সেই সময় এখানেই আমিরজান এমনিই ছিল যে, লোকে তাকে একনজর দেখার জন্য কামনা করত। তার মেজাজ ছিল এমন দাম্ভিক যে যার-তার সামনে বের হওয়া দূরে থাক, বড় বড় লোকদের প্রার্থনাও পূরণ করত না। চালচলনও ছিল তেমন। চার-চারটি স্ত্রীলোক সাথে। এক-জন নিয়েছে গড়গড়া, একজনের হাতে পাখা, একজনের কুঁজো, আরেকজনের পানদান। উর্দিপরা লোকজন তার পাল্কির সাথে সাথে দৌড়াত।

আমিরজান ছিল গৌহর মির্জার গানের ভক্ত। নিজে গান জানত না। কিন্তু গান শোনার ছিল ভারি শখ।

গৌহর মির্জা ছেলেবেলা থেকেই ছিল মহিলাদের প্রিয়। অনেকেই ওর ওপর নজর দিত। ছাঁদছাঁদও ছিল ভালবাসারই মতো। রংটি ছিল বটে শ্যামলা তবে নাক-নকশা ছিল ভালোই, পোশাক-পরিচ্ছদ ভালো, দুষ্টু বজ্জাতের ...

রুশোয়া : হবে না কেন ? কোন্ মায়ের ছেলে !

উমরাও : আহ্ ? আচ্ছা, আপনি কি বন্ধুকে দেখেছেন ?

রুশোয়া : (মুচকি হাসতে হাসতে) জি হ্যাঁ, তাই ধরে নিন।

উমরাও : আপনার কৌতুকটিও কেমন পরদা ঢাকা।

রুশোয়া : যাই হোক, আপনি তো সে পরদা ফাঁসিয়ে দিলেন।

উমরাও : তবে কিছুক্ষণ কৌতুকই করা যাক। লাগুক আগুন আমার জীবন কাহিনীতে।

রুশোয়া : মজা করার জন্য তো সারা রাত পড়ে রয়েছে। আপনার কাহিনীটিই বলুন।

উমরাও : দুবারই টেক্কা দিলেন। আচ্ছা শুনুন—সকাল থেকে দুপুর দশটা-এগারটা পর্যন্ত কার সাধ্য ছিল যে মৌলবী সাহেবের কাছ থেকে এক মুহূর্ত এড়িয়ে যাবে। এরপর তিনি যেতেন দুপুরের খানা খেতে। সেই সময়ে কিছুক্ষণ ফুরসৎ মিলত। আবার একেকটি কামরা আর আমি। আজ আমিরজানের কাছে, কাল জাফরির কামরায়, পরশু বব্বনের ঘরে। আর যেখানেই যাও, খাতির যত্ন. মণ্ডা মিঠাই, পান তামাক।

রুশোয়া : আপনি ছেলেবেলা থেকেই তামাক টানেন নাকি ?

উমরাও : হ্যাঁ, গৌহর মির্জার দেখাদেখি আমারও শখ হয়। শখ করেই প্রথমে খেতাম, পরে দুর্ভাগ্যের শিকার হয়ে গেছি।

রুশোয়া : গৌহর মির্জা সাহেবতো চণ্ডুও খান। আশ্চর্য হব না যদি আপনারও তাতে শখ যায়।

উমরাও : খোদা আজ অবধি সেটা থেকে রক্ষে করেছেন। তবে হ্যাঁ, আফিংয়ের বেলায় ফিরে যেতে পারিনে। ওটাও এখন শুরু করেছি। কারবালা থেকে হজ করে ফেরার পর প্রায়ই সর্দি লাগত নাকে। হেকিম সাহেব বললেন, আফিং খাও। খাচ্ছি।

রুশোয়া : আর সর্দি প্রতিরোধের সেই ওষুধটি. .

উমরাও : তার কথাটি এখন আর বলবেন না।

রুশোয়া : ত্যাগ করেছেন নাকি ?

উমরাও : অনেক আগে থেকেই।

রুশোয়া : অভ্যাসটি তো বদই। তবে আমার অবস্থাটি এইরকম :

শপথে সরাব ছেড়েছি সত্যি
তবু মনে এই বাসনটি বাকি।
দিব্যি দিয়ে একটি পেয়ালা
সরাব আমায় দেবে না কি !

উমরাও : আহা, কী সুন্দর কবিতা! শপথ দিতে তো আমিই উপস্থিত আছি। পান করা না-করাটা আপনার মর্জি।

রুশোয়া : আপনিও এতে রত হবেন তো ?

উমরাও : ছিঃ ছিঃ!

রুশোয়া : মেঘ জমেছে বইছে শীতল বায়
সুরার পুরনো স্মৃতি উঁকি মেরে যায়।

উমরাও : নিন, থাক। মনকে বশে রাখুন। আমারও যেন সুরার নেশা লাগছে। আল্লার দোহাই। ও খেয়ালটিকে যেতে দিন।

রুশোয়া : যেতে দিন।

উমরাও : রসিকতাটিও দূরে রাখুন—

ঠোঁটের ছোঁয়া সরাব নাই-বা পাক।
স্মৃতি তারি স্মৃতিই শুধু থাক।

রুশোয়া : ও আল্লা, উমরাওজান কী কবিতাই না পড়লেন।

উমরাও : নমস্কার,

তাঁর সংকেতস্থল দেখেই অদার
মনে পড়ে পুষ্পোদ্যানে ভ্রমণ করার।

রুশোয়া : আল্লার দোহাই, মন উচাটন হবে না-ই বা কেন? যৌবনের লক্ষণই তো এটা।

উমরাও : জি না, সরাবের কথা মনে আসারই ফল এটা।

সাধ্বা, আজ মনে আসে
বারে বারে
সেই মদ দূরে তুমি
ঠেলে ফেলে যাবে।

রুশোয়া : আ-হা-হা। গজলের চরণের শেষাংশ কেমন বের করে দিলেন। আর বলছেনও বেশ।

কাবা ফিরে পথ থেকে
সরে গেছি পাশে
পুজো-আর্চার কথা
ফের মনে আসে।

উমরাও : 'কাবা ফিরে' আহা, কী কথা। কেমন খাসা বলেছেন। মির্জা সাহেব এটিকে গজলের শুরু করবেন না।

কাবা ঘুরে এসে মনে পড়ে যায়
কত না মজা ও তামাশা
স্মৃতিতে পুজো-আর্চার
সেই পথে ফের আসা।

রুশোয়া : খাসা।

উমরাও : অরণ্য-বীথি, বুনো জানোয়ার পাখি
ভেসে আসে স্মৃতির পর্দায়
বিলকুল ভয়ের মিছিল
মনে এসে ছায়া ফেলে যায়।

রুশোয়া : পঙ্‌ক্তি শুরু হিসেবে এটিও মন্দ না।

উমরাও : এই কবিতাটি শুনুন,

আঙুর-কন্যার নামে
নালিশ জানাই
তবু কেন সে আমার
মনে নেয় ঠাঁই।

রুশোয়া : বলেছিই তো, মেজাজ আজ চমৎকার। আচ্ছা, এই কবিতাটি শুনে আপনার কাহিনীটি আবার শুরু করুন।

থাকুক সমীর, থাক মেঘমালা
থাক না ফুলের বাগ

সরাবও আসুক প্রথম কিন্তু
সেই নব-অনুরাগ।

উমরাও : আহ্, মির্জা সাহেব প্রাণটাই নিলেন বুঝি!

যাক, আসল কথায় ফিরে আসি। এইভাবেই আমার জীবনের কয়েকটি বছর খানুম সাহেবার ঘরেই কেটে গেল। এরি মধ্যে এমন কিছু ঘটেনি যা বলার দরকার আছে।

হ্যাঁ, খুব মনে পড়েছে। বিসমিল্লার ঋতুমতী হওয়ার ব্যাপারটি খুব জাঁক-জমকের সাথে করা হয়। আমার চোখে দেখা শাহী থেকে আরম্ভ করে আর কারো বেলা এত আড়ম্বর করা হয়নি। লালারামের গরমকালের বাগানবাড়িটি জলসার জন্য নেয়া হয়। ভিতর-বার আলোকসজ্জায় মোড়া হয়। শহরের বেশ্যা, ডোম, গাইয়ে-বাজিয়ে কাশ্মীরি হাস্যকৌতুকাভিনেতারা তো এসেছিলই তাছাড়া দিল্লির মতো দূরদূরান্ত থেকে গাইয়েরাও এসেছিলেন। সাতদিন ধরে এই গান-বাজনা চলে। খানুম সাহেবা এত দিলখোলা মিষ্টান্ন বিতরণ করেন যে লোকে আজ অবধি সে-কথা স্মরণ করে। বিসমিল্লা ছিল খানুম সাহেবার একটিমাত্র সন্তান। তার জন্য কোনো কিছু করাই যেন যথেষ্ট ছিল না। নবাব ছব্বন খান তাঁর দাদী বেগম আবদুল্লাহ খানের সম্পত্তি পেয়েছিলেন। বয়স ছিল তাঁর খুবই কম। আল্লা জানেন, খানুম সাহেবা কেমন করে তাঁকে গেঁথে ফেললেন। বেচারা ফেঁসে তো গেলেনই তাছাড়া এই জলসায় তাঁর বিশ ত্রিশ হাজার টাকা খরচ হয়ে গেল। এরপর বিসমিল্লা নবাব সাহেবের রক্ষিতা হয়ে রইল। নবাব সাহেবও তাঁকে প্রাণভরে ভালবাসতে লাগলেন।

মির্জা রুশোয়া সাহেব আপনি আমার কাছে যে-কথা জিজ্ঞেস করছেন আমার মুখ দিয়ে সে-কথা বলা কত যে কঠিন! সত্যি বটে বেশ্যারা মাত্রাহীন সাহসী হয় কিন্তু তাদের নিজস্ব একান্ত মুহূর্তগুলিও থাকে। বয়সের দাবিও একটি জিনিস। ভরা যৌবন বয়সে যেসব চিজ সীমার বাইরে চলে যায় বয়স পড়ে যাওয়ার সাথে সাথে সেগুলিতে ভাঁটা পড়া দরকার। যাতে সামঞ্জস্য বজায় থাকে। আর বেশ্যাও তো মেয়েদের জাত। সেসব কথা জিজ্ঞেস করে আপনার লাভ কী?

রুশোয়া : আপনাকে তাগিদ দিয়ে যে-কথা জিজ্ঞেস করছি, কিছু লাভ তো তার আছেই। কিন্তু আপনি যদি শিক্ষিতা না হতেন তবেই এই ওজর-আপত্তির একটি অর্থ হতো। লেখাপড়া জানা লোকের এ ধরনের লজ্জা হওয়া উচিত না।

উমরাও : উঃ, তো পড়লে কী চোখের জলে ঢিলে পড়বে? এটি তো আপনি বেশ বললেন!

রুশোয়া : আচ্ছা, আচ্ছা বলুন। বাজে কথায় আমার সময় বইয়ে দেবেন না।

উমরাও : কোথাও কোনো খবরের কাগজে ছেপে দেবেন না।

রুশোয়া : আপনি তা ছাড়া আর কী বুঝেছেন ?

উমরাও : কী কেলেঙ্কারি ! এটি করলে আমাকেও আপনি আপনার' মতো বদনামি করবেন ।

রুশোয়া : যা হোক, আমার সাথে আপনার বদনাম হলে কোনো ক্ষতি হবে না ।

রুশোয়ার সাথে মিলতে চেয়ে
প্রণয় প্রকাশ করেছো কেন ।
বদনামি তাই না করে তোমায়
ছাড়ব না সেটি ভালোই জেনো ॥

উমরাও : আল্লা না করুন, আপনার সাথে প্রেম করবে কে ?

মৌলবীব সাথে শাস্ত্র বিচার
যেন মন্ত্রীর সাথে ঝগডা করা
জমে না কিছুই যার দু-চার বিষয় ছাড়া ।

রুশোয়া : কার কবিতা ?

উমরাও : এটি আমাকে জিজ্ঞেস করছেন কেন ?

রুশোয়া : হ্যাঁ বুঝেছি । তা বলুন না আপনি, ও-গজলটি শুনেছেন ।

উমরাও : প্রেমের বাজারে যাই,
প্রাণ বিক্রি করে
ভালো সওদা ছাড়া
ফিরব না তো ঘরে ।

রুশোয়া : আর সেই কবিতাটি মনে আছে ? 'কয়েকটি দাবি ছাড়া'

উমরাও : যত প্রতিশ্রুতি হোক, থাক
প্রতিজ্ঞা যত
যেইজন কৃপণের বাড়া
তার কাছে মিলবে না কিছু
কয়েকটি দাবি ছাড়া ।

রুশোয়া : আর কোনো কবিতা মনে আছে ?

উমরাও : কই, আর কিছুই তো মনে আসছে না !

রুশোয়া : এটি তো বেশ বড় গজল ছিল । দেখুন না, এর কপি কোথাও পড়ে থাকলে আমাকে দেখান ।

উমরাও : তাঁর কাছে চেয়ে পাঠাব না ।

রুশোয়া : নিজে গিয়ে লিখে আন যদি তবে হয়ত-বা সে নিশ্চয়ই লিখবে না।

উমরাও : এটি কি কোনো কথা হলো ?

রুশোয়া : জি হ্যাঁ, আপনি জানেন না যে মুসাবিদা ছাড়া গজল খোলসা না হওয়া অবধি নিষেধ কী।

উমরাও : আচ্ছা, একদিন আমি আর আপনি দুজনেই যাব। হ্যাঁ, আরো একটি কবিতা মনে এসেছে –

যদিও-বা হবে এতে তার
নিজের বদনাম
আমার চর্চায় তবু
নেবে না বিরাম।

আরও শুনুন –

দাবির ইচ্ছে ঘটায়
দুঃখ অপরের
তবু ছাড়বে না অপযশ বিনা
প্রেমিকের।

রুশোয়া : আমার গজলটিও ছিল ঐ রকম। কিন্তু খোদা জানেন তার কী হলো, শুধু তার শেষ পঙ্‌ক্তিটি মনে থেকে গেছে।

উমরাও : ঐটিই শুনিয়ে দিন। কী চমৎকার বলেছেন –

রুশোয়া : রুশোয়ার সাথে মিলতে চেয়ে
ভালবাসা কেন দেখালে তারে
বদনামি তাই না করে তোমায়
ছাড়ব না একেবারে।

উমরাও : সত্যিই খুব খাসা বলেছেন। ছদ্মনামটি এক বিশেষ সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছে।

রুশোয়া : ছদ্মনামটি প্রকাশ করবেন না। শহরে কয়েকটি রুশোয়া এখন মজুদ রয়েছেন। অনেকে এখন কারণে-অকারণে নিজেদের ভালো ভালো ছদ্মনাম ছেড়ে দিয়ে 'রুশোয়া' হয়ে যাচ্ছে। ভাগ্যিস ওরা আমার আসল নাম জানে না তবে তারা যে তাদের নাম বদলে আমার আসল নামটি রাখত তাতে আর আশ্চর্য কী। আমি অবশ্য খুশি এই জন্য যে, ইংরেজরা বাবার নামে ছেলের নাম রাখে, আর সেই সুবাদে আমার বংশেরও শ্রীবৃদ্ধি হবে। আমার নাম উজ্জ্বল হবে, নিন আর কথাটি ফেলবেন না। যা কিছু আমি জিজ্ঞেস করেছি তা বলতেই হবে।

উমরাও : কী রকম জবরদস্তি করছেন, কী-ই না লজ্জার কথা ?

রুশোয়া : বিয়ে বরযাত্রীদের খিস্তি-খেউর গানের থেকে এটি আর বেশি লজ্জার নয়।

উমরাও : আপনাদের লখনৌ-এ তো বেশ্যারা খিস্তি-খেউড়-এর গান গায় না। ডোমনিরা অবশ্য খিস্তি-খেউড় গায়, তাও আবার স্ত্রীলোকদের মধ্যেই গাইতে হয়।

সত্যি বলতে কি মির্জা সাহেব, শহরই হোক আর গ্রামই হোক, এই রীতিটি কিছু ভালো না।

রুশোয়া : আপনি 'ভালো না' বললেই হলো না। আমি নিজের চোখে দেখেছি আর নিজের কানে শুনেছি। সজ্জন মহাশয় পর্যন্ত মেয়েদের আসরে জোর করে ঢুকে এই নিজেদের মা-বোনের সম্বন্ধে খিস্তির গান শোনেন আর এই দিনটির জন্য খোদাকে ধন্যবাদ দেন। হায়, খোদা যেন আর এরকম দিন না দেন। মা-বেটির মধ্যে যে ধরনের রং-তামাশা চলে তার আর বলবই-বা কী। যা হোক, এসব কথা থাক। আমি কোনো সমাজ-সংস্কারক নই যে এইসব কথার সূক্ষ্ম বাছ-বিচার করব। আপনি বিশদভাবে বলুন।

উমরাও : আপনি কিছুতেই মানবেন না, নিন, শুনুন। যখন থেকে বিসমিল্লার নর্তকীদের মধ্যে প্রচলিত এক ধরনের আনুষ্ঠানিক বিয়ের উৎসব হয়ে গেল খুরশিদ-জান আর আমিরজানেরও ঐ একই কারবার দেখে আমার মনে এক ধরনের কৌতূহল হলো। আমি দেখলাম যে একটি বিশেষ আচার-অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পর (যা আমার একেবারেই জানা ছিল না) বিসমিল্লা বিসমিল্লাজান, খুরশিদ খুরশিদজান হয়ে গেল—এরা মাতব্বরি করার সনদ পেল। পেল স্বাধীনতার সম্মান। এরা এবার আমার থেকে পৃথক হয়েছে। আমি যেন ওদের কাছে একটি ঘৃণ্য বস্তু হয়ে গেলাম। ওরা পুরুষমানুষদের সাথে বিনা আয়াসেই হাসি-মস্করা করতে লাগল। ওদের কামরাগুলিতে পৃথক পৃথক বাতিদান। দেয়া হলো নেওয়ারের পালঙ্ক—বাঁশ দিয়ে বাঁধা। মেঝেয় পাতা ফরাসের উপর সাদা চাদর বিছানো বড় বড় নকশাকাটা পানের ডাবর, প্রসাধনের বাকস, ঢাকনাওলা পানের বাটা, ঘরের কোণে থুকদান, দেয়ালে টাঙানো সিরীয় আয়না, অপরূপ সব ছবি ও সিলিং-এ ঝোলানো চমৎকার ঝাড় লণ্ঠন, এখানে-সেখানে খাসা পাত্র বসানো। সন্ধ্যে হতেই পদ্মফুলে বাতি জ্বলতে থাকে।

ছুটো ছুটো করে চাকরাণী, ছুটো চাকর হাত জোড় করে সামনে দাঁড়িয়ে থাকে। বড় বড় ঘরের কন্দর্পসদৃশ নবযুবকরা সব সময়েই আমোদ-আহ্লাদ করার জন্য হাজির হচ্ছে। ওদের রুপোর গড়গড়ার নল মুখে মুখে লাগানো। সামনে পানদান খোলা। একেকজনকে পান তৈরি করে দিয়ে যাচ্ছে আর ঠাট্টা-তামাশা করছে। ওরা উঠলেই লোকে 'বিসমিল্লার কী রূপ' বলে তারিফ করে আর চললে লোকে যেন ওদের পায়ে চোখের কার্পেট বিছিয়ে দেয়। ওরা কাউকেই পরোয়া করে না। সবাই যেন তাদের হুকুমের বশ। এমনি ধারা রাজ্য চালায় যে, মাটি ও আকাশ ভেঙে পড়তে পারে কিন্তু ওদের হুকুম টলবে না। ফরমায়েশটি প্রকাশ না-করতেই লোকে যেন তাদের হৃদপিণ্ড ছিঁড়ে দিয়ে দেয়। কেউ-বা প্রাণটি রাখে হাতের মুঠোয়, কেউ-বা করে জান কোরবান। এরা কারো দিকে ফিরেও তাকায় না। মানুষের জীবনের কোনো দামই নেই ওদের কাছে।

ওরা এতই গর্বোদ্ধত যে, সাতটি মহাদেশের রাজত্ব দিলেও ওরা গ্রাহ্য করে না। ওদের ছলাকলা যদি কাউকে মেরেও ফেলে তো অনেকেই মরতে প্রস্তুত। এদিকে একে কাঁদাচ্ছে, আবার ওদিকে আরেকজনকে হাসাচ্ছে। এদিকে কারো মনে একটু সুড়সুড়ি দিল, আবার চাপলো কারো-বা হৃদয় ভেঙে দিল, আবার কখনো-বা কথায় কথায় রেগে ওঠে। লোকে প্রার্থনা জানাতে থাকে হাতজোড় করে, কেউ-বা করে মানত, কাউকে-বা কথা দিয়ে ভেঙে দিল। কিছু দেবে বলে কিরে কাটল, আবার ভুলেও গেল। সভাস্থ সকলেরই চোখ তাঁদের দিকে। তাঁরা কিন্তু চোখটি তুলেও তাকান না। তাঁদের দৃষ্টি যেদিকে সেইদিকেই সকলের চোখ। যদি ওঁদের চোখ কারও উপর পড়ে তার উপর তখন যায় হাজার লোকের দৃষ্টি। ঈর্ষায় লোক জ্বলে মরে। আর এঁরা প্রতিটি প্রাণ জালিয়ে মারেন। আর মজা এই যে, মনে ওঁদের কিছু নেই। ওঁদের কাছে এও অপদার্থ সেও অপদার্থ—যদি কোনো হতভাগা ওঁদের ছলনার ফাঁদে পড়ে ওঁরাও প্রেমের ভান করেন।

আজকাল ওঁরা আমার যত্ন
খাতির করেন বেশ
আমার কিংবা প্রতিদ্বন্দ্বীর
মরণেই হবে শেষ।

মরবে কোথায় তার প্রতিদ্বন্দ্বী, না শেষ পর্যন্ত সে-ই মারা পড়ে। আর তখনই ওঁদের মন শান্ত হয়। কোনো হতভাগিনীর ঘরে পড়ে যায় কান্নার রোল। আর এদিকে ওঁদের ঘরে বন্ধুদের সাথে চলে হাসি-মস্করার হল্লা।

মির্জা সাহেব এসব কথা আমার চেয়ে আপনি জানেন ভালোই আর বলতেও পারেন। এইসব কাণ্ড-কারখানা দেখে দেখে আমার মনের উপর দিয়ে যা বয়ে যেত সে তো আমিই শুধু ভালো করে জানি। স্ত্রীলোকের উপর যে ঈর্ষা হয় তার কোনো সীমা-পরিসীমা নেই। কথাটি তো সত্যিই। তবে আমার বলতে লজ্জা করে যে, আমি মনে মনে চাইতাম—ওদের যারা চায় তারা আমাকে চাক, আর ওদের জন্য যারা জান দেয় তারা তা আমার জন্যে দিক, আর কারো দিকে যেন না-তাকায় বা প্রাণ না-দেয়। কিন্তু আমার দিকে কেউ তাকিয়েও দেখত না। হুসৈনি পিসির কুঠুরিখানি ছিল দেয়াল থেকে ছাদ পর্যন্ত ঝুলকালিতে ভর্তি। আর তারই এক কোণে একটি নড়বড়ে খাটিয়ায় রাতে পড়ে থাকতাম আমি আর হুসেনি পিসি। এরই আর এক কোণে ছিল একটি উনুন, দুটো জলের কলসী, রান্নার বাসন-কোসন, তামার পাত্র, তাওয়া, রেকাবি, পেয়ালা—সব এখানে ওখানে ছড়ানো-ছিটানো। অপর একটি কোণে ছিল আটার পাত্র। তার উপর হাঁড়িগুলিতে দু-তিন রকমের ডাল, লবণ, মশলাপাতি। এদের পাশে ছিল জ্বালানি কাঠ, দিয়াশলাই কাঠি, মশলা পেষার বড় শিল। সংক্ষেপে ঘর

কন্নার তামাম জিনিসপত্তর ছিল এখানেই। উনুনের উপরে দেয়ালের গায়ে দুটো পেরেক লাগানো। রান্নার সময় বাতিটি এখানে ঝুলিয়ে রাখা হতো। আর রান্না হওয়ার পর খাটিয়ার পাশে রাখা তেল ময়লায় জড়ানো দীপদানিতে আবার সেটি রাখা হতো। বাতিটিতে ছিল পাতলা পলতে। আলো যত না দেয় তার চেয়ে বেশি দেয় ধোঁয়া। আর যতই উসকে দেওয়া হোক-না কেন জ্বলত তা মিটমিট করে। এই কুঠুরিতে আড়া থেকে ঝোলানো ছিল ঝুড়ি। তাদের একটায় থাকত পেঁয়াজ আর অপরটিতে মৌলবী চাচার জন্য রুটি, ডাল, তরকারি। পেঁয়াজের ঝুড়িটি তো ঝোলানো থাকত উনুনের উপর আর দ্বিতীয়টি থাকত ঝোলানো আমার ঠিক বুকের ওপর, মনে হতো, খাবার জিনিসগুলি যেন আমার বুকে বোঝার মতো চেপে রয়েছে। আচমকা যদি খাটিয়ার উপর উঠে দাঁড়াই ঝুড়িটির ঠোক্কর মাথায় লাগবে।

সকাল থেকে বেলা এগারটা পযন্ত চলত মৌলবী সাহেবের চাবুক। আর সন্ধ্যে থেকে রাত নটা পর্যন্ত চলত সঙ্গীত শিক্ষকের ভর্ৎসনা আর ছড়ির মার। আমার স্নেহ-ভালবাসা পাওয়াটা ছিল এই রকমই। তবু এতসব সত্ত্বেও আমি বয়সোচিত ঠাট্টা-তামাশা করতে ছাড়তাম না। চোদ্দ বছর বয়সে প্রথম প্রথম আয়নায় নিজের চেহারা দেখার শখ হতো। হুসেনি পিসি কামরা থেকে বেরলেই আমি তাঁর প্যাটরা খুলে আয়না বের করে নিজের চেহারা দেখতাম আর ছবি-ছাঁদের সাথে অন্যান্য মেয়েদের চেহারার তুলনা করতাম। নিজের চেহারায় আমি কোনো খুঁত দেখিনি আর অন্যদের চেয়ে নিজের চেহারাটা আমার ভালো বলেই মনে হতো। কিন্তু আসলে ঘটনাটি তো সত্যি নয়।

রুশোয়া : তা আপনার চেহারা অন্যের চেয়ে খারাপ ছিল নাকি? আপনিও অনেকের চেয়ে সুন্দরী। আর সে সময়ে তো ছিলেন আরও সুন্দর।

উমরাও : নমস্কার, যাক, এখন তারিফ করাটি রেখে দিন। মাফ করুন, কেননা এখন এর স্থান ও সময় কোনোটাই নয়। কিন্তু হ্যাঁ, এই সময়ে সুন্দরী বলে আমার দেমাক ছিল, আর তাতেই ছিলাম মশগুল; মনে মনে বলতাম কী আমার এমন দোষ যে কেউ-ই আমার দিকে নজর দেয় না।

রুশোয়া : কেউ যে আপনার দিকে নজর দিত না তা সম্ভব বলে মনে হয় না। নজর নিশ্চয়ই দিত। তবে আপনার সে সময় নর্তকীদের মধ্যে প্রচলিত এক ধরনের আনুষ্ঠানিক বিয়ে হয়নি, তাই পাছে খানুম সাহেবা কিছু মনে করেন সেই ভয়ে লোকে মুখে কিছু বলত না।

উমরাও : হয়ত-বা তাই হবে। আমি নিজের রাগে নিজেই সিদ্ধ হচ্ছিলাম। সমবয়সীদের দেখে জ্বলে পুড়ে মরছিলাম। খাওয়া-দাওয়া বন্ধ। রাতে ঘুম নেই। চুল বাঁধার সময় মনটা আরো খারাপ হয়ে যেত কেননা, আমার চুলের বিনুনি করে দেবার মতো কেউ ছিল না। নবাব ছব্বন সাহেব যখন বিসমিল্লার চুল বেঁধে

দিতেন তখন আমার ঈর্ষার সাপ চলে বেড়াত। এখানে আমার চুল বেঁধে দেবার আর কে ছিল। ঐ হুসেনি পিসি। তাও আবার তার ফুরসুৎ হলে। নচেৎ সারাদিনই চুল খোলা থাকত আর আমার চোখে মুখে এলোমেলোভাবে পড়ত। শেষে আমি নিজে চুল বাঁধতে শিখলাম। অন্য মেয়েরা দিনে তিনবার কাপড় বদলাত আর আমার ছিল একপ্রস্থ কাপড় যা সপ্তাহে বদল করতাম একবার। সে পোশাকেরও কোনো বাহার ছিল না। ওরা সব এমব্রয়ডারি করা কাপড় বদলাত, আমার সেই একই সিল্কের পায়জামা, মসলিনের দোপাট্টা, আর কখনো-বা তাতে সৌখিনতা আনার জন্য কিছু রুপোলি কাজ করা।

এর পরও কাপড় বদলে পুরুষমানুষদের মধ্যে গিয়ে বসার জন্য মন চাইত। কখনো-বা বিসমিল্লার ঘরে চলে যেতাম, কখনো-বা আমিরজানের কাছে। কিন্তু যেখানেই যাই-না কেন, কোনো-না কোনো বাহানা করে আমাকে সেখান থেকে সরিয়ে দিত। ওইসব লোক আমার সেখানে বসে থাকাটা পছন্দ করত না। সবারই নিজেদের মজা-মস্করা নিয়ে থাকত। আমাকে বসতে দেবে কে।

ওদের আমাকে বসতে না-দেবার আরও একটি কারণ ছিল। সে সময়ে কিছু রং-ঢং করা শিখেছিলাম। যেখানে বসতাম সেখানে কাউকে-বা মুখ ভেংচাতাম কারো-বা চুল ধরে টানতাম আর কারো-বা মুখে চড়-চাপাটি লাগাতাম। আর পুরুষদের সাথে নানারকম ঢং করতাম। এর জন্যই লোকে আমার বসাটা পছন্দ করত না।

মির্জা সাহেব আপনি বুঝতেই পারছেন যে, আমার এই অবস্থায় এই সময়ে গৌহর মির্জা আমার কাছে কতখানি খোদার আশিস ছিল। কেননা, ও আমার কাছে ভালবাসার কথা বলত, আমার সাথে কষ্টিনষ্টি করত। আমি ওকে আমার আপনজন মনে করতাম আর ও-ও সে সময়ে আমাকে চাইত। সকালে মক্তবে যখন ও পড়তে আসত পকেট থেকে দুটো নাড়ু বের করে চুপি চুপি আমায় দিত। কোনোদিন আনত হালুয়া। এনে আমাকে খাওয়াত। একদিন তো কি জানি কোথা থেকে একটি টাকা এনে আমাকে দিল। হাজার হাজার টাকা আমার জীবনে আমি নিজের হাতে রোজগার করেছি, কিন্তু সেদিনের সেই একটি টাকা পাওয়ার আনন্দ আমি জীবনে ভুলতে পারব না। এর আগে পয়সা অবশ্য আমার মিলেছিল কিন্তু টাকা মেলেনি। অনেকদিন যাবৎ আমি এই টাকা খরচ করিনি। একে তো টাকাটা খরচ করার দরকারই হয়নি। তার উপর আবার এই ভয় ছিল যে পাছে লোকে জিজ্ঞেস করে, এটি পেলাম কোথায়। তখন কী জবাব দেবো? চোদ্দ বছর বয়সে আমি কথা গোপন করতে শিখেছিলাম। আর তা না-শিখলে সাবালিকা হওয়া যায় না। নিঃসন্দেহে আমি সাবালিকা হয়ে উঠেছিলাম।

৫

মনটি আমার করলে চুরি
একটি চালাক চোর
বদমাশ সব পাহারাওলা
শুয়ে ঘুমই বিভোর।

বর্ষাকাল। আকাশ রয়েছে মেঘে ছেয়ে। বৃষ্টি ঝরছে। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। মেঘ ডাকছে। হুসেনি পিসির কামরায় আমি একা রয়েছি পড়ে। হুসেনি পিসি খানুমের সাথে হায়দারির ওখানে গেছেন। প্রদীপটি নিভে গেল। ঘন আঁধারে একটি হাত আরেক হাতখানিও দেখতে পায় না।

আর আর কামরাগুলিতে চলছে কলহাস্য গুঞ্জন। কোনো কোনো জায়গা থেকে-বা হাসির কলকলানি। একা আমিই কেবল আঁধার ঘরে বিছানায় শুয়ে কাঁদছি। আশেপাশে কেউ নেই। মনে যে কী হচ্ছে তা শুধু মনই জানছে। বিদ্যুৎ চমকাতেই লেপের ভিতর মুখ ঢেকে নিলাম। মেঘের গর্জনে কানে দিলাম আঙুল। এই অবস্থাতেই চোখের পাতা লেগে গেল। এমনি সময়ে আমার মনে হলো কে যেন জোর করে আমার হাত ধরল। আমার বাক্‌রোধ হয়ে গেল। মুখ থেকে আওয়াজ পর্যন্ত বেরুল না। শেষে বেহুঁস হয়ে গেলাম। সকালে চোর খোঁজা হলো। কোথায় পাওয়া যাবে তাকে! খানুম মুখ ভার করে বসে রইলেন। হুসেনি পিসি বিড় বিড় করে বকতে থাকলেন। আমি প্রতারিতের মতো চুপ করে বসে রইলাম। সবাই জিজ্ঞেস করতে করতে হয়রান হয়ে গেল। কিন্তু আমি কিছু বুঝতে পারলে তো বলব!

রুশোয়া: এটি বললেন না যে যদি বুঝতে পারতামও তাহলেও বলব কেন?

উমরাও: যাক, আপনি আর হাসবেন না। শুনে যান। খানুমের সেদিনের হতাশা আর হুসেনি পিসির উদাস চেহারাটি আজও আমার মনে পড়লে হাসি পায়।

রুশোয়া: হাসি আসবে না কেন? ওঁদের সব আশাতেই ছাই পড়ল। আর আপনার হলো খুব মজা।

উমরাও: সব আশাই ধুলোয় লুটিয়ে গেল! খানুমকে আপনি চেনেন না। তিনি ছিলেন অতি চালাক। তিনি ঘটনাটাকে এমনিভাবে দাবিয়ে দিলেন যেন কিছুই ঘটেনি। আর ক্ষতটির এমন শুশ্রূষা করলেন যেন ক্ষতটি হয়ত, সম্ভবত ইত্যাদি হয়ে গেল।

এবার চলল যে চোখে কিছুই দেখে না কিন্তু থলিটি টাকায় ভর্তি এমন একটি ছেলের সন্ধান করা।

সে সময়ে এক শাহীবংশের জমিদার-নন্দন লেখাপড়া শেখার জন্য লখনৌ এসেছিলেন। স্বর্গত পিতা ছেলের লেখাপড়া শেখার জন্য জমিদারির বেশ একটা অংশ রেখে গিয়েছিলেন। কিছুদিন তিনি সৎপথেই ছিলেন। তারপর লখনৌ-এর হাওয়া লাগল তাঁর গায়ে। নির্লজ্জ আমোদ-প্রমোদে পোক্ত হয়ে গেলেন। নামটি ছিল তাঁর সরল রশিদ আলি। রশিদ একটি কাব্যিক নাম। নিজের নামের সাথে যোগ করে নিলেন। লখনৌ-এর কোনো একজন ওস্তাদ ওঁকে বানিয়ে দিলেন 'মুর্শেদ'। এই কাবিক নামটির উপর ওঁর বেশ গর্ব ছিল। দেশ থেকে ওঁর যেসব সঙ্গীসাথীরা এসেছিলেন তাঁরা সব বলতেন রখ্‌খন মিঞা, লখনৌ-এর লোক ওঁকে দিলেন রাজা খেতাব। এই নাম আর উপাধিতে কিছু গেঁয়ো গন্ধ ছিল। উনি লখনৌ-এর চালচলন রপ্ত করার জন্য যেন মরে যাচ্ছিলেন। এজন্য অল্পদিনের মধ্যেই নবাব সাহেব বনে গেলেন। বাড়ি থেকে যখন এসেছিলেন, মুখে খাসা দাড়ি ছিল। লখনৌ-এর হাওয়া লাগতেই দাড়ি ছোট করে ছাঁটা হলো।

মুখ থেকে দাড়ি ছেঁটে ফেলতে কুশ্রী চেহারা বেরিয়ে এল। কিন্তু ওঁর কাছে সেটি মনে হল সুশ্রী, রং কালো, মুখে বসন্তের দাগ, থ্যাবড়া নাক, ছোট ছোট চোখ, গাল তোবড়ানো, ঘাড় বেঁটে, কপাল সরু। বেঁটে চেহারা, কিন্তু নিজেকে তিনি ভাবতেন যোশেফের মতো সুপুরুষ। আর আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে গোঁফ এমনভাবে চুমরে দিতেন যে শেষ পর্যন্ত তা একটি ছুঁচোর লেজের মতো দেখাত। উনি লম্বা চুল রাখলেন, তার প্রান্তটি কোঁচকান। মাথায় পরলেন ছুঁচলো কাপড়ের টুপি, গায়ে বোতামবিহীন কোট আর জরির চওড়া বোতামওলা পায়জামা। এতসব কষ্ট করা কেবলমাত্র বেশ্যাবাড়িতে যাতায়াতের জন্য।

একে তো রখ্‌খন মিঞা নিজেই ছিলেন খুব বাচাল তার উপর আবার সম্ভ্রান্ত বংশীয়দের সুপারিশে শহরের সেরা বাঈজিদের ঘরে অল্পদিনের মধ্যেই যাতায়াতের সুযোগ পেয়ে গেলেন। আর তা হলো খুবই খোলাখুলিভাবে, তাদের সাথে খিস্তি-খেউড়, চড়া গলায় চেঁচামেচি ইত্যাদি চলতে লাগল। এক সুন্দরী জুতো ছুঁড়ে মারলে উনি মিটিমিটি হাসতে থাকেন। এসব সত্ত্বেও বাইরে কোনো বাড়িউলিমাসিকে দেখলে খুব সম্মান দেখাতেন।

যে স্ত্রীলোকটির সাথে একটি মাত্র রাত কাটিয়েছেন তার বাড়িউলির সাথে দেখা হতেই সসম্ভ্রমে 'মা' বলে ডাকাটা এঁর একটি অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল। তা করায় বন্ধু-বান্ধবদের সামনে এই নীতিটি জাহির করা যে তিনি ওখানকার সম্প্রদায়ভুক্ত হয়ে গেছেন।

সন্ধ্যে থেকে রাত দুটো-তিনটে পর্যন্ত খানুম সাহেবার ঘরে আড্ডা দিতেন। তার প্রত্যেকটি ঘরের মেয়েদের সাথে তিনি রাত কাটাতেন। আবার সঙ্গীত-

বিদ্যায়ও নিজেকে বেশ পোক্ত মনে করতেন। নিজেই ঠুংরি রচনা করে তাতে সুর দিয়ে গাইতেন। আর নিজেই তার ভাল ব্যাখ্যা করতেন। মুখে আবার তবলাও বাজাতেন। বন্ধু বান্ধবরাও খুব তৈরি করে নিয়েছিল। ওরা তাঁর কবিতার খুব উঁচু প্রশংসা করে তাঁকে আতিশ ও নাসিখ বলত। কবিতার আসরে নিয়ে গিয়ে ওঁকে দিয়ে গজল পড়াল। সভা মেতে উঠল। স্ত্রীদের ভাষায় কবিতা পড়ার আগে ওকে কবিতা পড়তে ডাকত। আর হাসতে হাসতে লোকের পেটে খিল ধরে যেত। লোকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করত আর উনি খুশি হতেন আর মাথা নুইয়ে নুইয়ে নমস্কার জানাতেন।

দেশ থেকে বিনা ওজর-আপত্তিতেই টাকা আসত। মা বেচারি এই মনে করে টাকা পাঠাতেন যে ছেলে পড়তে গিয়েছে। মৌলবী হয়ে ফিরে আসবে।

তাই. ইনি যা কিছু টাকার কথা লিখে পাঠাতেন তা-ই তিনি পাঠিয়ে দিতেন। ওঁর লখনৌ-এর ভাবনাহীন, পোশাক-আসাকে দুরন্ত, বিনা খরচে খেয়ে থাকে এমন সব লোকই হলো তার সঙ্গী। লোকের মুখে আমার কথা শুনে আমার ঘরে ওঁর আসার ইচ্ছে হলো। ইচ্ছেটি বাড়তে বাড়তে শেষে উদগ্র কামনার স্তরে পৌঁছে গেল। খানুম এদিকে দর কষাকষি করতে থাকলেন। বললেন, না সাহেব, ও যে এখনো নাবালিকা, আর ওঁর চলল আকুতি-কাকুতি আর মিনতি ও হা-হুতাশ। কি সে ছটফটানি, আজ অবধি তা আমার মনে আছে। শেষ পর্যন্ত ফকির দরবেশদের তাবিজ আর বন্ধু-বান্ধবদের চেষ্টার ওষুধে ফল হলো। চুক্তি হলো পাঁচ হাজার টাকার। এ কারণে কয়েকদিনের জন্য ওঁকে গাঁয়ে যেতে হলো। মাকে লুকিয়ে দুখানি গ্রাম বন্ধক দিয়ে বিশ-পঁচিশ হাজার টাকা নিয়ে লখনৌ ফিরলেন। এক হাজারের পাঁচটি তোড়া খানুমের খাজাঞ্চি মারফৎ জমা দেয়া হলো।

হুসেনি পিসিও দান-খয়রাতির নামে পাঁচশ টাকা নিলেন। আমি রখ্‌খন মিঞার কাছে মাথা বন্ধক দিলাম। ছমাস উনি লখনৌ-এ ছিলেন। খানুমকে আমার বাবদ একশো টাকা মাসে মাসে দিতেন। আমাকেও চুপি চুপি কিছু টাকা দিতেন। তা আমি খানুমকে লুকিয়ে হুসেনি পিসির কাছে দিতাম। এবার আমি পুরোপুরি স্বাধীন হয়ে গেলাম। আমার সেবায় নিযুক্ত রইল দুটি চাকর আর দুটি চাকরাণী। ফটকের পাশের রাখার জন্য বাতি দেয়া হলো। দু-চারটে পুরুষ, ধার্মিক জনাকয়েক নবাবজাদাও আমার কাছে বসতে শুরু করলেন।

গৌহর মির্জা (সর্বপ্রথম যে ফুলটি তুলেছিল) বরাবর আমার কাছে আসতে থাকল। খানুম আর হুসেনি পিসি ওকে দেখলেই জ্বলে উঠতেন। কিন্তু আমি ওকে ভালবাসতাম বলে কেউ ওর যাওয়া-আসা বন্ধ করতে পারতেন না। গৌহর মির্জার বাবা মারা গেলেন। ওদিক থেকে যে মাসোহারা আসছিল তা বন্ধ হয়ে গেল। বন্নু বুড়ি হয়ে গিয়েছিলেন। কোনো খরিদ্দার ছিল না। তাই গৌহর মির্জার দায়-দায়িত্ব এসে বর্তাল আমার ঘাড়ে।

সব বেশ্যাদেরই একজন-না একজন পোষা লোক আছে। এতে অবশ্য তাদের লাভ অনেক। একে তো কোনো সময় ধারে কাছেকেউ না। থাকলে এরাই সময় কাটাতে সাহায্য করে, বাজার-হাট এরা করে, দরদস্তর করে। আর চাকর-বাকর বাজারে গেলে কিছু। না কিছু মারবেই। এরা অনুগ্রহপ্রার্থী হিসেবে সারা শহর খুঁজে পেতে ভালো ভালো জিনিস নিয়ে আসে। অসুখ-বিসুখে প্রাণ দিয়ে সেবা-যত্ন করে। সবরকম কষ্টের উপশম ঘটাতে সাহায্য করে। সারা রাতভর পা টিপে দেয়। সকালে ওষুধ ঢেলে খাওয়ায়। আবার হেকিমের কাছে গিয়ে অবস্থার কথা বলে ওষুধ আনে। বন্ধু ও পরিচিত মহলে আমাদের খুব প্রশংসা করে আর সুযোগমত খরিদ্দার যোগাড় করে আনে। যেখানে বিয়ে-সাদি হয় নিজেরা সেখানে গিয়ে নাচের মুজরো ঠিক করে এসে আমাদের নিয়ে যায়। সভায় লোকজন ঝিমিয়ে পড়লে সেটা সরগরম করে তোলে। এরা কখনো-বা নাচে, কখনো-বা তাল দেয়। প্রতিটি শমে 'আহ্' দেয়। প্রতিটি তালে দেয় 'ওয়াহ্'। এরাই অঙ্গভঙ্গি করে আর গানের মুদ্রা ব্যাখ্যা করে। আমাদের সবচেয়ে ভালো খাবারের ব্যবস্থা করে। অন্যদের চাইতে আমাদের খাতির-যত্ন বেশিই পাওয়া যায়। পুরস্কার ধনদৌলত বেশি মেলে। আর কোনো বিত্তশালী এসে পড়লে এদেরই প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে খাড়া করা হয়। এদিকে বাবুটি চাচ্ছেন যে স্ত্রীলোকটি তাঁকেই কাছে রাখুক আর ওদিকে সে ঐ লোকটির ভালবাসার কথা বার বার তাঁকে শোনায়। কখনো কখনো আবার এমন কৌশল করে বলে, সাহেব, আমি তো ওর বাঁধা, কী করে যে আপনার কাছে আসি আমি তা বুঝতে পারিনে। এবার ওর আসার সময় হলো, আমাকে যেতে দিন। ওতো আমার বরাবরের জন্য, আপনি আর আমাকে ক'দিন রাখবেন, বলুন।

যারা বেশ্যাবাড়িতে আসে তাদের এরা দাবিয়ে রাখে। কারো সাথে তর্কাতর্কি হলে এরা রক্ষা করতে প্রস্তুত। শহরের গুণ্ডা-বদমাশদের সাথে এদের ওঠা-বসা। কথায় কথায় পঞ্চাশ-ষাটজন লোক জড়ো করতে পারে। অন্যদিকে স্বয়ং বাড়িউলিরও সর্বদা ভয় লেগে থাকে পাছে তার পেয়ারের লোকের সাথে মেয়েটি তার বাড়িতে উঠে না বসে।

আমিরজান কাজিম আলিকে খুব ভালবাসত। কয়েক বছর তাকে টাকা দিয়েছে। একবার পাঁচশ টাকায় একজোড়া বালা ওকে দেয়। সকালে সোরগোল তোলে যে, কেউ হাত থেকে চুরি করে খুলে নিয়ে গেছে। আরেকবার এগার শ' টাকার একজোড়া কানবালা খুলে দিয়ে রটায় যে, আয়েসবাগের মেলায় কান থেকে খুলে পড়ে গেছে। এইরকম হাজার হাজার টাকা আমিরজান তাকে দিত।

কাজিম আলির সংসার চলত আমিরজানের দয়ায়।

খুরশিদ ভালবাসত পিয়ারজানকে। বিসমিল্লাজান ভালবাসত না কাউকেই। সে ছিল খুব ক্ষুদ্রমনা। কারো কাছে সে বাঁধা ছিল না।

অন্য পরে কা কথা। খানুম সাহেবারই বয়স হয়েছিল পঞ্চাশ পঞ্চান্ন। মির আউলাদ আলি ছিল তাঁর প্রেমিক। মির সাহেবের বয়স ছিল মাত্র আঠারো-উনিশ বছর। খুব সুশ্রী আর জোয়ান। কুস্তিগীর। ভালো ভালো মেয়েদেরও সে নজরে পড়ত।

খানুম ছিল খুব রাশভারি। কার সাধ্য কোনো কথা বলে। বেচারা ছিল গরিব। দুবেলা খাওয়া জুটত না। খানুমের কৃপায় তার সংসার চলত। নিজের থেকে তিনি দেড় হাজার টাকা ব্যয় করে আউলাদ আলির বিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু বিয়ের রাত ছাড়া আর একটি দিনও সে তার স্ত্রীর সাথে রাতে থাকতে পায়নি। সারাক্ষণ সে খানুমের বাড়িতে থাকত। দিনের বেলায় কেবল ঘণ্টা দুয়েকের জন্য বাড়িতে যেতে পারত।

আরও একজন মির্জা সাহেব ছিলেন খানুমের পূর্ব প্রেমিক। বয়স ছিল তাঁর সত্তর বছর। কোমর গিয়েছিল বেঁকে। মুখে ছিল না দাঁত। হার্নিয়ার রোগী। খানুমের সাথে তাঁর কোনো সম্পর্ক ছিল না। তাও তিনি ঘরের লোকের মতোই ছিলেন। সকাল-সন্ধ্যায় খানুমের সাথে খেতে বসতেন। খানুমই তাঁর পোশাক-আসাক তৈরি করিয়ে দিতেন আর মিছরি দিয়ে তাঁর আফিং খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিতেন। একদিন আমরা সবাই খানুমের কাছে আছি। খুরশিদজান খুব মনমরা হয়ে বসে।

কেন পিয়ারজানের বিয়ে হবে, সেজন্য খুরশিদের মন খুব ভারাক্রান্ত। খানুম রীতিমত ভর্ৎসনা করে বললেন, যাও ছুকরিরা! একালে কিরকম যে ভালবাসা তা বুঝতে পারিনে। যেমন মেয়েরা, তেমনি তাদের প্রেমিক। আমাদের কালে ছিল একরকম। এঁকে (মির্জা সাহেবকে ইশারায় দেখিয়ে) দেখো। এই একজন মরদ বসে আছেন এখানে যিনি যৌবনে আমার প্রেমে মজেছিলেন। বাপ-মা সাদি ঠিক করেন। উনি বর বিয়ের আগে যে ভোজ দেয় তখনকার কাপড় পরে আমাকে দেখতে আসেন। আমি তো সে কাপড় টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে দিলাম। ওঁকে হাত ধরে দিলাম বসিয়ে. ওঁকে যেতে দেব না। এর পর চল্লিশ বছর কেটে গেছে আজ পর্যন্ত উনি ঘরে ফেরেননি। তোমাদের এরকম কেউ আছে? আমরা সবাই মাথা নিচু করে রইলাম।

বিসমিল্লার নর্তকীদের মধ্যে প্রচলিত রীতি অনুসারে বিয়ের সময়েই আমি প্রথম নাচ-গান করি। কিন্তু আমি প্রথম মুজরো গাই সুজাত আলি খাঁর ছেলের বিয়েতে। সে জলসাটির কথাও মনে পড়ে। দামী কাঁচের ঝাড়-লণ্ঠনের আলোয় রাত দিন হয়ে গিয়েছিল। সাদা ফরাস বিছানো। পার্শি গালিচা বিছানো. জরির তাকিয়া আর সামনে সারি সারি বসানো নানা রঙের কলসীর আকারের কাঁচের বাতিদানের মধ্যে বাতি জ্বলছে।

আতর আর ফুলের গন্ধে বাতাস ছিল ভরপুর। হুঁকোর ধোঁয়ার সুগন্ধ।

এদের সুগন্ধে মন ছিল মাতোয়ারা। তখন আমার বয়স চোদ্দ বছর। এই সময় বরোদা থেকে এসেছিলেন একজন বাঈজি। গোটা শহরে তাঁর গানের ধূম পড়ে যায়। বড় বড় গাইয়েরাও তাঁকে সম্ভ্রম করতেন। সঙ্গীতশাস্ত্র ছিল তাঁর অধিগত। কণ্ঠস্বর খুব জোরাল—বহুদূর চলে যেত। কিন্তু খানুম সাহেবা সেখানে বসে রং-তামাশা দেখছিলেন। তাঁর গান গাওয়ার পর খানুম আমাকে দিলেন দাঁড় করিয়ে। আমি আর কী বুঝি, কিন্তু সমঝদার লোকেরা খানুম সাহেবা করছেন কী ভেবে উদ্বিগ্ন হচ্ছিলেন। এরকম ওস্তাদ বাঈজির পর আমার গান জমবে কি?

প্রথমে শুরু হলো নাচের সাথে গান। এ সময় সভার কিছু লোক আমার মুখোমুখি হলেন। আমারও ছিল যৌবন। সুশ্রী অবিশ্যি ছিলাম না। কিন্তু ছিল যৌবনের সরসতা, লাবণ্য আর উচ্ছলতা।

যৌবনের দিনগুলি কেটেছে কেমন
জানতে চেয়ো না কিছু তার
আহা। কি মধুর সেই দিনগুলি সব
কেটেছে যে বলব কি আর।

সামান্য কিছু গানের সাথে অল্প সময় নেচেছি, এমনি সময়ে খানুম গজল শুরু করিয়ে দিলেন।

আজ এই সমারোহ কী যে
রং-তামাশা পায়
দেখুন দেখুন সবে, কী ঘটছে
এক লহমায়।

গজলটি শুরু করার সাথে সাথেই সভার সকলে যেন লুটিয়ে পড়লেন। এরপর দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তি একটু অঙ্গভঙ্গি করে ব্যাখ্যা করে যেই গেয়েছি সভাসীনরা দুলতে লাগলেন।

থেমে গেলে আমার নালিশ
রুষ্ট হয়ে করে অত্যাচার
বেদনাটি রুদ্ধ যদি হয়
জ্বলে ওঠে ক্রোধাগ্নি তাহার।

আর এই কবিতাটি আলোড়ন স্থায়ী করে দিল।

ফের প্রেয়সীর আড়-চাহনি
চোখটি তাঁর বাঁকা।
দেখুন দেখুন সে নয়ন-বান
গেল আবার ফাঁকা॥

এই কবিতাটির অবস্থা হলো এমনই যে, যার চোখে চোখ রেখে গানটি গাইলাম, সে আর চোখ ফিরিয়ে নিতে পারল না—

মূর্তি-পূজারীর মাঝে সবচেয়ে
আমার বদনাম।
যেখানে খোদার কথা
সেইখানে মাথা নামালাম॥

এই কবিতাটি শুনুন আর ফুর্তিবাজদের উপর এর কী প্রভাব পড়বে সে বিষয়ে মতামত দিন—

প্রেমে কামনা বল
ঘুচবে কী করে
হতভাগা মরেও যদি
তবু মজা ঝরে।

আবার এরপর এই কবিতাটি পড়লাম—

মনের খবর বলব নাকো তারে
গেছি সে তো ভুলে
বানিয়ে কথা বলিও-বা যদি
দাঁড়াবে কি তা মূলে?

সমস্ত শ্রোতার মধ্যে আনন্দের দৃশ্য দেখা গেল। প্রতিটি লোক ছিল উৎফুল্ল। প্রতিটি শব্দে ওয়াহ্, প্রতিটি শমে অহা-হা-হা হতে থাকে। এক-একটি কবিতা আট-দশবার গাইলেও শেষ হতে চায় না। এই গজলটির পর আমার পালা শেষ হলো। অন্য মুজরোতেও একই গান গাইতে হয়েছে।

রুশোয়া : শ্রোতাদের যা হাল হয়েছিল, চুলোয় যাক। এই ধরনের আর কিছু গজল মনে থাকলে শুনিয়ে দিন,—এটি কার গজল?

উমরাও : আহা! আপনি জানেন না নাকি?

রুশোয়া : বুঝলাম।

উমরাও : অন্য কবিতা শুনুন—

প্রেমে হাবুডুবু খেয়ে পৌঁছে যায়
কবর কিনারে
তাও তো তখন কামনার
নিটোল যদি ছোঁয় তারে।

রুশোয়া : সাবাশ।

উমরাও : কলম সত্যিই নিংড়ে ভেঙে ফেলেছে—

আগুনের ফুলকি আহ্
তাতে যতটুকু থাক দীর্ঘশ্বাস

তা যদি না হয় তবে
ফুলকিও শেষে তো বাতাস।

রুশোয়া : এটি দর্শন আর দার্শনিকরাই বোঝেন ভালো।

উমরাও : আরও শুনুন—

কতখানি সৌন্দর্যের
আমি রসগ্রাহী
দুঃখে ভরে যাবে অন্তর আমার
তবে আমি তার অনুরাগী

রুশোয়া : এটিও দর্শন আর ওঁরাই তা বোঝেন।

উমরাও : আরও শুনুন—

ভালবাসা দেখাবেই যদি
ভেঙো নাকো হৃদয় আমার।
এ মনের আয়নায় দেখ তো
দেখা দেয় সৌন্দর্যটি তার॥

রুশোয়া : এ সুফীদের অতীন্দ্রিয়বাদ। আমি হচ্ছি মাটির মানুষ। আমার এতে কোনো প্রয়োজন নেই। তবে 'ভালবাসা দেখানো' শব্দগুলি কেমন করে মিলে যায়—

উমরাও : শেষ পঙ্‌ক্তি শুনুন—

বিরহে বিলাপ নয়
করো নাকো নালিশ করুণ
এসবে বাড়বে শুধু
নিষ্ঠুর ক্রোধের আগুন।

রুশোয়া : কবিতাটির শুরু থেকে শেষ পঙ্‌ক্তিটি বেরিয়েছে। শেষ পঙ্‌ক্তিটি বলার ফুরসুৎ হয়ত মেলেনি।

উমরাও : ফুরসুৎ ওঁর আর কবে মেলে ?

প্রথম মুজরোর দ্বিতীয় দিনে হুসেনি পিসি আমার কামরায় এলেন। সাথে একজন ভৃত্য।

হুসেনি পিসি : দেখ উমরাও, সাহেব এ কী বলছে।

বলেই হুসেনি পিসি কামরার বাইরে চলে গেলেন।

ভৃত্য : (সেলাম করে) নবাব সুলতান সাহেব আমাকে পাঠিয়েছেন। উনি কাল আসরে মাথায় সোনার কাজকরা পাগড়ি পরে ঘরের ডান দিকে বসে ছিলেন। উনি বলে পাঠিয়েছেন যে, তিনি এই শর্তে আসতে চান যে তিনি যেঁ-সময়ে আসবেন তখন আর কেউ যেন না থাকে। আর কাল যে-গজলটি আপনি গেয়েছিলেন তার নকলটি চেয়েছেন।

আমি : নবাবকে আমার অনেক সেলাম জানাবেন আর বলবেন যে-কোনোদিন সন্ধ্যায় অনুগ্রহ করে আসুন, সে-সময়ে ঘর খালি থাকবে। কাল দিনে যে-কোনো সময়ে গজলটির জন্য আসবেন, লিখে দেব।

পরের দিন সকালের দিকে লোকটি এল। ঘরে আমি একলাটি বসেছিলাম। গজলটি নকল করেই রেখেছিলাম, সেটি ওকে দিলাম। লোকটি গাঁট থেকে পাঁচটি সোনার টাকা বের করে আমাকে দিলে আর বললে, নবাব সাহেব এই কথা বলতে বলেছেন, এ তো আপনার যোগ্য দক্ষিণা নয়, তবে পান খেতে যাহোক কিছু দিলাম, আর আজ রাতে বাতি জ্বলার পর নিশ্চয়ই আসব। ভৃত্যটি সেলাম করে চলে গেল। ওর চলে যাওয়ার পর আমার প্রথমে খেয়াল হলো যে খানুম সাহেবাকে দেবার জন্য হুসেনি পিসিকে ডেকে টাকাটা দিয়ে দিই। কিন্তু নূতন স্বর্ণমুদ্রাগুলোর চাকচিক্য দেখে সে-মতলব ছেড়ে দিলাম। সে-সময়ে আমার সিন্দুক-টিন্দুক ছিল না। তাই খাটিয়ার পায়ার নীচে সেগুলিকে চাপা দিয়ে রেখে দিলাম।

৬

মির্জা সাহেব, আমার মনে হয় প্রতিটি স্ত্রীলোকের জীবনে এমন একটি সময় আসে যখন সে কারো ভালবাসা পেতে চায়। আর এই চাওয়াটা শুরু হয় যৌবনের শুরু থেকেই, যেটা বয়স বাড়ার সাথে সাথে বাড়তেই থাকে। এ চাওয়াটা কেবলমাত্র মনের সাময়িক চাহিদা নয়।

গৌহর মির্জা অবশ্যই এই রকম একটি লোক, আমার চাওয়ার মতো। কিন্তু সে চাওয়াটা অন্য ধরনের। ওর ছিল একটি জিনিসের অভাব—যা আমি খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম। ওর স্বভাবটি ছিল ওর মায়ের মতোই, মেয়েলিপনা করা—পৌরুষ-দীপ্ত নয়। ও যা-কিছু পেত সবই আমার কাছ থেকে চেয়ে, ছিনতাই করে নিত। দেয়নি ও কিছুই কেবল সেই একটি টাকা ছাড়া, যার কথা আমি আগেই বলেছি। এখন আমি এমন একজনকে খুঁজে ফিরছিলাম যে আমাকে খোশামোদ-তোষামোদ করে চলবে, টাকা-পয়সা খরচ করবে, খাওয়াবে-পরাবে। নবাব সুলতান সাহেব (নবাব সাহেবের এই নামই লোকে বলে) সুপুরুষ ছিলেন। ওঁর চেহারায় ছিল এমন একটি গাম্ভীর্য যার ফলে স্ত্রীলোক মন-প্রাণ ঢেলে দিত।

কিছু লোক ভুল করে বলে যে, মেয়েরা কেবল খোশামোদ আর ভালবাসার প্রকাশ করাটা পছন্দ করে। সত্যিই তা তারা পছন্দ করে, কিন্তু সেটি এই শর্তে যে তার মধ্যে একটুও নীচতা নেই। যে-লোকের লক্ষ্য মেয়েদের গয়নার দিকে, যার প্রতিটি ইঙ্গিত থেকে এই ইচ্ছে প্রকাশ পায় যে, খোদাকে লোকে যেভাবে চায় আমাকেও সেইভাবে চাক, যা-কিছু আছে আমাকে দাও, আর ঘর সামলাও, রুটি তৈরি করে করে খাওয়াও আর আমার ছেলেমেয়েদের জুতো ঝাড়পোঁছ কর, সেসব লোকদের মেয়েরা আদৌ পছন্দ করে না। প্রত্যেকটি লোকই কিছু আর যোসেফের মতো সুন্দর নয় যে মেয়েরা তার জন্য জান দেবে। পুরুষ আর স্ত্রীলোক আর স্ত্রী-পুরুষে ভালবাসে। কিন্তু তার মধ্যে সর্বদাই একটা সম্ভ্রমের চিহ্ন থাকে। লয়লামজনু শিরিঁফরহাদের মতো নিঃস্বার্থ প্রেম কেবল গল্প-উপকথাতেই পাওয়া যায়। আমিও চোখে দু-একটি এ রকম দেখেছি, তবে তা মানসিক বিকার বলে গণ্য করা যেতে পারে। আবার মেয়ে পুরুষ দুজনেরই পাগল হওয়ার কী দরকার।

দ্বিতীয় দিন রাতে নবাব সাহেব আসলেন। হুসেনি মিসর সাথে মামুলী কথা-বার্তা ও দরদামের কথা গোপনে চুকিয়ে একা কামরায় ঢুকলেন। মনে হলো, নবাব

সাহেব স্থায়ী রক্ষিতা হিসেবে আমার সম্বন্ধে চুক্তি করেননি। মাঝে মাঝে ঘণ্টা-দুয়েকের রাতের দিকে ঘণ্টাখানেক কি ঘণ্টা-দুয়েকের জন্য আসবেন। নবাব সাহেব ছিলেন খুবই কমবয়সী—সাদাসিধে লোক। বয়স হবে আঠারো/উনিশ বছর। খোদা সৃষ্ট একটি গোলঘরে তিনি লালিত-পালিত হয়েছিলেন। মা-বাবার আজ্ঞাধীন সংসারের ছল-চাতুরী থেকে ছিলেন তিনি তফাতে। তাঁর ভালবাসার কথাটি প্রকাশ পায় ভৃত্যের মারফৎ, নইলে কথাটি প্রকাশ করতে একটু মুশকিলেই পড়তেন। যাহোক, আমি অল্প সময়েই তাঁকে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করার পরিবেশ তৈরি করে দিলাম। প্রচুর সোহাগের কথা বললাম, একেবারে প্রেমে মজে গেলাম। এটিতে অবশ্য কিছুটা ছিল সত্যি আর কিছুটা মিথ্যে। এটি সত্য যে নবাবের চেহারাখানি ছিল এমনই যে একটি কামী স্ত্রীলোক, তা তার মন যতই শক্ত হোক-না-কেন, তাঁকে দেখে না মজে পারত না। কনকচাঁপার মতো তাঁর রং, উন্নত নাসা, পাতলা ঠোঁট, ঝিকমিকে দাঁত, কোঁকড়ানো চুল, লম্বা মুখ, উঁচু মাথা, বড় বড় চোখ, সুডৌল বাহু, কুস্তীগীরের দীর্ঘ দেহ, চওড়া পেশী। খোদা যেন তাঁকে আপাদমস্তক একটি অপূর্ব বিভায় ঢালাই করেছেন। ভালো ভালো কথা বলেন। কথায় কথায় বলেন কবিতা।

আর কবিতা পড়েন গড়গড় করে—তোতার মতো। ইনি ছিলেন অভিজাত কবি, বাবার সাথে কবিতা পাঠের আসরে গজল পড়তেন। বড়দের সামনে কবিতা পড়তেও ইনি পিছ-পা হতেন না। বড়দের সামনে ছেলেরা হয়ত অন্য কোনো কথা বলতে পারে না। কিন্তু কবিতা পাঠের বেলায় অন্য রকম। এখানে বড়রা ছোটদের সামনে বা ছোটরা বড়দের সামনে অক্লেশে কবিতা পাঠ করেন। আজকের রাতটি ছিল বেশ মজার।

নবাব: আপনার মোহনীয় ভঙ্গিমা আমাকে এমনই মুগ্ধ করেছে যে আপনাকে না দেখলে আমার হুঁস ফিরছিল না।

আমি: এসবই আপনার গুণগ্রাহিতার ফল। নচেৎ আমি তো জানি আমি কে আর আমার মূল্যই-বা কতখানি। কথায় আছে, বাঁদরের দৌড় কত তা বাঁদীরই জানা উচিত।

নবাব: অহো! আপনাকে তো শিক্ষিতা মনে হচ্ছে।

আমি: জি হ্যাঁ, কিছু অ আ ক খ তো পড়েছি।

নবাব: কবিতা লিখতেও তো জানেন!

আমি: জি হ্যাঁ, লিখতেও পারি।

নবাব: তো ঐ গজলটি কি আপনারই হাতের লেখা?

আমি মুচকি হেসে চুপ করে রইলাম।

নবাব: ও আল্লা, কি খাসা লেখা! এই কথায় মনটি ভারি খুশি হলো। চাকর-বাকরকে দিয়ে মনের কথা চালাচালি করা যায় না। এখন থেকে কলমের মারফৎ

আমরা কথা বলব। যতদূর সম্ভব এরকম ব্যাপারে তৃতীয় ব্যক্তি মাধ্যম না হওয়াই ভালো।

যে কথাটি চলবে শুধু তোমায় আমায়
কানাকানি।
সুহৃদ কিংবা অন্যে কেন করবে সেটি
জানাজানি।

আমি : কবিতাটি কি আপনারই লেখা ?

নবাব : জি না, এটি বলেছেন প্রয়াত পিতা।

আমি : কি চমৎকার বলেছেন!

নবাব : আল্লার দোহাই, আপনার কবিতায়ও রুচি আছে।

আল্লা গড়েছেন যাকে শ্রীমণ্ডিত করে
লেখায় বচনে তার যেন সেটি ঝরে।

আমি : কবিতাটি কার ?

নবাব : ওঁরই।

আমি : খাসা বলেছেন।

নবাব : জি হ্যাঁ, উনি এমনি ধারাই বলতেন। এটি যেন আপনারই সৌন্দর্যের উপযুক্ত।

আমি : এ তোমার বদান্যতা
আমার বেলায়
নইলে কেই-বা আমি,
কোন্ সভ্যতায়।

নবাব : আহ্, কি সহজ সরল কবিতা!

আমি : নমস্কার।

নবাব : বলুন না কেন, আপনি কবিতাও লেখেন।

আমি : জি না, আপনাদের মতো গুণগ্রাহীদের কাছ থেকে লিখিয়ে নিই।

কথাটি শুনেই নবাব সাহেবের মুখে কালো ছায়া যেন পড়ল। পরক্ষণেই আমাকে মুচ্‌কি হাসতে দেখে হাসিতে ফেটে পড়লেন।

নবাব : বেশ বলেছেন। জি হ্যাঁ, বাঈজিদের হামেশাই রেয়াজ যে তাঁদের বন্ধুদের নাম করে তাঁরা নিজেদের লেখা পড়েন।

আমি : বাঈজিদের কথাই শুধু বলবেন না, ছেলেরাও কি এমনটি করে না ?

নবাব : দোহাই আল্লা, কথাটি ঠিক। প্রয়াত পিতার বন্ধুদের মধ্যে আকছার এমন লোক ছিলেন যাঁরা একটি লাইন কবিতাও লেখেননি অথচ কাব্য পাঠের আসরে কবিতা পড়ার জন্য তৈরি। প্রায়ই পিতা তাঁর কবিতা ওঁদের পড়ার জন্য দিতেন। কখনো এমনও হত যে আমার গজলের খাতা থেকে কবিতা নিয়ে

বন্ধুদের দিতেন। এতে তৃপ্তি কোথায়? প্রয়াত পিতা বলতেন আমাকে ওস্তাদ কবিদের লেখা থেকে কবিতা নিয়ে পাঠ করতে। মিথ্যে প্রশংসায় মন কি করে খুশি হবে।

আমি: খোদা জানেন, এটিও একটি খেয়াল। আর খেয়ালটি বদ।

নবাব: আচ্ছা এই গজলটির আর কোনো পঙ্‌ক্তি মনে থাকলে পড়ুন।

আমি: তোমাকে যা পীড়া দেয়
সে নালিশ আর কান্না
জানাবে না—রীতি নয়,
কর্তব্য তা না।

নবাব: কি কবিতাই পড়লেন। আবার পড়বেন? ও আল্লা, কেমন নতুন কথা বলেছেন।

আমি: (কবিতাটি দ্বিতীয়বার পড়ে) নমস্কার। আপনি মর্যাদা দিচ্ছেন।

নবাব: কবিতাটিই খাসা। আর কোনো কবিতা পড়ুন।

আমি: এরকম আর কোনো কবিতা আমার নেই। এখনই দুটো পড়লাম।

নবাব: এটি হলো অন্য কথা। এখনই মুখে মুখে এই ধরনের কাবতা বলুন। আচ্ছা, অন্য কোনো কবিতার পঙ্‌ক্তি পড়ুন।

আমি: এবার আপনি কিছু ইচ্ছে করুন। এরই জন্যে আমি আগে পথ দেখিয়েছি।

নবাব: আমি পড়ছি। কিন্তু আপনাকেও পড়তে হবে।

এমনি সময়ে কামরার দরজাটি দুম্ করে খুলে গেল। আর পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন বছরের একটি লোক কামরায় এসে ঢুকল। লোকটির রং কালো, মুখে লম্বা দাড়ি। মাথায় তেরছা পাগড়ি বাঁধা। কোমরবন্ধে ছোরা ঝোলানো। কামরায় ঢুকেই বিনা আয়াসেই আমার হাঁটু চেপে বসে গেল। নবাব সাহেব আমার দিকে তাকালেন। আমি মাথা নিচু করে নিলাম। কাটলেও শরীর থেকে রক্ত ঝরবে না। নবাব সাহেবের সাথে শর্ত ছিল যে তিনি একাই থাকবেন। কামরায় দ্বিতীয় কেউ থাকবে না। কি মজা করেই না কথাবার্তা বলছিলাম। কি নির্মল আনন্দ। কতই-না স্বাধীন মনোনিবেশ ছিল। হঠাৎ কোথা থেকে এই ভয়ানক আপদ এসে জুটল! আমার কপালে ছিল পাথর, আর তা শক্তও বটে।

হায়, কেমন মজার সংসর্গটি ছিল। এই বদমাশটি এমন আনন্দই মাটি করে দিল। নবাব কেবলমাত্র কবিতা পড়তে যাচ্ছিলেন, আর তারপর আমিও কিছু পড়তাম। নবাবের প্রশংসায় মনটি কতই-না খুশি হত। আজই এমন প্রশংসা মিলল যা আমি অনেকদিন ধরে খুঁজে ফিরছি। আর আজই কিনা এই আপদটির সামনে পড়ে গেলাম। মনে মনে কামনা করেছিলাম খোদা এই মুখপোড়াকে এখান থেকে সরিয়ে নাও। লোকটির দিকে তাকাতেই রক্তরাঙা চোখ দেখে

আমার দিলবর খাঁর কথা মনে পড়ে গেল। ভয়ে আমার প্রাণ উড়ে গেল। বার বার মনে হচ্ছিল, লোকটির কোমরে ঝোলানো ছোরাটি আমার হৃদ্‌পিণ্ডে এখনি বসিয়ে দেবে কিংবা আরো ভয়ানক কথা, নবাব সাহেবের কোনো বিপদ ঘটাবে। মনে মনে গালি পাড়ছিলাম, খোদা মারুক, শয়তানটি এল কোথা থেকে।

আর কোনো উপায় না দেখে হুসেনি পিসিকে ডাকলাম। উনি এসে ঘটনাটি দেখে সব বুঝে গেলেন। হুসেনি পিসির কথায় বুঝলাম যে উনি লোকটিকে অল্পস্বল্প জানতেন।

হুসেনি পিসি : খান সাহেব, আপনার সাথে আমার কিছু দরকার আছে। এদিকে একটু আসুন।

খান সাহেব : যা কিছু বলার আছে ওখান থেকেই বল। আমি কোনো জায়গায় বসে গেলে আর উঠিনে।

হুসেনি পিসি : তো, এ অত্যাচার হলো!

খান সাহেব : এতে অত্যাচার কি করা হলো? বেশ্যার বাড়ি....কারো একার জমা করা নেই। আর অত্যাচার যদি বল, তাই। আমি তো ওঠার লোক নই। দেখি তো, কে আমাকে ওঠায়!

হুসেনি পিসি : একার জমাই-বা নেই কেন। যে খরচ দেয় বেশ্যাটি তো তখন তারই। অন্যের সে-সময় অধিকার নেই।

খান সাহেব : তো আমি খরচ দিতে তৈরি।

হুসেনি পিসি : এসময়ে ওর কোনো সুযোগ নেই। আপনি অন্য সময় আসবেন।

খান সাহেব : মেয়েলোক কিছু অর্বাচীন হয়। বলেইছি তো আমি উঠছিনে।

আমি দেখলাম নবাব সাহেবের চেহারা রাগে লাল হয়ে উঠেছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত চুপচাপ বসে আছেন। মুখে কিছুই বলছেন না।

হুসেনি পিসি : বেটি, আচ্ছা, তুই এদিকে চলে আয়। নবাব সাহেব, এখন আপনার বিশ্রামের সময়। প্রাসাদে ফিরে যান।

আমি ওঠার চেষ্টা করতেই হতভাগাটা জোর করে আমার হাত ধরে ফেলল। তখন আমি কি করি!

নবাব : খান সাহেব, মেয়েটির হাত ছেড়ে দিন, তাতে ভালো হবে। আপনি তো অনেক বাড়াবাড়ি করলেন। আমি চুপচাপ বসে আছি শুধুমাত্র এই কারণেই যে বেশ্যালয়ে কোনো ঝামেলা করা ভালো না। কিন্তু এখন ...

খান সাহেব : কিন্তু তুমি এখন কি করতে পার। দেখ তো কোনো....মেয়ে লোকটির হাত ছাড়িয়ে নিতে পারে।

আমি : (জোর করে হাত ঝট্‌কে নিয়ে) আচ্ছা, হাতটি তো ছেড়ে দিন। আমি কোথাও যাচ্ছিনে। (ঘটনাটি হলো এই যে, নবাব সাহেবকে ছেড়ে আমি কোথাও যাব না)।

খান সাহেব হাত ছেড়ে দিলেন।

নবাব : আমি বলছি, মুখ সামলে কথা বলবেন। মনে হয়, ভদ্দরলোকের সংসর্গ আপনি করেন না।

খান সাহেব : কিন্তু তুমি তো ভদ্দর সংসর্গ করেছ। যা করতে পার, করে ফেল।

নবাব : এতে তো বোঝা যাচ্ছে, আপনি লড়াই করার জন্য উস্‌খুস্ করছেন। কিন্তু বেশ্যাবাড়ি তো আর কিছু আখড়া নয়, ময়দানও নয়। সবচেয়ে ভালো হয়, অন্য আর কোনো সময়ের জন্য এটি মুলতুবি রাখুন। আর এখান থেকে চলে যান। নইলে....

খান সাহেব : নইলে তুমি আমাকে গুলে খাবে। চলে যান, এক কথা। তুমিই চলে যাও না।

নবাব : খান সাহেব, ইমানের দোহাই, আমি নিজের মান-সম্ভ্রমের কথা ভেবেই এত আস্কারা আপনাকে দিয়েছি। আর ভেবেছি, মা-বাবা, মান-সম্ভ্রম, বন্ধু-বান্ধব — যারাই শুনবে তারাই কী মনে করবে। নচেৎ আমি আপনার এত বেয়াদবির মজা দেখিয়ে দিতাম। আমি আপনাকে আবার বলছি নিষ্ফল হুজ্জতি না করে আপনি এখান থেকে চলে যান।

খান সাহেব : বেশ্যাবাড়ি এসেছ, আবার নিজের মান-প্রাণের ভয় করছ। কী বেয়াদবি করেছি, আমি তোমার বাবার চাকর নাকি ? তুমি তোমার নিজের বাড়ি গিয়ে বড়লোকি ফলাও গিয়ে। বেশ্যাবাড়িতে তুমিও বসে আছ আমিও বসে আছি। আমার ইচ্ছে হলেই উঠে যাব। মিছেমিছি হুজ্জত করছ। কাউকে উঠিয়ে দিতে দেখিনি।

নবাব : উঠিয়ে দেয়াটা কোনো মুশকিল না। চাকরদের আওয়াজ দিলেই আপনার ঘাড়ে হাত দিয়ে বের করে দেবে।

খান সাহেব : চাকর-বাকরের বলের ওপর বেশি বাড়াবাড়ি করো না। এই ছোরা দেখেছ তো।

নবাব : অনেক দেখেছি এরকম ছোরা। সময়মত যে ছোরা কাজে লাগে, সেটিই ছোরা। আপনার ছোরাটি খাপ থেকে বেরতে থাকবে, এদিকে গর্দান আপনার মাপা হয়ে যাবে।

খান সাহেব : সেটা দেখা যাবে। নাও, এবার বাড়ি চলে যাও। তোমার মা ভাববে আবার।

আমি দেখছিলাম নবাবের চেহারা ভয়ংকর হয়ে উঠছে। রাগে থরথর কাঁপছেন। পাজিটা অভদ্র ভাষায় কথা বলছে, কিন্তু উনি 'আপনি' করে কথা বলছিলেন নিজের শিক্ষাদীক্ষায়। তাই আমার প্রথমে মনে হয়েছিল নবাব বুঝি বা ভয় পেয়েছেন, কিন্তু আমার এ-ভয়টা ছিল মিথ্যে। নবাব কেবল নিজের মান-সম্ভ্রমের কথাই ভাবছিলেন। এরই জন্য ওকে প্রশ্রয় দিচ্ছিলেন। উনি চাচ্ছিলেন,

ব্যাপারটা অল্পে অল্পে মিটে যাক। কিন্তু এই পাজিটার কদর্য গালিগালাজ বেড়েই চলছিল। নবাব যতই প্রশ্রয় দিচ্ছিলেন, লোকটি ততই ব্যাঘ্রবিক্রম দেখাচ্ছিল।

শেষ অবধি নবাব বললেন—

বেশ, উঠুন খান সাহেব। আপনি আমি আমরা দুজনেই চলে যাই। আয়েশ-বাগে গিয়ে আমরা দুজনে একহাত লড়ে যাই।

খান সাহেব: (ককিয়ে হেসে) সাহেবজাদা, তোমার কচি মুখ এখনো চুমু খাওয়ার মতো। আর মরদের সাথে চাইছ লড়তে। কোনো চোট খেয়ে যাবে, আর তোমার মা কাঁদতে থাকবেন।

নবাব: শয়তান, তোর কদর্য ভাষা সীমা ছাড়িয়ে গেছে। দেখ, তোর বেয়াদবির জন্য তোকে সাজা দেব।

বলতে না বলতেই নবাব তাঁর গায়ের চাদরের মধ্যে লুকোনো পিস্তলটি বের করেই ছুঁড়লেন। খান সাহেব ধপ্ করে পড়ে গেল, আমি পাথর হয়ে গেলাম। মেঝের গালিচায় রক্তগঙ্গা। হুসেনি পিস যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন—দাঁড়িয়ে রইলেন। পিস্তলের আওয়াজ শুনে খানুম সাহেবা, মির্জা সাহেব, মির সাহেব, খুরশিদ, আমিরজান, বিসমিল্লাজান, নোকর-চাকর অন্যান্যরা সব দৌড়ে এল। আমার কামরায় ভিড় জমে গেল। প্রত্যেকেই একসাথে কথা বলা শুরু করল। এমনি সময়ে শমসির খান (নবাবের একজন মাঝবয়সী ভৃত্য) ঝট করে নবাবের হাত থেকে পিস্তলটি নিলে আর বললে, হুজুর এবার বাড়ি ফিরে যান। আমি এদিকটা সামলে নেব।

নবাব: আমি যাব না, যা হবার হয়েছে। আর যা হবার হবে, হয়ে যাবে।

শমসিরখান: (কোমরবন্ধ থেকে ছোরা বের করে) ইমাম আলির দোহাই নবাবজাদা যদি এখান থেকে চলে না যান ছোরাটি আমার বুকে বসিয়ে দেব। এখানে আপনার থাকাটা উচিত হবে না।

এরই মধ্যে লোকে দেখে নিয়েছে গুলিটি খান সাহেবের কোথায় লেগেছে। মনে হল প্রাণের ভয় নেই—গুলিটি বাহুতে বিঁধেছে।

শমসির খান: আমি প্রার্থনা করছি হুজুর, এখান থেকে চলে যান। বদমাশটির লক্ষ্যটাই-বা কি। আপনি কেন বদনাম নেবেন।

এবার নবাব সাহেব ব্যাপারটি অনুধাবন করে উঠে পড়লেন। আমাদের এখানকার একটি লোককে সাথে করে নবাব সাহেব বাড়ি চলে গেলেন। খানুম এই সময়ে মির্জা আলিরেজা বেগকে ডেকে পাঠালেন। তিনি এই সময়ে চক এলাকাতেই ছিলেন। শিগগির এসে পড়লেন। খানুম তাঁকে একান্তে ডেকে নিয়ে গিয়ে না জানি কানে কানে ফুস-ফুস করে কি বললেন। তারপর ফিরে এসে বললেন, পাজিটাকে পাশের গলিটায় ফেলে দাও। পরে যা হয় করা যাবে।

সে যাহোক, খান সাহেবকে গলিতে ফেলা হলো না। তার বাহুতে পট্টি বেঁধে

দেয়া হলো, আর একখানি পালকি আনতে পাঠানো হলো। এর মধ্যে খান সাহেবের জ্ঞান ফিরে এলে তাকে জিজ্ঞেস করে তার মুরগিহাটার ঘরের ঠিকানা জেনে নিলাম। ডুলিতে বসিয়ে তাকে তার ঘরে পাঠিয়ে দিলাম। কাহারদের বলে দিলাম তারা যেন ওর বাড়ির কাছাকাছি গিয়ে ওকে রেখে আসে। আর সেই রকমই হলো।

সুলতান সাহেব কয়েকদিন আর এলেন না। না এল তাঁর কোনো লোক। নবাব সাহেবের সাথে আমার ভালবাসার মতো একটা সম্পর্ক হয়ে গিয়েছিল। বিশ্বাস ছিল নবাব সাহেব এখন আসবেন না। তিনি কথার মর্যাদা দেন। যখন প্রথম তিনি আসেন তখনই তিনি কড়ার করিয়ে নিয়েছিলেন যে, তিনি যখন কামরায় থাকবেন তখন অন্য আর কেউ সেখানে থাকবে না। হুসেনি পিসি অঙ্গীকার করেছিলেন যে, সে-সময়ে আর কেউ থাকবে না। কিন্তু তার একটু ভুল হয়েছিল। দরজায় কোনো পাহারা বসাননি। খোদা মালুম, খান সাহেব কোথা থেকে এসে জুটল। গোটা খেলাটাই মাটি হয়ে গেল। আকস্মিকভাবে চার-পাঁচ দিনের মধ্যেই বিয়ের আসরে আমার একটি মুজরো জুটে গেল। সুলতান সাহেবও সেখানে গিয়েছিলেন। আমার প্রথম মুজরো শুরু হলো রাত নটায়। আসরে কথা বলি কি করে। ইশারায় কথা বলারও সুযোগ ছিল না। ন'বছরের ফর্সা মতো একটি ছেলে দামী পোশাক পরে সাহেবের পাশে বসেছিল। কোনো এক ফাঁকে সে উঠে পড়ল। তখন আমার মুজরো শেষ হয়ে গিয়েছিল। পাশের ঘরে পোশাক বদলাচ্ছিলাম। আমি ওকে ইশারায় ডাকলাম। তাকে পাশে বসিয়ে একটা পান তৈরি করে খেতে দিলাম। বললাম—সুলতান সাহেবকে চেনো কি?

ছেলেটি: কোন্ সুলতান সাহেব?

আমি: উনি, যিনি বরের সামনাসামনি তোমার পাশে বসেছিলেন।

ছেলেটি: (ভুরু কুঁচকে) উনি আমার বড় ভাই। ওঁকে শুধু সুলতান সাহেব বলবেন না।

আমি: বেশ, আমি কিছু দেব, সেটি ওকে দেবে কি?

ছেলেটি: আমার উপর চটে না যান।

আমি: না, চটবেন না।

ছেলেটি: আর দেবেনই-বা কি, পান?

আমি: না, পান না। পান তো ওঁর নিজেরই ডিবেয় রয়েছে। এই নাও, কাগজখানি ওঁকে দাও।

মেঝেয় ফরাসের ওপর এক টুকরো কাগজ পড়েছিল। সেটি কুড়িয়ে নিয়ে তার উপর কয়লা দিয়ে এই কবিতাটি লিখলাম—

বহুদিন মেলেনি আর তোমার তিরস্কার
সভার মাঝে উস্কে দিই তাই বিরক্তি তোমার।

আর তাকে বললাম, এই কাগজখানি ওঁর নজর এড়িয়ে সামনে রেখে দিতে, যেন উনি বুঝতে না পারেন। ছেলেটি তেমনটিই করলে। আমার কামরায় পর্দার আড়াল থেকে উঁকি মেরে দেখছিলাম। সুলতান সাহেব কাগজখানি তুলে পড়তেই প্রথমে তাঁর চেহারার উপর চিন্তার ছায়া দেখা দিল। তারপর মনোযোগ দিয়ে চিরকুটখানি কিছু সময় দেখে পকেটে তুলে রাখলেন।

শমসির খাঁকে ইশারায় ডেকে তার কানে কানে কী বললেন। ঘণ্টাখানেক বাদে শমসির খাঁ আমার কামরায় এল।

শমসির খাঁ: নবাব সাহেব বললেন এই চিরকুটের জবাব তিনি বাড়িতে গিয়ে লিখে পাঠিয়ে দেবেন।

দ্বিতীয় মুজরোটি হলো সকালে। এসময়ে সুলতান সাহেব সভায় ছিলেন না। তিনি বিনা সভাটি ফাঁকা ঠেকছিল। গানে মন বসছিল না। যেনতেন প্রকারেণ মুজরোটি শেষ হলো। আমি ঘরে ফিরে এলাম। সেদিন সারাটি দিন ধরে আমি শমসির খাঁর আশায় রইলাম। শেষে সন্ধ্যের বাতি জ্বলার পর সে হাজির হলো।

নবাবের ছোট্ট চিঠিটি দিল, তাতে লেখা—আমার মনে যে অগ্নিশিখাটি স্তিমিত হয়েছিল তোমার কবিতাটি সেটিকে আবার খুঁচিয়ে দীপ্ত করে তুলেছে। তোমাকে সত্যি আমি ভালবাসি। কিন্তু অবস্থাই আমাকে নিরুপায় করে দিয়েছে। তোমার ওখানে আমার আর কখনই যাওয়া হবে না। আমার এক নির্ঝঞ্ঝাট বন্ধু নওয়াজগঞ্জে থাকেন। কাল আমি তোমাকে সেখানে আনিয়ে নেব। অবসর থাকলে চলে আসবে। আমাদের মিলনের এটিই একমাত্র উপায় তাও রাত ন'টা দশটায়—

রাতে স্বপ্ন মিলনের খেদ কেন তোর
এখানে যায় না দেখা একটি নজর।

সুলতান সাহেব সেদিন থেকে একটি দিনের তরেও খানুমের বাড়িতে যাননি। সপ্তাহে দু-তিনবার নওয়াজগঞ্জে বন্ধুর বাড়িতে ডেকে পাঠাতেন। কি অপূর্ব সুন্দর সে সংসর্গ! কখনো চর্চা হত কবিতার আবার কখনো-বা গৃহস্বামী নিজেই তবলা সংগত করতেন আর আমি গাইতাম। সুলতান সাহেবের অবিশ্যি তাল-মান-লয় সম্বন্ধে ততটা জ্ঞান ছিল না, তবু স্বরচিত গজল গাইতে পারতেন।

কখনো আমার আর
কখনো-বা তাঁর
সপ্রেম কটাক্ষ খেলা
বেড়ে যায়

এমনি ধারায়।

এই জলসাটির কথা স্মরণে এলে যেন দৃশ্যগুলি চোখের ওপর দিয়ে ভেসে যায়।

গরম কাল। চাঁদনী রাত। বাগানের উঠোনে তক্তাপোশের ওপর জ্যোৎস্নার মতো ফুটফুটে সাদা চাদর বিছানো। ঠেক দেবার জন্য তাকিয়া। আরাম ও বিলাস-সামগ্রী সব মজুদ। বাগানে থরে থরে ফুল ফুটে রয়েছে। বেল চামেলির গন্ধে মন মাতোয়ারা। সুগন্ধি পান ও হুঁকোর ছিলিমের গন্ধে বাতাস ভরপুর। একান্ত ঘরোয়া মজলিশ হওয়ায় নিজেদের মধ্যে রঙ্গ-তামাশা চলছিল প্রচুর। এরকম একটি আড্ডায় বসলে লোকে দুনিয়া তো দূরের কথা ভগবানকে পর্যন্ত ভুলে যায়। আর সে-পাপের শাস্তিতে বোধহয় এধরনের জলসা তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যায়। জীবনে শেষ নিশ্বাস অবধি এমনকি মরণের পরও আফসোস রয়ে যায়।

নিষিদ্ধ সে ভালবাসা
অহো কি অপূর্ব স্বাদ তার
জিজ্ঞেস করো না আর
স্বর্গেও ভুলে যেতে এ আপদ
মনটি নাচার।

আসল কথাটি এই যে আমার ওপর সুলতান সাহেবের আর তাঁর ওপর আমার ছিল গভীর ভালবাসা। দুজনের সাধ-আহ্লাদ ছিল এমন ধরনের যে সারাজীবন-ভোর যদি আমরা দুজনে সাথী থাকতাম তবুও তাতে কোনো গ্লানি বা মলিনতা আসত না। সুলতান সাহেবের ছিল কাব্যের শখ, আমার ছেলেবেলা থেকেই ছিল তার ওপর ভারি টান। সুলতান সাহেবের মনের সাথে আমার মনের যেরকম মিল ছিল তেমনটি আর কারো বেলায় হয়নি। আমার বিশ্বাস উনিও আমাকে ঠিক এমনি করেই ভালবাসতেন। কথায় কথায় উনি পড়তেন কবিতা, আর আমি দিতাম জবাব। ভাগ্য বিচ্ছেদটি ছুঁড়ে দিয়ে জলসাটি খুব দ্রুত শেষ করে দিল।

দেখো বিচ্ছেদ কত চাঁদও তারায়
মন বলে কত না মিলনরাত ভেঙে গেল, হায়।

রুশোয়া: বেশ, সবই তো হলো। আপনার শুভ পদার্পণে এরকম কত যে জলসা মাটি হয়েছে, বোধহয়।

উমরাও: আঃ মির্জা সাহেব, তো আমার উপস্থিতিটি কি এতই অশুভ! এতো আপনি বললেন বেশ!

রুশোয়া: তা অবিশ্যি আমি বলতে পারিনে। কিন্তু শাস্তিতে যেখানেই আপনার পদার্পণ ঘটেছে সে-জমায়েতটি ভেসে গেছে।

উমরাও: আপনার যা খুশি বলুন। কিন্তু এমনটি বলবেন জানলে আমি কখনোই আমার জীবনবৃত্তান্ত আপনাকে বলতাম না। যাকৃগে. দোষ আমারই।

রুশোয়া: দোষ! সারা জীবনে আপনি এই একটি কাজ করেছেন, এতেই

দুনিয়ায় আপনার নাম থেকে যাবে। তা সে সুনাম কি দুর্নাম তা আমি বলতে চাইনে, এখানেই কথাটিকে থাকতে দিন। এখন এই গজলটির দু-তিনটে পঙ্‌ক্তি মনে থাকলে একটু পড়ে দিন।

উমরাও : আপনি লোককে তো বেশ তোষামোদ করতে পারেন!

রুশোয়া : যাহোক, চটবেন না। আচ্ছা, এখন কবিতা পড়ুন।

উমরাও : আচ্ছা, শুনুন। প্রথম লাইনটি আর দুটো স্তবক মনে আছে—

সাথীহীনা নিশি মনোবেদনার স্বাদ করুণা হয়ে গেল ক্রমে।
দীর্ঘবিরহে ছিল যত ব্যাকুলতা গিয়েছে তাহারা কমে।
বসে আমি শোকাহতা কেশলতা বেবশ বেঠিক
সভার সকলে তাই সমব্যথী হয়ে দুঃখের শরিক।
সভাজন অংশ নেয় অকল্যাণ বিরহ গাথায়
সঙ্গস্বাদ ভালো করে না পেতেই, হায়।

৭

এই সময়ে নবাব জাফরআলি খান সাহেবের কাছে আমি ছিলাম বাঁধা। বয়স তাঁর বোধকরি সত্তর বছরের কাছাকাছি ছিল। গালে একটি দাঁতও অবশিষ্ট ছিল না। কুঁজো হয়ে গিয়েছিলেন। এক গাছি চুলও কালো ছিল না। কিন্তু তখনো নিজেকে ভালবাসার যোগ্য মনে করতেন। আর আমি জীবনভোর ভুলব না তাঁর চমৎকার লম্বা কোট, সিল্কের পায়জামা, লাল কোমরবন্ধ, জরির কাজ-করা টুপি, কোঁকড়ানো বড় চুল।

হয়ত বলবেন, এই বয়সে আর এই রকম অবস্থায় বাঈজি রাখার কী দরকার ছিল? মির্জা সাহেব, একালের এটিই ছিল ফাশন। সম্ভ্রান্ত ও বিত্তবান এমন কেউ ছিলেন না যার বাঈজি ছিল না। নবাব সাহেবেরও ঐশ্বর্য ও আড়ম্বরের মধ্যে, আর দরবারে তাঁর শুভ কামনার জন্য সভাসদদের মধ্যে একজন বাঈজিরও স্থান ছিল। আমার মাসমাইনে ছিল পঁচাত্তর টাকা। রোজ দুঘণ্টার জন্য তাঁকে সঙ্গ দিয়ে চলে আসতাম। আর অসুবিধের কথা শুনুন, নটার পর নবাবের সাধ্য কি যে তিনি দরবারে থাকেন, আর যদি কোনোদিন হঠাৎ দেরি হয়ে যেত, তাঁর ধাত্রী এসে তাঁকে জোর করে উঠিয়ে নিয়ে যেত। নবাব সাহেবের মা ছিলেন জীবিতা। উনি তাঁকে ভীষণ ভয় করতেন – যেমনটি করে একটি পাঁচ বছরের ছেলে। তাঁর স্ত্রীকেও তিনি খুব ভালবাসতেন। অল্প বয়সে তাঁদের বিয়ে হয়, কিন্তু মহরমের মাসের শোকের দশ দিন আর রমজান মাসের উপবাসের তিন দিন ছাড়া স্বামী-স্ত্রীতে পৃথকভাবে শুতেন না।

আপনি হয়ত হাসবেন। কিন্তু আমি অন্তর থেকে বলতে পারি, তিনি নিশ্চিতই ভালবাসতে পারতেন। এই বৃদ্ধ বয়সেও যখন তিনি শোকগাথা পড়তেন মনটি লুটিয়ে পড়ত।

সংগীতশাস্ত্রে তাঁর ছিল পারদর্শিতা। অন্যে তাঁর সামনে এর চেয়ে ভালো গায় তার সাধ্য কি। বড় বড় ওস্তাদেরও খুঁত ধরতেন, আর শোকগাথা গাইতে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। মিরআলি সাহেবের শোকগাথা সংকলন ছিল ওঁর কাছে। ওঁর কাছে কাজ করে আমি প্রচুর শোকগাথা গাইতে শিখলাম, আর তাতে আমার নাম ছড়িয়ে পড়ল চারিদিকে।

শহরের আর সব বাঈজিদের চেয়ে খানুমের তাজিয়াটির ছিল সবচেয়ে বেশি জৌলুস। ইমামবাড়ায় ছিল পতাকা ঝাড়লণ্ঠন, মূল্যবান আর প্রাণবন্ত।

মহরম মাসের দশ দিন পর্যন্ত সভা হত। আমার শোকসংগীত সবচেয়ে ভালো ছিল, তেমনটি আর কে গাইতে পারত! বড় বড় শোকসংগীত গাইয়েরাও আমার সামনে মুখ খুলতে পারত না। এই শোকগাথার দৌলতে স্থানীয় রানীর মহলেও ছিল আমার যাতায়াত। রাজা আমার শোকগাথার খুব প্রশংসা করতেন। আর প্রতি মহরমেই আমাকে অনেক জিনিস উপহার দিতেন। শোকগাথায় আমার ছিল দক্ষতা। রাতে ইমামবাড়ায় সকলকে দুঃখে ভাসিয়ে আমাকে ঐশ্বর্যের দরজায় হাজির হতে হত। কোনো-কোনোদিন রাত দুটোর আগে ফিরতে পারতাম না।

যে-সময়ে বিসমিল্লাজানের নর্তকীদের মধ্যে প্রচলিত রীতির বিয়ে হয় সে-সময়ে ছব্বন সাহেবের কাকা পবিত্র কারবালায় হজ করতে গিয়েছিলেন। বিসমিল্লার এই বিয়ের মাস ছয়েক পরে উনি কারবালা থেকে ফিরে এলেন। ওঁর মেয়ের ছব্বন সাহেবের সাথে বিয়ে হওয়া স্থির হয়ে গিয়েছিল। উনি ফিরে এসেই বিয়ের তাগিদ দিতে লাগলেন। নবাব সাহেব বিসমিল্লাজানের জন্য পাগল। এদিকে বিসমিল্লাজান তাঁর উপপত্নী থাকতে চেয়ে তাঁর ওপর প্রভাব ফেলেছিল। উনি বিয়ে করতে অস্বীকার করলেন, কিন্তু সেকালে নবাবের মেয়ের সাথে কারো বিয়ে হওয়ার কথা একবার চালু হওয়ার পর সে-বিয়ে না হলে মেয়ের বদনাম কে সহ্য করবে। একদিন রাতে নবাব ছব্বন সাহেবের বাড়িতে ছিল জলসা। সেদিন বিসমিল্লার সাথে আমিও গিয়েছিলাম সেখানে। সামনে বসে গাইছিলাম। নবাব সাহেব তানপুরা আর তাঁর বিশেষ প্রিয়পাত্রদের একজন তবলা বাজাচ্ছিলেন। এরই মধ্যে একজন সংবাদবাহক এসে জানাল বড় নবাব সাহেব (নবাবের কাকা) উপস্থিত হয়েছেন। নবাব সাহেব ভাবলেন যে, উনি এসেছেন তো অন্দরমহলে বেগমসাহেবার (নবাবের মা) ওখানে চলে যাবেন। আমাদের সবারই এই ধারণা ছিল। কিন্তু উনি চলে এলেন দেওয়ানখানার দরজায়। জলসা হচ্ছে দেখে রেগে আগুন হয়ে গেলেন।

যাহোক, উনি আসার সাথে সাথেই গান তো বন্ধ হয়ে গেল, নবাব সাহেব উঠে দাঁড়ালেন।

বড় নবাব : জ্যেষ্ঠের সম্মান দেখানোর রীতি-অনুষ্ঠানের কোনো দরকার নেই। আমার একটি বিশেষ কথা আছে, তাই তোমার আরামে ব্যাঘাত ঘটাতে হচ্ছে।

নবাব : আদেশ করুন—

বড় নবাব : তুমি ছেলেমানুষ ছিলে, তাই তোমার জানা নেই যে আমার ভাই তোমার বাবা আহমদ আলি খাঁ মা মারা যাওয়ার আগেই মারা যান। তাই যে-সম্পত্তির ওপর তুমি আছ, আর যা ভোগদখল করছ, তাতে তোমার কোনো আইনানুগ অধিকার নেই, অবশ্যই মা তোমাকে লালনপালন করেছেন আর মরার সময় একটা উইলও করে দিয়ে গেছেন। কিন্তু সেটা কিছুই না। কেবলমাত্র

সামান্য কিছু ছাড়া তুমি সে-উইলে আর কিছুই পাবে না। লোকের কথা শুনে মনে হচ্ছে, যা তোমার প্রাপ্য তার চেয়ে বেশি তুমি খরচ করে ফেলেছ, যা-হোক, তাতে আমি আর কিছু গরীব হয়ে যাব না, আর তার চেয়ে বড় কথা সেটি নিয়ে আমি কোনো খোঁজ-খবরও করতে চাইনে এজন্য যে তোমার আমার রক্ত-মাংস একই (এর পরে বড় নবাবের চোখ কিছুক্ষণের জন্য অশ্রুসজল হয়ে উঠল। তারপর সেটি সংবরণ করে) এ-সম্পত্তিতে তোমারই আজীবন অধিকার থাকত, আর আমার যা-কিছু সম্পত্তি আছে তাতে আমার চলে যায় আর আমার মৃত্যুর পর সেসব তোমারই হত। কিন্তু তোমার কুপথ গমনে আমি নিরুপায় হয়ে তোমাকে এই সম্পত্তি ভোগদখল থেকে বঞ্চিত করব। আমাদের মহান পূর্বপুরুষদের সৎভাবে অর্জিত সম্পত্তি অসৎ কাজে উড়িয়ে দেবার জন্য নয়। আদালতের পেয়াদা আমার সাথে আছেন। এখন এখানকার সব জিনিস তালিকাভুক্ত করা হবে। তুমি তোমার নর্তকী ও সাঙ্গপাঙ্গদের নিয়ে এখনই এখান থেকে চলে যাও।

নবাব : তো, এই সম্পত্তিতে আমার কোনো অধিকারই নেই?

বড় নবাব : জি, না।

নবাব : কিছু অংশ তো পাব!

বড় নবাব : সে তো তুমি নিয়েই ফেলেছ। আর যদি তোমার কিছু দাবি থাকে তো আদালতের দরজায় যাও। আমার কাছে তোমার কানাকড়িও নেই।

নবাব : বেশ, মাকে আমার সাথে নিয়ে যাব।

বড় নবাব : তিনি তোমাকে ত্যাগ করেছেন। তিনি আমার সাথে কারবালায় যাবেন।

নবাব : আচ্ছা, তো আমি কোথায় যাব?

বড় নবাব : আমি তার কি জানি। এটি তুমি জিজ্ঞেস করতে পার তোমার মোসাহেব, রাখান বাঈজি আর সাঙ্গপাঙ্গদের।

নবাব : তা বেশ, আমার কাপড়-চোপড় জিনিসপত্তরগুলি দিয়ে দিন।

বড় নবাব : এই বাড়িতে তোমার কোনো জিনিসপত্তর নেই, না আছে তোমার ব্যক্তিগতভাবে বানানো কোনো কাপড়-চোপড়।

এরপর আদালতের পেয়াদারা দেওয়ানখানায় চলে এলেন। এরা নবাবকে তাঁর মোসাহেব ও প্রমোদবন্ধুদের সাথে বের করে দিলেন। আমরা ঘর থেকে বেরিয়েই পাল্কি ভাড়া করে চকের রাস্তা ধরলাম। জানি না, নবাব আর তাঁর মোসাহেবরা কোথায় গেলেন। শুনেছিলাম মোসাহেবরা একে একে রাস্তা থেকেই বিদায় নিয়ে কেটে পড়েছিলেন। নবাব সাহেব রাস্তায় দেখা পেয়ে যান মখদুম বখ্স-এর। বখ্স ছিল নবাবের বাবার একজন পুরাতন ভৃত্য। নবাব একে বাহুল্য মনে করে কাজ থেকে ছাঁটাই করে দিয়েছিলেন। এই লোকটি নবাবকে

নির্বান্ধব দেখে দয়াপরবশ হয়ে নিজের বাড়িতে নিয়ে আসেন।

নবাব সাহেবের বাড়ি থেকে আসার পর সন্ধ্যেয় বিসমিল্লার ঘরে জলসা হয়। এখানে আজ খোলাখুলিভাবে বড়ই ঠাট-ঠমকের সাথে বসেছিলেন হুসনু মিঞা। ইনি ছিলেন নবাব সাহেবের প্রধান কর্মকর্তা, মোসাহেব, বন্ধু, নিবেদিত প্রাণভক্ত। যেখানেই নবাবের ঘাম পড়ত সেখানেই উনি নিজের রক্ত ঢালার জন্য হাজির হতেন। এখানে যে তিনি আজই এলেন তা নয়, আগেও এসেছেন তবে সেটা চুপি চুপি। এসময়ে তিনি একা লাশরিক। বাধা দেবার ও অন্য কারো অধীনে না থেকে একেবারে স্বাধীনভাবে বসে কাজের কথাবার্তা বলছিলেন।

হুসনু : দেখ বিসমিল্লাজান, নবাবের আশা আর করো না। আমি যা বলব তাই দেব। আমি গরিব লোক, বেশি কিছু সম্পদ তো নেই। আর নবাব সাহেব যা দিতেন তার অর্ধেক দেয়াও সম্ভব নয় আমার পক্ষে। তবে হ্যাঁ, কোনো-না-কোনো রকমে তোমাকে খুশি রাখব।

বিসমিল্লা : গরিব হন আর না-ই হন, নবাবের ধনদৌলত হাতিয়ে নিয়ে নিজের ঘর ভরে নিয়েছেন, আবার আমার কাছে গরিবীর কথা জানাচ্ছেন। এরকম গরিবকে তাও-এর ওপর গলালে ন' মণ চর্বি বেরবে।

হুসনু : হায়, হায়। তুমি এমনটি বলো না। আর নবাবের কাছে ছিলই-বা কি যে আমি ঘর ভরে নেব। আমার মায়ের ধনদৌলত কি কিছু কম ছিল ?

বিসমিল্লা : আপনার মা কি ফরখন্দহ, পিসি কি বেগম সরফরাজ খাঁ মহলের খাস চাকরানী ছিলেন না ?

মির হুসনু : (অপ্রস্তুত হয়ে) সে যা হোক, মরার আগে আমাকে তো চার হাজার টাকা দিয়ে গেছেন।

বিসমিল্লা : আপনার বিবি তার প্রেমিকের সাথে সে-টাকা নিয়ে তো ভেগেছে। আপনার আর কি মিলেছে। আর বাগাড়ম্বর করবেন না। আমি আপনার সব ব্যাপার তন্ন তন্ন করে জানি।

হুসনু . তা বাবারও কি কিছু কম ছিল ?

বিসমিল্লা : বাবা তো আপনার নবাব হুসেনআলি খাঁর পাখিমারাদের দলে ছিলেন।

হুসনু : পাখি মারার দলে ?

বিসমিল্লা : আল্লা! আচ্ছা, তবে না হয় মোরগ লড়িয়েদের দলেই হলো।

হুসনু : মোরগ লড়িয়েদের দলে ছিলেন ?

বিসমিল্লা : আচ্ছা, না হয় কোকিলই ধরতেন। ছিলেন তো তিনি পাখিমারার কাজে।

হুসনু : নাও, তুমি তো ঠাট্টা করছ।

বিসমিল্লা : আমি মনের কথা বলে ফেলি, আর সেই জন্যই আমার বেশ

বদনাম। আর বলবই-বা না কেন? আপনার ছেঁচড়ামি দেখে আমার মন খুব খারাপ হয়ে গেল। এমনিতেই আপনি যদি আসতেন তো আমি কড়া কথা বলতাম না। আজ সকালেই নবাবের এই ঘটনাটি ঘটে গেল। আর আজই আপনি আমার মুখোমুখি বসে চাকরির সংবাদ নিয়ে এলেন। আপনার কাণ্ডজ্ঞানের একটু দয়া করবেন। আপনি কি চাকর রাখবেন—এই বড় জোর এক মাস, দু মাস, না হয় তিন মাসই।

হুসনু : ছ মাসের মাইনেটা জমা দেব?

বিসমিল্লা : মুখের কথায়।

হুসনু : এই নাও, (কোমর থেকে চওড়া সোনার বালা বের করে) তোমার মতে এর দাম কত হবে?

বিসমিল্লা : দেখছি (বালা দুটি হুসনুর কাছ থেকে নিয়ে নিজের হাতে পরল) কাল ছনামলের ছেলেকে দেখাব। তবে তৈরি করেছে বেশ। আচ্ছা, আজ আসুন। এ সময়ে ছুটন বাঈজি ডেকে পাঠিয়েছেন, আর থাকতে পারছিনে। কাল এই সময়ে আসবেন।

হুসনু : তা বালা জোড়া খুলে দাও।

বিসমিল্লা : ইয়া আল্লা, চোরের সাথে ব্যবহার করছেন নাকি! আমি আপনার বালা জোড়া খেয়ে ফেলব নাকি! এ সময়ে আমার হাতে পরা সাদামাটা চুড়ি। মাকে লুকিয়ে যাব। ওঁর কাছে বালা চাইতে গেলে জিজ্ঞেস করবেন, কোথায় যাব। এই জন্যই একটু হাতে পরেছি সকালে নিয়ে যাবেন।

হুসনু : বালা জোড়াটি দিয়ে দাও। ওটি আমার নয়, নইলে আর কথা ছিল কি, তোমাকেই দান করতাম।

বিসমিল্লা : তো এটি কি আপনার মায়ের? উনি মারা যাওয়ার পরও কি আপনার জিনিস হয়নি এটি।

হুসনু : এটি আমার নয়। আমি এমনিতেই তোমাকে দেখাতে এনেছিলাম।

বিসমিল্লা : আমি যেন আর চিনতে পারিনি। সেদিন আমার সামনেই নবাব এটি বন্ধক দেবার জন্য দিয়েছিলেন।

হুসনু : নাও, শোন! এটি কবে?

বিসমিল্লা : এটি হলো সেদিন যেদিন বোন উমরাওজানের মুজরোর কথা হয়। বোন উমরাও একশ টাকার কমে কিছুতেই নেবে না বলে জিদ করে। নবাবের কাছে টাকা ছিল না। আমার সামনেই সিন্দুক থেকে বালা জোড়া বের করে ফেলে দিয়েছিলেন (ফের আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে দেখে) বোন উমরাও এটি সেই বালা জোড়া না?

আমি : আমাকে আর কি জিজ্ঞেস করছ? তুমি কি আর মিথ্যে বলবে?

বিসমিল্লা : কচুপোড়া খাও, এ বালা জোড়া আমি এখন তোমাকে দেব না।

নবাবের বালা, তাঁকে আমি জিজ্ঞেস করব, এখন এটি দেব না।

হুসনু : নাও, বেশ বলছ তো। আর আমি যে টাকা দিলাম!

বিসমিল্লা : আপনি আবার কোথা থেকে টাকা আনলেন। ও-ও তো নবাবের ছিল।

হুসনু : সত্যি মহাজনের কাছ থেকে সুদে টাকা এনে দিয়েছিলাম।

বিসমিল্লা : আচ্ছা, তবে মহাজনকে পাঠিয়ে দিন, আমি তাঁকে টাকাটা দেব। আপনি চলুন।

হুসনু : বালা জোড়াটি আমি নিয়ে যাব।

বিসমিল্লা : আমি তো দেব না।

হুসনু : জোর-জবরদস্তি করছ নাকি?

বিসমিল্লা : জি হ্যাঁ, জবরদস্তিই বটে, নিন, এখন চুপটি করে খসে পড়ুন। নইলে····

হুসনু : আচ্ছা, তবে থাক্ গে, কাল দিও।

বিসমিল্লা : কাল দেখা যাবে।

'কাল দেখা যাবে' কথাটি বিসমিল্লা এমন চোখ গরম করে বলল যে হুসনুকে এর পর উঠে চলে যেতেই হলো।

কথাটি এই যে নবাব সাহেবের চাচা ছক্কন সাহেবের চাকরবাকরদের কাছ থেকে জিনিসপত্তরের হিসেব বুঝে নিয়েছিলেন। যাদের কাছে যে জিনিসগুলি ছিল সুদ সমেত পাওনা টাকা ফেরৎ দিয়ে সেগুলি খালাস করেন।

হুসনুর কাছে এই বালা জোড়ার খবর নিতে গেলে সে পরিষ্কার ছলনা করে বলে দেয় যে তার মারফত ওটি বন্ধক দেয়া হয়নি। এই জন্য হুসনু মিঞার রাগের মাত্রাটি ছিল কম।

বিসমিল্লা : (হুসনু চলে যাওয়ার পর আমাকে) দেখলে বোন, লোকটি কি স্বার্থপর!

নবাবের সংসার এই ধরনের বদমাশরাই তছনছ করে দিয়েছে। আমি অনেক দিন ধরেই মুখপোড়ার জন্য সুযোগ খুঁজছিলাম, আজ পেয়েছি। এই বালা আর ফেরত দিয়েছি। আর ও করবেই-বা কি। এ তো চুরির মাল।

আমি : নিশ্চয়ই ওকে দেবে না। দেবার হলে নবাবকেই দাও। তাঁর সুবিধে হবে।

বিসমিল্লা : নবাবকেও দেব না। এর দাম বোন, এগারশ টাকা। মুখপোড়া দুশ টাকায় এটি হাতিয়ে নিয়েছিল। খুব বেশি হলে সওয়া দুশ টাকা দিয়ে দেব। আর বিশ পঁচিশ টাকা সুদ লাগলে তাও দেব।

আমি : ভালো, মহাজন এরকম দেয় কেন?

বিসমিল্লা : মহাজন! ওই লোকটি টাকা দিয়েছিল। আর বড় নবাব জিজ্ঞেস

করলে কেমন ভান করল। আর যদি ও বেশি বাড়াবাড়ি করে, তো বালার চত্বর দেখিয়ে দেব।

এমন সব কথাবার্তা হচ্ছিল, এমনি সময়ে নবাব উপস্থিত হলেন। সঙ্গে কোনো পেয়াদা নেই, একলা। চেহারায় ঔদাসীন্য ছেয়ে রয়েছে। চোখ জলে ভরা। তাঁর আর সেই ঐশ্বর্যের আড়ম্বর নেই। না সেই রবরবা, না সেই অনায়াস ভাব। চুপি চুপি এসে বসে রইলেন।

সত্যি বলতে কি, আমার তো চোখ জলে ভরে এল, কিন্তু আমি নিজেকে সামলে নিলাম। আর বিসমিল্লা? বেশ্যা হলে এই রকমই হয়। উনি আসার সঙ্গে সঙ্গেই বালা জোড়ার কথা পাড়ল।

বিসমিল্লা: নবাব, দেখতো, এ সেই বালা জোড়া কিনা যা তুমি হুসমুকে বন্ধক দেয়ার জন্য দিয়েছিলে।

নবাব: সেই বালা জোড়া, ও ওই ওটায় ঠকিয়েছে। কেননা, আমার হাতে ওটার বন্ধক হয়নি।

বিসমিল্লা: কত টাকায় বন্ধক দেওয়া হয়।

নবাব: একথা তো স্মরণ নেই। মনে হয়, আড়াইশ বা সওয়া দুশ, এই রকমই কিছু-একটা হবে।

বিসমিল্লা: আর সুদ কত ছিল?

নবাব: সুদের হিসাব আজ পর্যন্ত কে আর করেছে। যেটি বন্ধকে চলে গিয়েছিল তা আর খালাস করার সুযোগ হয়নি যে সুদের হিসেব করা হবে।

বিসমিল্লা: আচ্ছা, এ বালা জোড়া আমি নেব?

নবাব: নাও।

বিসমিল্লা: মিঞা হুসমুকে মির্জা সাহেবের কাছে পাঠাব, বল।

নবাব: না। আমার মাথা খাও, এমনটি করো না। ও 'সৈয়দ'।

বিসমিল্লা: সৈয়দ? ওর বাপেরই ঠিক নেই।

নবাব: যাক্, ও তো নিজের মুখেই বলে।

আমি নিজের মনে নবাবের হিম্মতের প্রশংসা করতে থাকলাম, ভারি হিম্মত! কি আর বলব, সম্ভ্রান্ত বংশের লোক না?

বিসমিল্লাজান কি হৃদয়হীন দেখুন। ঐ ছোট্টনজানের বাড়ি যাওয়ার বাহানা তুলে নবাব সাহেবকে সকাল থেকেই বিদেয় করে দিল। খোদা জানেন কার মাধ্যমে এই বায়না হয়েছিল। এই ঘটনার দুই তিন দিন বাদের খবর হলো আমি খানুমের পাশে বসেছিলাম, এমনি সময়ে এক বুড়ি এলেন। খানুম সাহেবাকে ঝুঁকে ঝুঁকে সালাম করলেন। খানুম তাঁকে বসতে ইশারা করলেন। উনি সামনে বসে গেলেন।

খানুম: কোত্থেকে আসছ?

বুড়ি : কোথেকে আসছি কি আর বলব। কাছে-পিঠে কেউ নেই তো ?

খানুম : তুমি আমি আর এই ছুকরী ছাড়া আর কে এখানে ? ওর কথা বোঝার শক্তি নেই। বল।

বুড়ি : আমাকে বেগম ফখরুন্নিসা পাঠিয়েছেন।

খানুম : কে ফখরুন্নিসা বেগম সাহেবা ?

বুড়ি : এ তো তুমি জান না। নবাব ছব্বন সাহেবের

খানুম : বুঝেছি, বল।

বুড়ি : বেগম সাহেবা আমাকে পাঠিয়েছেন। আপনি না বিসমিল্লাজানের মা ?

খানুম : হ্যাঁ, কথা বল।

বুড়ি : বেগম সাহেবা বলেছেন, 'ছব্বন সাহেব আমার একমাত্র ছেলে। আমি ওকে খুব ভালবাসি। আর ওর বাবাও ওকে খুব ভালবাসতেন। আমি ওকে খেলনার মতো যত্নে পালন করেছি। আর ওর চাচাও ওর শত্রু নন। নিজের ছেলেরও বেশি ওকে মনে করতেন। তাঁরও একটি মাত্র মেয়ে ছব্বনের বাগদত্তা। মেয়েটির বদনাম হচ্ছে। ছব্বন তাকে বিয়ে করতে অস্বীকার করছে'। এজন্য চাচার খুব খারাপ লেগেছে। চাচা ভাতিজাকে শিক্ষা দিচ্ছেন একটু, এইজন্য বেগম কিছু বলেননি। তোমার মেয়ে সারা জীবন আমাদের ঘরের জন্য নিযুক্তা বলে ধরতে পারে। ছেলে যা দিচ্ছিল, আমার কাছ থেকে বেশি নিয়ো। কিন্তু আমার এই উপকারটুকু কর যেন সে বিয়েতে রাজি হয়। বিয়ের পর সব সম্পত্তি ওরই হবে। ও ছাড়া আর কে-ই-বা আছে। আমার আর ওর চাচার ধনসম্পত্তির সে মালিক হবে। এটুকু শুধু খেয়াল রাখ যেন পরিবারটি নষ্ট না হয়ে যায়। এতে তোমারও ভালো হবে, আর আমারও। পরিবারের সম্ভ্রম-সম্পদ বাড়ানো এখন তোমার হাতে।

খানুম : বেগম সাহেবাকে অধীনার বিনীত নমস্কার জানাবেন আর এই নিবেদন জানাবেন যে, তিনি যে-ইচ্ছের কথাটি জানিয়েছেন খোদার ইচ্ছেয় তা-ই হবে। আমি আপনার সারা জীবনের বাঁদি। আমার কাছে তাঁর আদেশ লঙ্ঘিত হবে না। এ বিশ্বাস আপনি রাখবেন।

বুড়ি : কিন্তু বেগম সাহেবা বলেছেন, ছব্বন যেন এ খবর জানতে না পারে। সে বড় জেদী ছেলে। যদি একবার টের পায় তো কখনই মানবে না।

খানুম : কার সাধ্যি! (আমাকে) দেখ ছুকরী, কোনো জায়গায় কারো সাথে এই গল্পটি করে বসবে না।

আমি : জি, না।

এরপর বুড়ি খানুমকে আলাদা জায়গায় নিয়ে গিয়ে কথাবার্তা বলল। সে কথা আমি শুনতে পাইনি। বুড়ি চলে যাওয়ার সময় খানুমকে এই পর্যন্ত বলতে শুনলাম—

খানুম : আমার পক্ষ থেকে এই নিবেদন করবে যে, এর কী দরকার ছিল। আমরা তো ওঁর পুরনো নুন খানেওয়ালা।

বুড়ি চলে যাওয়ার পর খানুম বিসমিল্লাকে ডেকে পাঠালেন আর কানে এমন কথা বললেন যে নবাব আসতেই সে এমন খাতির দেখালে যা সে তার মাইনেয় থাকার সময়ও দেখায়নি। নবাব সাহেব বসে বান্ধবোচিত কথাবার্তা বলছিলেন। আমিও সেখানে উপস্থিত ছিলাম। এর মধ্যে খানুম সাহেবা বিসমিল্লার ঘরের দরজায় এসে হাজির হলেন।

খানুম : ওহে, আমিও আসব নাকি ?

বিসমিল্লা : (নবাবকে) একটু সরে বস, মা আসছেন, (খানুমকে) এসো।

খানুম সাহেবা নবাবের সামনে এসেই তিনবার সালাম করলেন। আমি আজ ছাড়া আর কোনোদিন খানুমকে মুখ নিচু করে সালাম করতে দেখিনি।

খানুম : হুজুরের মেজাজ কেমন ?

নবাব : (ঘাড় নিচু করে) আম্মাকে ধন্যবাদ।

খানুম : খোদা সুখে রাখুন, যতই পাই না কেন আমরা টাকার প্রত্যাশায় আপনার হাতের মুঠোর দিকে চেয়ে থাকার লোক। খোদা আপনাকে ধনী করেছেন। এ সময়ে আপনার কাছে একটি নিবেদন নিয়ে হাজির হয়েছি। খোদা রাখেন তো বিসমিল্লা এমনিতেই তো সারা বছর আপনার সেবায় আছে। কিন্তু আমি কখনো আপনাকে কোনো কষ্ট দিইনি। অযথা আপনাকে সেলাম দেবার সুযোগ করে উঠতে পারিনি। এখন এমনই দরকার. যে চলে এসেছি।

খানুম তো এইসব কথাবার্তা বলছিলেন, আমি বিসমিল্লার মুখের দিকে চেয়ে দেখছিলাম—ও বুঝতেই পারছিল না, তিনি কি বলছেন।

আমি কোনো রকম খানুমের কথার খেই খুঁজে পেলাম নবাব বিসমিল্লার দিকে চেয়েছিলেন। নবাবের অবস্থাটি এমন হলো যে, তিনি বিবর্ণ হয়ে যেতে থাকলেন। চোখ বুঁজে আসছে। কিন্তু তিনি চুপ করে বসে রইলেন।

খানুম : তো নিবেদন করি ?

নবাব : (খুব মুশকিলে পড়ে) বলুন।

খানুম : (আমাকে) হুসেনি পিসিকে একটু ডেকে আন তো !

আমি গিয়ে হুসেনি পিসিকে ডেকে আনলাম।

খানুম : (হুসেনি পিসিকে) একটু শাল জোড়া নিয়ে এস তো। এই যা কাল বিক্রি হওয়ার জন্য নিয়ে এসেছিল।

'বিক্রি হওয়ার জন্য নিয়ে এসেছিল' কথাগুলি শুনে হঠাৎ বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হলে যেমন চেহারা হয় নবাবের তেমনি চেহারা হয়ে গেল। কিন্তু অতি কষ্টে চুপ করে বসে রইলেন। এর মধ্যে হুসেনি পিসি শাল দুটি আনলেন। এমন সোনার কারুকার্য করা শাল খুব কমই দেখতে পাওয়া যায়।

খানুম : (নবাবকে শাল দুটি দেখিয়ে) দেখুন, এই শাল দুটি কাল বিক্রি হওয়ার জন্য এসেছিল। ব্যাপারী দুহাজার টাকার কথা বলেছে। লোকে পনেরশ টাকা পর্যন্ত দিতে চেয়েছিল কিন্তু সে দেয়নি। আমার মতে সতের বা আঠারশও খুব চড়া নয়। তবে হুজুর যদি কৃপা করেন তবে আপনার দৌলতে এই বুড়ো বয়সে শাল দুটি পরতে পারি।

নবাব চুপ করে বসে রইলেন। বিসমিল্লাজান কিছু বলতে যাচ্ছিল, এমন সময়ে খানুম বললেন—

থাম মেয়ে, আমার কথার মধ্যে কথা বলিস না। তুই তো আগামী দিনে অনেক আবদার করবি। আমারও একটি আবদার থাক।

নবাব তবুও চুপ করে বসে রইলেন।

খানুম : প্রত্যাশায় রাখার চাইতে অস্বীকার করা ভালো। কিছু তো আদেশ করুন, চুপ করে থাকলে তো বাঁদী খুশি হবে না। হ্যাঁ, না কিছু তো বলে দিন। আমার মনের ইচ্ছাটি তো পূরণ হয়।

তবুও নবাব চুপ।

খানুম : আল্লার দোহাই, জবাব দিন। আমার মর্যাদাই-বা কি! আমি তো বাজারী বেশ্যা। কিন্তু আপনারাই তো আমাদের মতো লোকের সম্মান দিয়েছেন। খোদার দোহাই, ওই মেয়েদের সামনে আমার মতো বুড়িকে নিচু করে দেবেন না।

নবাব : (সজল চক্ষে) খানুম সাহেবা, এই শাল জোড়ার কোনো কথাই না। কিন্তু, তোমার বোধহয় আমার অবস্থার কথা জানা নেই। বিসমিল্লাজান কি কিছু বলেনি? আর উমরাওজানও তো সেদিন উপস্থিত ছিল।

খানুম : আমাকে কেউ কিছু বলেনি। কেন? সব মঙ্গল তো?

বিসমিল্লাজান আবার কিছু বলতে যাচ্ছিল, খানুম চোখের ইশারায় তাকে চুপ করিয়ে দিলেন। সে এধার ওধার দেখতে লাগল। আমি তো প্রথম থেকে মূর্তিপ্রায় বসেছিলাম।

নবাব : এখন আমার এমন ক্ষমতা নেই যে আপনার আবদার পূরণ করি।

খানুম : এরকম অবস্থা আপনার শত্রুরও যেন না হয়। আর আমিও এমন ছ্যাচড়া নই যে, রোজ রোজ আবদার করব। আমি আবদার করি বা না করি, বিসমিল্লা করবে। হায়, আমি বুড়ি, আমার আবদারই-বা কি আর আমিই-বা কে।

একথা বলে খানুম একটি দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, হায় কপাল! এখন আমার এমনই হাল হয়েছে যে, নবাবের মতো ধনবানও এক টুকরো ছেঁড়া কাপড়ের জন্য আমার সাথে কথা বলছেন না।

আমি দেখছিলাম যে, খানুমের একেকটি কথা নবাবের বুকে তীরের মতো বিঁধে যাচ্ছিল।

নবাব: খানুম সাহেবা, আপনি সবকিছুরই যোগ্য। আমি সত্যি বলছি যে, এখন আমার এমন অবস্থা নয় যে আমি কারো আবদার পূরণ করতে পারি।

এরপর নবাব তাঁর দুর্দশার কথা বিস্তারিত বললেন।

খানুম: যা হোক মিঞা, এরকম তুচ্ছ একটি আবদার তো পূরণ করার যোগ্যতা নেই, তবে আর বেশ্যাবাড়ি আসার দরকার কী? হুজুরের কি জানা নেই যে 'বেশ্যা চারটি পয়সার বন্ধু'। আপনি এটিও কি শোনেননি যে 'বেশ্যা আবার কার বউ'? আমাদের মতো লোক যদি দাক্ষিণ্য দেখায় তো খাবে কী? এটি এমনিতেই আপনার ঘর, আমি বারণ করছি না। কিন্তু আপনার নিজের ইজ্জত সম্বন্ধে নিজের খেয়াল রাখা দরকার।

কথাগুলি বলেই খানুম তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

নবাব: সত্যিই আমার বড় অন্যায় হয়েছে। আল্লার কৃপায় আর এখানে আসব না।

একথা বলে উনি উঠতে যাচ্ছিলেন। বিসমিল্লা তাঁর কোটের ঝুল ধরে টেনে বসিয়ে দিল।

বিসমিল্লা: আচ্ছা, এই বালা জোড়ার কথা কী বলছ?

নবাব: (কি রকম একটা ভয় পেয়ে) আমি জানিনে।

বিসমিল্লা: আহ্, তুমি তো বিলকুল রেগে গেছ। যাচ্ছ কোথায়, দাঁড়াও।

নবাব: না বিসমিল্লাজান, আমাকে যেতে দাও। এখন আমার আসাটা নিরর্থক। খোদা যদি দিন দেন তো দেখা যাবে। আর এখন কি দিনই-বা আর ফিরে আসবে।

বিসমিল্লা: আমি তো যেতে দেব না।

নবাব: তবে কি তুমি তোমার মাকে দিয়ে আমায় জুতো খাওয়াবে?

বিসমিল্লা: (আমার দিকে ফিরে) তা সত্যিকথা, বোন উমরাও। আজ বুড়ির কি যে হয়েছিল। বছরের পর বছর আমার ঘরে একবার উঁকি মেরেও দেখেনি, আর আজ যদিও-বা এল তো এমন উত্তেজনা সৃষ্টি করে গেল! মা চটেই যান আর খুশিই হোন, ভাই, আমি কিন্তু নবাবের সঙ্গে বন্ধন ছিন্ন করতে পারব না। আজ যদি টাকা পয়সা ওঁর কাছে না থাকে তো তাও। তা বলে এইরকম চোখ গরম করতে হবে? আর শেষপর্যন্ত এই সেই নবাব খাঁ যাঁর অনুগ্রহে মা হাজার হাজার টাকা পেয়েছেন। আজ তাঁর অবস্থা খারাপ হয়ে গেছে বলে আমিও কি মরসুমী পাখির মতো মুখ ফিরিয়ে নেব? এটি কখনই হতে পারে না। আর মা যদি বেশি রাগ করে তো বোন উমরাও, আমি সত্যি বলছি (নবাবের হাত ধরে) কোনো দিকে চলে যাব। নাও, আমি আমার মনের কথাই বলেছি।

আমি বিসমিল্লার কথাগুলি বেশ ভালো করেই বুঝতে পারছিলাম আর কথায় কথায় সায় দিয়ে যাচ্ছিলাম।

বিসমিল্লা : বেশ, তা নবাব, তুমি থাক কোথায় ?

নবাব : কোথায়-বা বলি !

বিসমিল্লা : তবুও কোথাও তো ?

নবাব : তহসীনগঞ্জে মখদুম বখ্‌সের ঘরে আছি। হায়, আমি জানতামই না মখদুম এমন কৃতজ্ঞ। সত্যি বলতে কি, আমি ওর কাছে খুবই লজ্জিত।

আমি : এ সেই মখদুম না, যে আপনার বাবার আমল থেকেই চাকর ছিল, যাকে আপনি চাকরি থেকে ছাড়িয়ে দিয়েছিলেন ?

নবাব : হ্যাঁ, সেই মখদুম বখ্‌স। এ সময়ে সে যে আমার কি উপকারই করেছে তার আর কি বলব। যাহোক, যদি খোদা চান

এ পর্যন্ত বলেই নবাবের চোখ দিয়ে টপ টপ করে জল পড়তে থাকল। এরপর নবাব বিসমিল্লার হাত কোটের ঝুল থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে কামরার বাইরে চলে গেলেন। আমার ইচ্ছে ছিল, চলতে চলতে নবাবের সাথে কিছু কথা বলব, কিন্তু উনি এত দ্রুত নেমে গেলেন যে কিছুই বলতে পারলাম না। নবাবের চেহারাটি এ সময়ে খুবই কাহিল। খানুমের কথায় নবাবের মনে কঠিন আঘাত বেজেছিল। ওঁর অবস্থা ছিল একেবারেই বেপরোয়া লোকের মতো।

যদিও এটি আমার জানা ছিল যে, খানুম যেসব কথাবার্তা বলেছিলেন তা সবই ঐ নির্দেশের মুখবন্ধ মাত্র, যা ছিল কিছু সময়ের জন্য স্থগিত। তবুও আমার ভয়ানক উদ্‌বেগ ছিল, কি যে ঘটে যায়। এরকম যেন না হয় যে বিষ খান। তবে তো আরও বিপর্যয় ঘটবে।

সন্ধ্যে হতে না হতেই আমি আর বিসমিল্লা দুজনেই পালকিতে তহসীনগঞ্জ গেলাম। অনেক খোঁজাখুঁজির পর মখদুম বখ্‌সের বাড়ি পাওয়া গেল। বেহারা ওর দরজায় গিয়ে ডাকলে একটি ছোট মেয়ে ভিতর থেকে বেরিয়ে এল। ওর কাছ থেকে জানা গেল যে, মখদুম বখ্‌স বাড়ি নেই। নবাবের কথা জিজ্ঞেস করলে বলল যে, উনি সকালেই কোথায় চলে গেছেন, এখন পর্যন্ত ফেরেননি। দুঘণ্টা পর্যন্ত অপেক্ষায় রইলাম। না এলেন নবাব, না এল মখদুম বখ্‌স। শেষপর্যন্ত হতাশ হয়ে বাড়ি ফিরে এলাম।

দ্বিতীয়দিন মখদুম বখ্‌স সকালে নবাবের খোঁজে এল। জানতে পারলাম যে, রাত্রেও নবাব বাড়ি ফেরেননি। সন্ধ্যে বেলায় ওঁর মায়ের চাকরানী সেই বুড়ি, যে একদিন খানুমের কাছে এসেছিল, কাঁদতে কাঁদতে এল। তার কাছ থেকে খবর পাওয়া গেল যে, নবাবের কোনো খোঁজই পাওয়া যায়নি। বেগম সাহেবা কাঁদতে কাঁদতে কিরকম হয়ে গেছেন। বড় নবাবও খুব মুষড়ে পড়েছেন।

এই ঘটনার পর কয়েকদিন কেটে গেল। নবাব ছব্বন সাহেবের কোনো খবরই পাওয়া গেল না। এর চার/পাঁচ দিন পরে ছব্বন সাহেবের আংটিটি গোহাটায় বিক্রি হওয়ার সময় ধরা পড়ল। বিক্রেতাকে আলি রেজা বেগ থানায় নিয়ে

এলেন। সে বলল, ইমাম বখ্‌স সাকীর ছেলে তাকে এটি বেচতে দিয়েছে। ইমাম বখ্‌স সাকীর ছেলেকে তো পাওয়া গেল না। স্বয়ং ইমাম বখ্‌সকেই ধরে নিয়ে আসা হলো। প্রথমে ইমাম বখ্‌স তো ভান করল আংটির ব্যাপার কিছু জানেই না। শেষে কোতোয়াল সাহেব খুব ডাণ্ডা পিটলে ও ধমক দিলে স্বীকার করল।

ইমাম বখ্‌স: হুজুর, নদীতীরের কাছে লোহার পুলের পাশে বসে তামাক খাচ্ছিলাম আর স্নানার্থীদের কাপড়-চোপড় রাখার কাজ করছিলাম। দিন পাঁচেকের কথা, বিশ/বাইশ বছরের ফর্সা, খুব সুন্দর, নওজোয়ান সম্ভ্রান্ত বংশের একটি ছেলে সন্ধ্যে হতে না হতেই স্নান করার জন্য পুলের উপর আসেন। তিনি কাপড়-চোপড় খুলে আমার কাছে রাখতে দিলেন। আমি সেগুলি লুঙ্গি দিয়ে বাঁধি। তারপর তিনি নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ স্নান করার পর তিনি আমার নজরের বাইরে চলে গেলেন। আর সব লোক স্নান করার পর নিজ নিজ কাপড় পরে নিজের নিজের ঘরে গেলেন। কিন্তু ঐ সাহেব আর এলেন না। আমি ভাবলাম যে, তিনি হয়ত কোনোদিকে চলে গেছেন। অনেক দেরি হয়ে গেল। আমি আশায় আশায় আছি, এই আসছেন, এই আসছেন। এক প্রহর রাত পর্যন্ত বসে রইলাম। শেষে আমার বিশ্বাস হলো যে, তিনি ডুবে গেছেন। এখন মনে মনে এই ভাবলাম যে, যদি কাউকে বলি তো ঝঞ্ঝাটে ফেঁসে যাব। ভয়ে ভয়ে থাকব। তার চেয়ে চুপ করে থাকাই ভালো। ওঁর কাপড়-চোপড় তুলে নিয়ে বাড়ি চলে এলাম। জামার পকেট থেকে এই আংটিটি বেরোয়। আরও একটি আংটি বেরোয়, তাতে খোদা জানেন কি লেখা আছে। আমি ভয়ে আজ পর্যন্ত কাউকেই সেটি দেখাইনি। আমি এই আংটিটিও বেচতাম না, কিন্তু আমার ছেলেটি পাজি, সে চুরি করে এটি নিয়ে আসে।

মির্জা আলি রেজা বেগ দুই জন সিপাহির সাথে ওর বাড়ি গিয়ে ঐ আংটি আর কাপড়-চোপড় নিয়ে আসে। আংটি ছিল সোনার। মির্জা আলি রেজা বেগ বড় নবাবকে এই নমুনা পাওয়ার খবর দিলেন। কাপড় আর দুটো আংটি তার বাড়িতে পাঠিয়ে দিলেন। আর ইমাম বখ্‌সের হলো জেল।

বিসমিল্লা: হায় হায়, নবাব ছব্বন সাহেব শেষপর্যন্ত ডুবে গেলেন। আমি সত্য বলব কি মায়ের গায়ে লাগবে তাঁর রক্ত।

আমি: আফসোস! আমার মনে তো ঐ দিনই খটকা লেগেছিল। এই জন্যই ওঁর সাথে উঠে গিয়েছিলাম, ওঁকে কিছু বুঝতে দেব। কিন্তু উনি চলেই গেলেন।

বিসমিল্লা: মৃত্যু ওঁর ঘাড়ে চেপে বসেছিল। বড় নবাবকে খোদা শাস্তি দিন। উনি যদি সম্পত্তি থেকে ওঁকে বঞ্চিত না করতেন তবে উনি মরতেন না।

আমি: খোদা জানেন, মায়ের কী হাল হয়েছে।

বিসমিল্লা: শুনেছি হতভাগিনী পাগল হয়ে গেছেন।

আমি: কে না হবে। খোদা অনেক প্রার্থনার পর এই একমাত্র ছেলে দিয়ে-

ছিলেন । একে তো বেচারী বিধবা, তার উপর আবার এই বজ্র মাথায় ভেঙে পড়ল । সত্যি বলতে কি ওঁর সংসার নষ্ট হয়ে গেল ।

রুশোয়া : তাহলে নবাব ছব্বন সাহেবকে আপনি ডুবিয়েই দিলেন । আচ্ছা, এই সুযোগে আমাকে একটি কথা জিজ্ঞেস করতে দিন ।

আমি : জিজ্ঞেস করুন ।

রুশোয়া : নবাব সাহেব সাঁতার জানতেন কিনা ।

আমি : কি জানি । একথা জিজ্ঞেস করছেন কেন ?

রুশোয়া : এই জন্য যে, আমাকে একজন বড় সাঁতারু, যাঁকে মেছো সাহেব বলে তিনি এই বলেছিলেন যে, যে-লোক সাঁতার জানে সে নিজে এভাবে মরতে পারে না ।

৮

অকৃত্রিম আনুগত্য পরীক্ষার
কোনো প্রয়োজন ছিল নাকো তার,
ইচ্ছে শুধ্ কাউকে সে কষ্ট দেবে
করবে তার খুশির শিকার।

উমরাওজান : মির্জা রুশোয়া সাহেব, আপনি কারো প্রেমে পড়েছেন ?

রুশোয়া : জি, না। খোদা তেমনটি যেন না করেন। আপনার প্রেমিক হয়ত-বা হবে শয়ে শয়ে। আপনার নিজের অবস্থার কথাই বলুন, সেই কথাই শুনতে আমি আগ্রহী। কিন্তু আপনি তা বলছেন না।

উমরাও : আমাদের বেশ্যাদের এটি হলো পেশা আর প্রচলিত রীতি। যখন কাউকে ফাঁদে ফেলতে হবে তখন আমরা তার জন্য মরতে থাকি। আমাদের চেয়ে বেশি মরার কথা আর কারো আসে না! নিশ্বাস ঠাণ্ডা হয়ে আসে, কথায় কথায় আসে কান্না, দুটো-দুটো দিন অনাহারে পড়ে থাকা, কুয়োর পাড়ে পা ঝুলিয়ে বসে থাকা, বিষ খাওয়া এ সবকিছুই আমরা করে থাকি। লোকটির হৃদয় যত কঠিনই হোক-না কেন আমাদের এই ধাপ্পার জালে তাকে পড়তেই হবে।

কিন্তু আপনাকে সত্যি বলছি, আমি কাউকে ভালবাসিনি, আমাকেও কেউ ভালবাসেনি। প্রকৃতপক্ষে প্রণয়ে ছিল বিসমিল্লাজানের বেশ দক্ষতা। মানুষ তো মানুষ, দেবদূত ওদের জালিয়াতি থেকে বেরতে পারে না। হাজার হাজার লোক ওদের প্রেমিক আর ওরাও হাজার হাজার লোকের প্রেমিকা। ওর সত্যিকারের প্রেমিকদের মধ্যে ছিলেন একজন মৌলবী সাহেব। ভক্তি-শ্রদ্ধা করার মতো চেহারা। মৌলবী সাহেব যে-সে লোক ছিলেন না। উঁচুদরের আরবি বইগুলির উপর বক্তৃতা দিতেন। দূর দূর থেকে লোক ওঁর কাছে পড়তে আসতেন। বুদ্ধিমত্তায় ওঁর যোগ্য বা জুড়ি কেউ ছিলেন না। বয়স এই সম্ভ্রান্ত লোকটির সত্তরের কিছু কমই হবে। দিব্যকান্তি, শ্বেত শ্মশ্রু, মস্তক মুণ্ডিত, তার উপর পাগড়ি, গায়ে ঝোলানো জামা, হাতে ছড়ি। ওঁর চেহারা দেখে কেউ বলতে পারবে না যে, উনি একটি প্রগলভা নির্লজ্জ যুবতী বেশ্যার প্রেমে পড়তে পারেন।

একদিনকার ঘটনা নিবেদন করছি। এটি কোনো রকমেই অতিরঞ্জিত বলে

মনে করবেন না। সবই ঠিক ঠিক। আপনার বন্ধু প্রয়াত মির সাহেব, যাঁর দিলবরজানের সাথে সম্বন্ধ ছিল, নিজে কবি ছিলেন। আর সেই সূত্রে সৌন্দর্যের পূজায়ও ছিল তাঁর উৎসাহ। কিন্তু নিতান্তই সব জেনে ও বুঝে শহরের সবচেয়ে সুন্দরী বেশ্যাদের বাড়িতে তাঁর ছিল যাতায়াত।

রুশোয়া : হ্যাঁ বলুন না, আমি খুব জানি। খোদা তাঁর আরো পদোন্নতি করুন।

উমরাও : উনিও সে সময়ে সেখানে উপস্থিত ছিলেন। আপনার হয়ত-বা মনে আছে, বিসমিল্লাজান খানুমের সাথে ঝগড়া করে বাজাজের বাড়ির পিছনের ওই ঘরটিতে কিছুদিনের জন্য গিয়েছিল।

রুশোয়া : ঐ বাড়িতে আমি কখনও যাইনি।

উমরাও : যাক। কিন্তু বিসমিল্লাকে দেখার জন্য আর মা-বেটির ঝগড়া মীমাংসা করার গরজে আমি প্রায়ই ওখানে যেতাম। একদিন সন্ধ্যের কাছাকাছি বিসমিল্লাজান উঠানে তক্তাপোশে হেলান দিয়ে বসেছিল, তার পাশে ছিলেন প্রয়াত মির সাহেব। শ্রদ্ধেয় মৌলবী সাহেব সামনে দুই হাঁটু গেড়ে বসে আছেন। সে সময়ে ওঁর সেই অসহায় চেহারাটি ভুলবার নয়। চুপি চুপি (হয়ত-বা) শান্তির মালা জপ ইয়াহাফিজ, ইয়াহাফিজ পড়ছিলেন। আমি যাওয়ার সাথে সাথে বিসমিল্লাজান আমার হাত ধরে তার সামনে বসিয়ে দিল। আমি মির সাহেব আর মৌলবী সাহেবকে নমস্কার জানিয়ে বসলাম। বিসমিল্লা আমার কানে কানে বলল, তামাশা দেখবে ?

আমি : (হতবুদ্ধি হয়ে) কিসের তামাশা ?

বিসমিল্লা : দেখ। (এই কথা বলে সে মৌলবী সাহেবের দিকে ফিরল) বাড়ির উঠোনে একটি বহুকালের পুরনো নিমগাছ ছিল, মৌলবী সাহেবের উপর হুকুম হল, ঐ নিমগাছে চড়।

মৌলবী সাহেবের মুখ কালো হয়ে গেল। তিনি থরথর করে কাঁপতে লাগলেন। আমি তো মাটিতে পড়েই যাচ্ছিলাম। মির সাহেব মুখ ফিরিয়ে বসলেন। বেচারা মৌলবী সাহেব কখনো দেখছেন আকাশ আর কখনো দেখছেন বিসমিল্লার মুখের দিকে। এদিকে একবার হুকুম করার পর দ্বিতীয়বার হুকুম পৌঁছল আর তাড়াতাড়ি তৃতীয়বার কড়া হুকুম, চড় বলছি।

এবার আমি দেখলাম যে, মৌলবী সাহেব 'বিসমিল্লা' বলে উঠে দাঁড়ালেন! গায়ের ঝোলা জামাটি তক্তাপোশের উপর রাখলেন। নিমগাছটির গোড়ায় গিয়ে দাঁড়ালেন। তারপর আবার একবার বিসমিল্লার দিকে তাকালেন। বিসমিল্লা ভ্রূ কুঁচকে বলল, হ্যাঁ। মৌলবী সাহেব পায়জামা গুটিয়ে নিয়ে গাছে চড়তে শুরু করলেন, কিছু দূর অবধি উঠে বিসমিল্লার দিকে তাকালেন, দেখার মতলবটি ছিল বোধহয় এই যে, এই পর্যন্ত, না আর চড়তে হবে।

বিসমিল্লা : আরও উপরে।

মৌলবী সাহেব আর একটু উপরে চড়লেন, আবার হুকুমের অপেক্ষায় থাকলেন। আবার সেই 'আরও'। এইভাবে গাছটির প্রায় আগডালে পৌঁছে গেলেন, আর উপরের ডালটি ছিল এত পাতলা যে আর উপরে উঠলে সেটি ভেঙে পড়ত আর তার সাথে সাথে মৌলবী সাহেবের দেহ ত্যাগ করত তাঁর প্রাণ। বিসমিল্লার মুখ থেকে আরও বেরতে যাচ্ছিল, প্রায় তেমন সময় আমি ওর পায়ের উপর লুটিয়ে পড়লাম। মির সাহেবও খুবই মিনতি করে ওর জন্য সুপারিশ করলেন। শেষে হুকুম হলো নেমে আসার। মৌলবী সাহেব ওঠার সময় তো উঠে গিয়েছিলেন। কিন্তু নামার সময় হলো বড়ই মুশকিল। আমার তো ভয় হচ্ছিল উনি বুঝি এই পড়েন তো সেই পড়েন। কিন্তু শেষপর্যন্ত নিরাপদে নেমে এলেন। বেচারী তো ঘেমে অস্থির। নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসার উপক্রম। প্রায় পড়ে যান আর কি। কিন্তু সামলে নিয়ে তিনি খড়ম পরে তক্তাপোশের কাছে এলেন আর ঝোলা কোটটি পরে তক্তাপোশের উপর আস্তে আস্তে বসে মালা জপতে থাকলেন। বসে তো পড়লেন, কিন্তু ছটফট করতে থাকলেন। ওঁর জামার মধ্যে পিঁপড়ে ঢুকে গিয়েছিল।

রুশোয়া : আল্লার দোহাই, বিসমিল্লাও একটি অদ্ভুত ধরনের রসিক বেশ্যা।

উমরাও : রসিকতা করার রকমটি কেমন, ও নিষ্ঠুরা চুপ করে বসে রইল। হাসির সামান্য চিহ্নও তার মুখে দেখা যায়নি। আমি আর মির সাহেব নির্বাক বসে রইলাম। একটি অদ্ভুত অবস্থা ছিল সেখানে ছড়িয়ে।

কষ্ট দেবার উপায় যত
কেন-বা আর থাকে বাকি
প্রেমের এ দায়
আগামীতে মজা ভারি আনে নাকি।

রুশোয়া : বাক্যটি জীবনভোর হাসার পক্ষে যথেষ্ট। শর্তটি চিন্তা করার মতো। তুমি তো বলে গেলে, আর আমার চোখে ছবির মতো ভাসছে বিসমিল্লা, মৌলবী সাহেব আর তার পবিত্র চেহারা, মির সাহেব, আঙিনা, নিমগাছ এইসব আর ভাসছ তুমি। এটি এমনই একটা কিছু ঘটনা যাতে হঠাৎ হাসি আসে না, মৌলবী সাহেবের নির্বুদ্ধিতায় কান্না আসে। বিসমিল্লা পীড়নকারী বেশ্যা ছিল সন্দেহ নেই। সত্তর বছরের বুড়ো আর তার উপর এই হুকুম, গাছে চড়— আর সেও উঠল, এর আমি কিছুই বুঝতে পারছিনে। বড়ই সূক্ষ্ম ব্যাপার।

উমরাও : প্রকৃতপক্ষে আপনি ঠিক বুঝতে পারেননি। এটিতে বিচারের একটি সূক্ষ্ম বিষয় রয়েছে, তাহলে শেষ অবধি বলতেই হবে।

রুশোয়া : দোহাই আল্লা, বলুন। অপমানের আর কিছু বাকি আছে নাকি?

উমরাও : অপমানের আরও অনেক বাকি। নিন, শুনুন—

মৌলবী সাহেব যাওয়ার পর আমি বিসমিল্লাকে জিজ্ঞেস করলাম, বিসমিল্লা, তোর কি হয়েছিল রে?

বিসমিল্লা : কী?

আমি : সত্তর বছরের বুড়ো। আজ ঐ গাছ থেকে পড়লে তো খুন হয়ে যেত।

বিসমিল্লা : মরলে আপদের শান্তি হত। মুখপোড়া বুড়ো আমাকে খুব জ্বালাচ্ছে। কাল আমার ধম্মোকে এমন জোর আছাড় দিয়েছিল যে, আমি ভাবলাম তার হাড়মাস গুঁড়ো হয়ে গেছে।

কথাটি এই যে, বিসমিল্লা একটি বাঁদরি পালন করেছিল। ওকে সে খুব ভালবাসত। তার ঠাট-বাটের কথা একটু শুনুন। তার ছিল সাটিনের স্কার্ট, কাজকরা কামিজা, জালিকাটা দোপাট্টা, রুপোর চুড়ি, পায়ে ঘুঙুর, সোনার বালা, সে খায় জিলাপি অমৃতি। তাকে যখন কেনা হয় মুখপুড়ি তখন ছিল এতটুকু। খুব খেয়েদেয়ে দু তিন বছরের মধ্যেই বেশ মোটাসোটা হয়ে গেল। যারা জানে তাদের কোনো ভয় ছিল না। কিন্তু অচেনা লোকের উপর ও যদি ঝাঁপিয়ে পড়ে তো তার দম বন্ধ হয়ে যেত। আর ওর জোরও ছিল এত যে বেশ শক্তপোক্ত লোকের হাত ধরলে তা ছাড়িয়ে নেয়া ছিল শক্ত।

যেদিন মৌলবী সাহেবকে নিমগাছে চড়ার হুকুম হয় তার একদিন আগের ঘটনা এই যে, উনি তো এসেছেন। তক্তাপোশে হেলান দিয়ে বসে আছেন। বিসমিল্লাজানের দুষ্টুমির ঝোঁক চাপল। ধম্মোকে ইশারা করলে ও মৌলবী সাহেবের পিছন দিক থেকে চুপি চুপি এসে অকস্মাৎ তাঁর কাঁধে চেপে বসল। বেচারী সাহেব ঘাড় ফিরিয়ে দেখেই ঘাবড়ে গেলেন। উনি সজোরে ঝেড়ে ফেলতেই বাঁদরি তক্তাপোশ থেকে নীচে পড়ে গেল। বিসমিল্লারভয় হলো ও বুঝি মরেই গেল। মৌলবী সাহেবকে মুখ ভেঙচাতে লাগল, মৌলবী সাহেব লাঠি দেখালে ও ভয়ে বিসমিল্লার কোলে গিয়ে বসল। বিসমিল্লা ওকে হাত বুলিয়ে দিয়ে দোপাট্টাটি পরিয়ে দিল। আর মৌলবী সাহেবকে খুব মন খুলে তিরস্কার আর গালিগালাজ করল. এতেও সে শান্ত হয়নি· দ্বিতীয় দিনে এই সাজার ব্যবস্থা করল।

রুশোয়া : মজাটি আমার পছন্দসই।

উমরাও : পছন্দসই তো বটে। মৌলবী সাহেবকে কাঠের খেলনা বানিয়ে দিল।

রুশোয়া : প্রকৃতপক্ষে মৌলবী সাহেব তো এরকম সাজা পাওয়ারই যোগ্য। মজনু তো লায়লার প্রিয় কুকুরকে কোলে নিয়েছিলেন। আর মৌলবী সাহেব বিসমিল্লার বাঁদরিকে কিনা আছাড় মেরে ফেলে দিলেন, তার উপর আরও বেয়াদবি, কি না লাঠি দেখানো! এ যে প্রেমিকের গৌরবজনক ভূমিকা থেকে অনেক দূরে।

উমরাও : একদিন রাত্রে আটটার সময় বিসমিল্লার কামরায় বসেছিলাম। বিসমিল্লা গান করছিল, আমি ধরেছিলাম তানপুরা। খলিফাজী বাজাচ্ছিলেন তবলা। এই সময়ে শ্রদ্ধেয় মৌলবী সাহেব হাজির হলেন।

বিসমিল্লা : (দেখেই) আটদিন ছিলে কোথায় ?

মৌলবী : ঐ দিনের ঘটনার সূত্রে আমার এত সাংঘাতিক জর হয় যে বাঁচার আশা ছিল কম। কিন্তু তোমাকে দেখব বলেই জান ফিরে পেয়েছি।

বিসমিল্লা : খোদার সাথে সংযোগ হয়ে যেত, এই কথা বলুন।

উমরাও : এ কথায় আমার আর খলিফাজীর বুক ধড়ফড় করে উঠল।

মৌলবী : জি, হঁ্যা, লক্ষণ তো এই রকমই কিছু ছিল।

বিসমিল্লা : আল্লার দোহাই, ভালোই হত।

মৌলবী : আমি মরলে আপনার লাভ কী হত ?

বিসমিল্লা : আপনার মতো সাধুর স্মৃতিতর্পণ করতে প্রত্যেক বছর যেতাম, গাইতাম, নাচতাম, লোকে মুগ্ধ হত, আপনার নাম উজ্জ্বল হত।

এই রকমের কয়েকটি কথাবার্তার পর আবার গান শুরু হলো। বিসমিল্লা সময়োপযোগী গজল শুরু করল—

মরণকালেও মরার কথা আসে না স্মরণে
সে রঙ্গিলার চালচলনটি পড়ে শুধু মনে।

মৌলবী সাহেবের আনন্দাপ্লুত অশ্রু অঝোরে ঝরে পড়ছিল। এমনি সময়ে সমুখের দরজাটি খুলে গেল আর একজন সাহেব হাজির হলেন। তাঁর রং তামাটে. গোল গোল চেহারা, কালো দাড়ি, লম্বায় মাঝারি, শরীর পেশীবহুল।

তাঁর পায়জামাটি আঁটসাট, পায়ে ভেলভেটের চটি। কারুকার্য করা জালের রুমাল, টুপি মাথায় বাঁধা। বিসমিল্লা তাঁকে দেখেই বলল, সেদিন গেলেন আর আজ আপনি এলেন। বেশ, তবে আসুন। এরকম বন্ধুত্ব আমি রাখিনে, আর আমার সেই লাল বাঁকা গ্রান্টের সিল্কের কাপড় কোথায় ?

এই জন্যই তো আপনি মুখ দেখাননি।

সাহেবটি : (লজ্জিত কণ্ঠে) না মহাশয়া, সে কথা নয়, সেদিন থেকে আমার অবসর মেলেনি। বাবার খুব অসুখ হয়েছিল। আমাকে তাঁর সেবায় খুব ব্যস্ত থাকতে হয়।

বিসমিল্লা : জি, হঁ্যা, আপনি এতই কর্তব্যপরায়ণ আর আমাকে তা বিশ্বাস করতে হবে। তা একথা বলছ না কেন যে, বব্বনের ছুকরীর রূপমুগ্ধ হয়ে তার দরবারে রাতে যাতায়াত করছ। সব খবরই আমার কাছে আসে। আর আমার কাছে এসে গল্প বানাচ্ছ যে বাবার শরীর খারাপ।

এই কথা শুনে একবার মৌলবী সাহেব পেছন ফিরে দেখলেন। ওঁর চোখ কপালে উঠে গেল। মৌলবী সাহেব তৎক্ষণাৎ মুখ ফিরিয়ে নিলেন। আর দ্বিতীয়

সাহেবটির দেখলাম মুখের রং বদলে গেল, হাত-পা থরথর করে কাঁপতে থাকল। তাড়াতাড়ি দরজা খুলে ঘরের নীচে চলে গেলেন। বিসমিল্লা ডাকাডাকি করলেও উনি কোনো জবাব দিলেন না।

বিসমিল্লাও কিছু বুঝবার আগেই চুপ হয়ে গেল, কিন্তু আবার একটিবার মাত্র ভ্রু কুঞ্চিত করে নিজে নিজেই বলল, তবে হয়ত-বা হবে। এ পর্যন্ত বলেই সে গানে মগ্ন হয়ে গেল। ঐদিনের পর আর আমি কখনো তাঁকে বিসমিল্লার ঘরে আসতে দেখিনি। মৌলবী সাহেব বরাবর আসতেন।

রুশোয়া : জি, হ্যাঁ, পুরনো কালের লোক এই রকমই বিশ্বস্ত ছিলেন।

উমরাও : গান চলছে এমন সময় গৌহর মির্জা এখানে এসে উপস্থিত হলো। হয়ত-বা সে শুনেছিল, আমি এখানে আছি, তাই চলে এসেছে। ওর আর বিসমিল্লার মধ্যে ফষ্টিনষ্টি চলছিল।

গৌহর মির্জা আমার ও বিসমিল্লার মাঝখানে বসে পড়ল। বিসমিল্লার ঘাড়ে হাত দিল।

গৌহর মির্জা : আজ বন্ধুত্বটি খুব গভীর। প্রাণ চায় ..

আমি মৌলবী সাহেবের দিকে তাকাতেই দেখি তাঁর কপাল আবেগে কুঁচকে উঠছে। একবারই মাত্র গৌহর মির্জা ওঁর দিকে তাকিয়ে দেখল। মনে হচ্ছিল, সে যেন খুব ভয় পেয়েছে। বিসমিল্লা ওর ওই ধরনের কাণ্ডকারখানা দেখে হাসির ফোয়ারা ছুটিয়ে দিল। খলিফাজী মুচকি মুচকি হাসতে লাগলেন। আমি তো মুখে রুমাল চাপা দিলাম। মৌলবী সাহেব কিন্তু ভয়ংকর অস্থির হয়ে পড়লেন এবং উঠে পড়ার উপক্রম করলেন। বিসমিল্লা বলল, বসো। বেচারা বসে পড়ল। বিসমিল্লার দুষ্টবুদ্ধিটি ছিল এই যে, তার সাথে গৌহর মির্জার গভীর ঘনিষ্ঠতা দেখে মৌলবী সাহেব যেন জ্বলে যায়। সে গৌহর মির্জার সাথে হাসতে শুরু করল। অনেকক্ষণ পর্যন্ত মৌলবী সাহেবকে এই ধোঁকার মধ্যে রাখল আর মৌলবী সাহেবের অবস্থা হলো আগুনের উপর বসে ঝলসে যাওয়ার। হাসির চোটে পেটে খিল ধরে যাচ্ছিল। শেষপর্যন্ত মৌলবী সাহেবের এই অসহায় অবস্থা দেখে আমার করুণা হলো, আমি সব ফাঁস করে দিলাম। এর ফলে বিসমিল্লা আমার উপর গেল ক্ষেপে। আমি গৌহর মির্জার দিকে তাকিয়ে বললাম, ইচ্ছে তো মিটেছে এখন চল।

এবার মৌলবী সাহেব বুঝতে পারলেন যে, গৌহর মির্জার সাথে আমার ভাব-ভালবাসা আছে, বিসমিল্লার সাথে কিছু নেই। মৌলবী খুবই খুশি হয়ে দাঁত বার করে হাসতে থাকলেন।

রুশোয়া : মৌলবী সাহেবের ভালবাসা পবিত্র ছিল না?

উমরাও : আহ্, পবিত্র ভালবাসায় কি ঈর্ষা আসে না, আসে।

রুশোয়া : তবে আর তা পবিত্র ভালবাসা হয় না।

উমরাও : সেটি জানে ওঁর বিবেক। আমি তো এই বুঝি।

৯

খানুমের নর্তকী মেয়েদের মধ্যে অনেকেই সেরা সুন্দরী ছিল কিন্তু খুরশিদের জুড়ি ছিল না কেউই। সে ছিল যেন একটি পরী। ময়দা আর কুমকুমে মেশানো রং। নাক ও তনুশ্রী যেন প্রকৃতির সৃষ্টিকর্তা নিজের হাতে বানিয়েছেন, চোখের তারা যেন মোতির মতো জ্বলজ্বল করছে, সুডৌল হাত-পা যেন আলোর মতো কোমল ছাঁচে ঢালা। পুষ্ট গোল-গোল বাহু। জামাগুলো সব এমন মাপসই আর মানানসই যেন ওরই জন্য সেগুলি তৈরি হয়েছে। তার ঐ সৌন্দর্য, ঐ সারল্য যে একবার দেখত সে-ই একেবারে মোহিত হয়ে যেত। যে জলসায় গিয়ে সে বসত মনে হত যেন সেখানে একটি দীপ জ্বেলে দেয়া হয়েছে। বিশজন বেশ্যা বসে থাকলেও নজরটি পড়বে তারই উপর। সবই ছিল তার ভালো, কেবল ভালো ছিল না তার কপাল। আর ভাগ্যকেই-বা অপবাদ দেবে কেন, জীবনভর ও নিজেই নিজের ভাগ্য নষ্ট করেছে। প্রকৃতপক্ষে ও বেশ্যাপনাটিই জানত না। বিশ্বাস হত যেন একটি জমিদারের মেয়ে, চেহারায় মনে হত নিষ্পাপ। অকৃত্রিম সৌন্দর্য ছিল তার, কিন্তু এই সৌন্দর্য ও শ্রীতে ছিল একটি পাগলামি – কেউ তাকে ভালবাসুক। এমনিতেই তো ও ভালবাসার যোগ্য ছিল, এমন কেউ ছিল না যে ওর সৌন্দর্যে মোহিত না হত। প্রথম থেকেই পিয়ারি সাহেবের সাথে তার ভালবাসা ছিল। তিনি হাজার হাজার টাকা দিয়েছেন আর প্রকৃতপক্ষে প্রাণ পর্যন্ত দিতেন। খুরশিদও তাঁকে খুবই ভালবাসত।

যখন নিজেরই বিশ্বাস হলো যে তার ভালবাসা খাঁটি, তখন সে নিজেই জান দেবার জন্য তৈরি। কোনোদিন দৈবাৎ তিনি না আসলে সারাটা দিন ধরে কয়েক দিন উপোস থাকত। বসে বসে শোকে অঝোরে কাঁদত। আমরা সবাই সান্ত্বনা দিতাম, দেখো খুরশিদ, এরকম করো না। পুরুষমানুষ নিষ্ঠুর হয়। তুমি ওকে খুব ভালবাস। কিন্তু তার বনিয়াদটি কী। নিকে তো আর করনি, বিয়েও হয়নি। এরকম করলে নিজেরই ক্ষতি। তুমি পস্তাবে। শেষে আমার কথাই খাটল। পিয়ারি সাহেব যখন দেখল যে, মেয়েটি তাকে ভালবাসে, সে মজা শুরু করল। হয় অষ্টপ্রহর বসে থাকত, নয়ত দু-দুদিন আসতই না। খুরশিদ তো প্রাণ দেয় আর-কি! কখনো কাঁদে, কখনো বসে থাকে, ভাত খায় না। অদ্ভুত অবস্থা। খানুম ওর উপর খুব রাগ করলেন। ওর খাওয়া-দাওয়া, যাওয়া-আসা লোকজনদের টাকা-পয়সা দেওয়া সব বন্ধ।

আমি এটি বুঝতে পারিনে, তার এই সৌন্দর্যের সাথে কে তার হৃদয়ে এই প্রেম ঢেলে দিল। সত্যি কথাটি এই যে, ও কোনো পুরুষমানুষের স্ত্রী হলে ভালভাবে দিন কাটাতে পারত। সারা জীবন ধরে পা ধুয়ে ধুয়ে জল খেত যদি কেউ ওর পৃষ্ঠপোষক হত। বিসমিল্লা খুরশিদজানের চঞ্চলতার সাথে পাল্লা দিতে পারত না। তার ছিল গাম্ভীর্য, গর্ব, চাপল্য, খোদার আশ্রয়ের মতো অবস্থা। আসলে ওর মায়ের টাকা নিয়ে ওর ছিল খুব গর্ব। প্রকৃতপক্ষে বিত্তও ছিল অনেক। কারো কাছে সে ধারত না। খুরশিদের মতো মেয়েদের কাছ থেকে মানুষের আশা ছিল অনেক। প্রকৃতপক্ষে কথা এই যে, ওর যদি বেশ্যাপনা থাকত তবে লাখ লাখ টাকা রোজগার করা যেত। এই সুন্দরীর গানের গলা ছিল না একদম, আর ভালো নাচতেও জানত না। ছিল স্রেফ চেহারা। প্রথম প্রথম অনেক মুজরো আসত, কিন্তু সবাই যখন বুঝে গেল যে ও নাচে-গানে বিশেষ পটু নয় তখন বায়না করা ছেড়ে দিল। যারা আসত তারা ওর রূপের মোহেই আসত। বড় বড় লোক ব্যাকুল হয়ে উঠতেন। কিন্তু এসে যখন দেখতেন, সে মুখ-গোমড়া করে বসে আছে, প্রত্যেকের প্রতি সে মুখ ফিরিয়ে রয়েছে, অমনোযোগী—কেননা তখন তার ঘাড়ে প্রেম চেপে বসেছে, আসা বন্ধ করে দিলেন। এখন শুধুমাত্র পিয়ারি সাহেবই রয়ে গেলেন। এদিকে আবার কেমন তামাশা দেখুন, পিয়ারি সাহেবের বাবার ওপর রাজার ক্রোক পরোয়ানা জারি হয়ে গেল। তাঁর ঘরবাড়ি বাজেয়াপ্ত হয়ে গেল, জায়গির ছিনিয়ে নিয়ে গেল। বেচারা পিয়ারি সাহেব গরিব হয়ে পড়লেন। কিন্তু এতসব সত্ত্বেও তাঁর উপর খুরশিদের ভালবাসা কিছুমাত্র কমল না। সে জিদ ধরল পিয়ারি সাহেব তাকে তাঁর ঘরে নিয়ে যান।

পিয়ারি সাহেব পরিবারের মান-সম্ভ্রমের কথা ভেবে কিংবা বাবার ভয়ে খুরশিদের প্রস্তাবে রাজি হলেন না। খুরশিদের আশা ধুলোয় লুটিয়ে গেল।

খুরশিদ ছিল খুব সরলমতি স্ত্রীলোক। বহু লোক বহু টাকা তাকে ঠকিয়ে নিয়ে গেছে। ফকির-ফকরালি সম্বন্ধে ছিল খুরশিদের খুব বিশ্বাস। একদিন এলেন এক শাহ ফকির। উনি কোনো জিনিস ডবল করে দিতেন। খুরশিদ তার বালা আর কঙ্কণজোড়া খুলে দিল। শাহ সাহেব একটি নতুন হাঁড়ি চেয়ে তার ভিতর কালো বীজ ভরলেন। বালা ও কঙ্কণজোড়া তার ভিতর ভরে দিয়ে হাঁড়ির মুখ ঢাকনি দিয়ে বন্ধ করলেন, গলায় শালকরদের এক টুকরো কাগজ দিয়ে সেটি লাল দাড় দিয়ে বেঁধে দিলেন। তারপর বলে গেলেন ওটি যেন সে আজ না খোলে, কাল সকালে খোলে। গুরুর আজ্ঞায় ওগুলি ডবল হয়ে যাবে। সকালে হাঁড়ি খুলে দেখল কালো বীজ ছাড়া আর কিছু তাতে নেই।

একজন যোগী এসে কালনাগের ফণাটি মুখ থেকে বের করে বলল যে, এই নাগ তাকে পরশু এসে দংশন করবে। কুমারী খুরশিদ কান থেকে দুল খুলে তাকে দিল যাতে সে এ বিপদ থেকে রক্ষা পায়।

খুর্‌শিদ কখনো রাগ করত না। এরকম শুদ্ধ মন আর মেজাজ বেশ্যাদের মধ্যে তো কোন্ ছার ভদ্রঘরের বউ-বেটিদের মধ্যেও কম দেখা যায়।

কিন্তু হ্যাঁ, একদিন তার রাগ হয়েছিল। সেদিন পিয়ারি সাহেব বিয়ের জোড় পরে এসেছিল। প্রথমে তো সে চুপ করে বসে রইল, তারপর তার মুখের রং আস্তে আস্তে বদলে গিয়ে লাল হয়ে গেল। সে উঠে গিয়ে জোড়টি টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলল। তারপর কান্না শুরু হয়ে গেল। দু'দিন ধরে কাঁদল। সকলে মিলে তাকে বোঝালেও সে মানেনি। শেষে জ্বর আসতে লাগল। দুমাস অসুখে ভুগে দেনদারীর মধ্যে পড়ে গেল। হেকিম নির্ণয় করলেন ক্ষয় রোগ। কিন্তু খোদার দোয়ায় দুমাস পরে নিজের থেকেই রোগটি ভালো হয়ে গেল। এরপর পিয়ারি সাহেবের সাথে ঝগড়াঝাঁটি হয়ে গেল। এখন থেকে অন্য লোক তার কাছে আসত, কিন্তু সে আর কাউকেই ভালবাসতে পারেনি, আর তাকেও কেউ ভালবাসেনি। কারণ, সে হয়ে উঠেছিল অমনোযোগী আর পেশাদারসুলভ উদাসীন। সে লোকের সংসর্গ পেয়েছিল কিন্তু মনের সংসর্গ পায়নি।

শ্রাবণ মাস। অপরাহ্ন বেলা। বর্ষা থেমে গেছে। চকের বাড়িগুলো আর উঁচু দেয়ালের এখানে-সেখানে রোদ। মেঘের টুকরোর আনাগোনা নজরে পড়ছে। পশ্চিমের দিকে গোধূলির রং দেখা দিচ্ছে। চকে বড়লোকদের আনাগোনা বেড়েই চলেছে। আজ সবচেয়ে বেশি লোক জমা হওয়ার একটি কারণ হলো, আজ শুক্রবার। লোক দ্রুত পায়ে আয়েশবাগের মেলায় চলেছে। খুরশিদ, আমির-জান, বিসমিল্লা আর আমি মেলায় যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছি। রংকররা এখনই গাঢ় সবুজ রং করা দোপাট্টাগুলি দিয়ে গেল, তার মধ্য থেকে বাছাই করা, চুল আঁচড়ানো ও বেণি বাঁধা আর ভারি গয়নাগুলি বাক্স থেকে বের করার কাজ চলেছে। খানুম সাহেবা সামনের খাটের উপর হেলান দিয়ে বসে রয়েছেন। হুসেনি পিসি হুঁকা খানুমের হাতে দিয়ে পিছনে সরে গেলেন। মীর সাহেব খানুমের সামনে বসে তাঁকে মেলায় যাওয়ার জন্য জিদ করতে লাগলেন। কিন্তু খানুম বলতে থাকলেন, তাঁর শরীর খারাপ, তিনি যাবেন না। আমরা আল্লার কাছে দোয়া মাংতে থাকলাম, তিনি যেন মেলায় না যান। তাহলে আমাদের খুব মজা হবে।

খুরশিদের যৌবন যেন সেদিন উপচে উঠছে। চাঁপা রংটি সবুজ দোপাট্টার ভিতর দিয়ে ফুটে বেরোচ্ছে। গ্রান্টের পায়জামা। পায়ের রূপ যেন সামলানো যাচ্ছে না। ফ্যান্সি শার্ট, হাতে গলায় পাতলা গয়না, নাকে হীরের নাকছাবি, কানে সোনার দুল, হাতে বালা, গলায় মোতির কণ্ঠি, সুমুখের ঘরে আপাদমস্তক দেখা যায় এমন লম্বা টাঙানো আয়নায় সে নিজের চেহারা দেখছে। সে অপরূপ রূপের কথা কী আর বলব! আমার চেহারাখানি যদি ঐরকম হত তবে নিজেই নিজের প্রতিবিম্ব থেকে চোখ ফিরিয়ে নিতাম। যাতে অমঙ্গল না হয়। শুর

কিন্তু বড় দুঃখ এই যে, ওর রূপ দেখার মতো কেউ নেই। পিয়ারি সাহেবের সাথে তার প্রেম চুকে গেছে। চেহারাটি তার উদাস-উদাস। কিন্তু এই উদাস ভাবটিও এক বিস্ময় সৃষ্টি করে। চেহারা যাদের সুন্দর তাদের সবকিছুই সুন্দর মনে হয়। এই সময়ে এই মুখের সৌন্দর্য দেখে মন কানায় কানায় ভরে ওঠে। মনের অবস্থার আর কোনো উপমা স্মৃতিতে আসছে না। শুধু এইটি মনে হচ্ছিল, যেন কোনো বড় কবির দুঃখের কবিতা শুনে তার রেশ রণিতে হচ্ছে আর মন তাতেই মজা

বিসমিল্লার চেহারা এমনিতেই খারাপ নয়। খোলতাই শ্যামল রং, ছিপছিপে বেঁটে চেহারা, খাড়া নাক, কালো ও পাতলা, বড় বড় চোখ, লম্বা পাতলা মুখ। তার পরনে ধারের কাছে এমব্রয়ডারি করা পোশাক, কিনারে কারুকার্য করা গাঢ় সবুজ দোপাট্টা, হলুদ রংয়ের গ্রাণ্টের পায়জামা। সে আপাদমস্তক দামী গহনায় সজ্জিত। তার উপর সবুজ ফুলের গহনা। প্রকৃতপক্ষে তাকে বিয়ের চারদিন পরে মুসলমানী প্রথানুযায়ী অনুষ্ঠান সম্পন্ন করার সময়কার কন্যা বলে মনে হচ্ছিল। তার উপর আবার কথায়-কথায় দুষ্টুমি ও প্রগলভতা। মেলায় গিয়ে কারো-বা থুতনি তুলে ধরল, কাউকেও-বা চোখ টিপতে থাকল। লোকটি যদি ওকে তখন দেখতে থাকে, ও মুখ ফিরিয়ে নেয়। হ্যাঁ, বলতে ভুলে গেছি, আমরা প্রসাধন সেরে পালকি চড়ে মেলায় গেলাম।

মেলায় এত ভিড় যে যদি তুমি একখানি থালা ছুঁড়ে দাও তো সেটি মাটিতে না পড়ে লোকের মাথায় মাথায় সরতে থাকবে। এদিকে-সেদিকে খেলনা আর মিঠাইয়ের দোকান, বারকোশ আর ফলের দোকান, পানওয়ালী, তামাকুওয়ালী, মতলব হাসিল-করনেওয়ালা, মেলায় যা-কিছু থাকে তার সবই ছিল। অন্য কিছুতে আমার আগ্রহ ছিল না, বরাবরের আগ্রহ ছিল লোকের মুখের ভাবভঙ্গি দেখা, বিশেষ করে মেলায় আমোদ-প্রমোদের জায়গায় খুশি না অখুশি, ধনী না দেউলে, বেওকুব না বুদ্ধিমান, জ্ঞানী না মূর্খ, সাধু না পাপী, দাতা না কৃপণ — এসব চেহারায় প্রকাশ পায়। এক সাহেবকে দেখলাম, মসলিনের ঝোলানো কোট, লাল জ্যাকেট, ছুঁচলো টুপি, চোস্ত পায়জামা আর মখমলের জুতো পরে অঙ্গভঙ্গি করে ঘুরছেন। এক সাহেব পাতলা রংয়ের দোপাট্টা মাথায় জড়িয়ে বেশ্যাদের পিছনে পিছনে ঘোরাফেরা করছেন। এক সাহেব তো এসেছেন মেলা দেখতে, কিন্তু বড়ই বিমর্ষ, ভ্রূ কুঁচকে রয়েছেন, নিচুস্বরে কী বিড়বিড় করতে করতে যাচ্ছেন। মনে হলো, ঘরে বিবির সাথে ঝগড়া করে এসেছেন। যেসব কথার জবাব সে-সময়ে দিতে পারেননি সেগুলি তখন মনে করে নিচ্ছেন। কোনো এক সাহেব নিজের ছোট মেয়ের আঙুল ধরে কথাবার্তা বলতে বলতে চলেছেন, তাঁর প্রত্যেক কথায় আসছে মায়ের নাম — মা ভাত রাঁধছেন, হয়ত মার মন ভালো নেই, মা হয়ত শুয়ে আছেন, মা হয়ত জেগে

রয়েছেন, বেশি দুষ্টুমি করো না, মা ডাক্তারের ওখানে চলে যাবেন। এক সাহেব সাত-আট বছরের একটি মেয়েকে লাল কাপড় পরিয়ে কাঁধে চড়িয়ে নিয়ে এসেছেন। তার নাকে ছোট্ট নথনি, চুল বাঁধা উঁচু ঝুঁটি করে। মাথায় শালকরের লাল চুলের ফিতে।

মেয়েটির হাতে রুপোর চুড়ি। বাচ্চাটির দুটি হাতই জোর করে ধরে রেখেছেন, পাছে কেউ হাত থেকে চুড়ি দুটি খুলে নিয়ে যায়। বলুন তো, গয়না পরারই-বা কী দরকার ছিল!

নিন, আরেকজন সাহেব বিশ্বস্ত বন্ধুকে সাথে নিয়ে এসেছেন, 'মা, পান খাওয়াও' বলে পয়সা পানওয়ালীর দোকানে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। যেন মস্ত বড় এক ধনী ব্যক্তি এসেছেন, একটি-দুটি পয়সার কি দাম তাঁর কাছে! তক্ষুনি আবার হুঁকোওয়ালাকে ডাকলেন, ভাই সাকি, এদিকে এসো তো, তামাকে আগুন ধরিয়েছ তো? আরেকজন তার বন্ধু এসে জুটেছেন। মামুলী গালি-গালাজ করার পর কথাবার্তা। বন্ধুদের মধ্যে কুশল প্রশ্নাদির বিনিময় হলো। 'ওহে পান তো খাওয়াও', এর মানে হলো, বক্তা মুসলমান আর সে হিন্দু। পানওয়ালী পান দিলে সে ঝট্ করে পানটি নিয়ে বলল, আরে ইয়ার, ভুল হয়ে গেছে। হিন্দু বন্ধুটি অপ্রস্তুত হয়ে গিয়ে ট্যাঁক থেকে একটি পয়সা বের করলেন, 'নাও ভাই, আমাকেও দাও, পানে এলাচ দেবে আর চুন কম করে দেবে। (বন্ধুকে) নাও তামাক তো খাওয়াবে'।

সে হুঁকোর মাথা থেকে কলকেটি নামিয়েই নিচ্ছিল, সাকি কটমট করে তাকাতেই হাত থেকে হুঁকো ও পকেট থেকে পয়সা দিতে হলো।

গৌহর মির্জা মর্তিঝলের পাড়ে ফরাস পেতে দিয়েছিল। সেখানে গিয়েই আমরা থামলাম। এধার-ওধার গাছগুলির মধ্যে ঘুরতে লাগলাম সন্ধ্যে হতে-না হতেই। রাত দুটো পর্যন্ত মেলায় ঘুরে বেড়ালাম, এবার ঘরে ফিরব। সবাই নিজের নিজের পালকিতে চড়লাম। এবার দেখা গেল, খুরশিদের পালকিটি খালি। কোথাও তার সন্ধান পাওয়া গেল না। শেষে হতাশ হয়ে ঘরে ফিরতে হলো। খানুম শুনেই সবাইকে ডাকলেন। সব ঘরেই শোক চলতে লাগল। আমি নিজেই সারা রাত কেঁদেছিলাম। পিয়ারি সাহেবের বাড়ি লোক গেল। সে বেচারী এই সময় ছুটে এল। হাজারবার শপথ কাটলেন, 'আমার একেবারেই কিছু জানা নেই। আমি মেলাতেও যাইনি। স্ত্রীর শরীর খুব খারাপ, তাই কী করে যাব?' সে পিয়ারি সাহেবের বাড়ি গিয়েছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছিল। তাঁর শপথের পর আর কারো সন্দেহ রইল না। ব্যাপারটি এই যে ওঁর বিয়ে হওয়ার পর স্ত্রীর এমনই বশীভূত হয়ে পড়েছিলেন যে তিনি চকে যাওয়া-আসা একদম বন্ধ করে দিয়েছিলেন। রাতে ঘর থেকে বেরোতেন না। খুরশিদের গুম হওয়ার খবর শুনেই কিছুটা পুরনো ভালবাসার খাতিরে

আর কিছুটা খানুমের প্রতি সৌজন্যের দরুন, জানিনে ঠিক কী জন্যে, তিনি চলে এসেছেন।

খুরশিদ গুম হবার দেড় মাস পরে শ্যামলা রঙ, লম্বা শরীর এক সাহেব কামরায় ঢুকে পড়েই উলের কার্পেটের ধারে বসে পড়লেন। তাঁর কোমরে জড়ানো একখানি চাদর আর মাথায় বাঁধা আরেকটি চাদর। তার চালচলনটি শহরের গুণ্ডা-বদমায়েশদের মতো। তাই আমার মনে হলো, তাঁর স্বভাবে যেন কিছুটা দুর্বৃত্তপনা বা নিষ্ঠুরতা ছিল। গাঁড়িবাড়ি তাঁর আসা ঘটেছে কম। এই সময়ে আমি একলাটি বসেছিলাম। হুসেনি পিসিকে ডাকলাম। তিনি ঘরে ঢুকতেই ওই সাহেবটি উঠে দাঁড়িয়ে অনায়াসেই তাঁর হাত ধরে পৃথক জায়গায় টেনে নিয়ে গেলেন আর কিছু কথাবার্তা বললেন। তার কিছুটা আমি শুনতে পেলাম আর কিছুটা পেলাম না। এরপর হুসেনি পিসি খানুমের ঘরে গেলেন আর সেখান থেকে ফিরে এসে আবার তাঁর সাথে কথাবার্তা বললেন। শেষ অবধি স্থির হলো যে, ওই সাহেবকে এক মাসের টাকা আগাম দিতে হবে। এই সাহেবটি কোমর থেকে টাকা বের করে হুসেনি পিসির আঁচলে তখনই ছুঁড়ে ফেলে দিলেন।

হুসেনি পিসি : কত টাকা ?

সাহেবটি : জানিনে, গুনে নিন।

হুসেনি পিসি : আমি হতভাগিনী গুনতেও জানিনে !

সাহেবটি : আমি তো জানি পঁচাত্তর টাকা। হয়ত-বা এক-দু টাকা কম-বেশি হবে।

হুসেনি পিসি : মিঞা, পঁচাত্তর কাকে বলে ?

সাহেবটি : তিন কুড়ি আর পনের। পঁচিশ কম একশ।

হুসেনি পিসি : পঁচিশ কম শ' ? তো কত দিনের টাকা এটা ?

সাহেবটি : পনের দিনের। কাল ঐ পনের দিনের টাকাও দিয়ে দেব। চুক্তি-মত পুরো দেড়শ টাকাই আপনাকে দেয়া হবে।

এই লেন-দেনের কথা শুনে আমার খুব খারাপ লাগল। এখন পুরোপুরি বিশ্বাস হয়ে গেল যে, লোকটি সাধারণ লোকই হবেন। কিন্তু একে তো অসহায় এক বেশ্যার পেশা, তারপর অপরের অধীন। আর আমি করলেও-বা কী করতে পারতাম ?

হুসেনি পিসি টাকা নিয়ে খানুমের কাছে গেলেন। এ সময় খানুম কিন্তু, জানিনে ভালমানষির মেজাজে ছিলেন কিনা, চট করে শর্তটি স্বীকার করে নিলেন। আমি তাজ্জব বনে গেলাম। খানুম কিন্তু বড় বড় ধনীদেরও টাকা-পয়সার ব্যাপারে দয়া-দাক্ষিণ্য দেখানো বা একদিনের সময় দেওয়ায় রাজী হতেন না।

এই ব্যাপারটি মিটে যাওয়ার পর লোকটি আমার ঘরেই রাত্রিবাস করলেন। কয়েক ঘণ্টা রাত্রি বাকি আছে এমন সময় আমার যেন এরকম মনে হলো যে, কেউ একজন আমার ঘরের নীচে এসে টোকা দিল। লোকটি তখুনি উঠে বসে বললেন, আমি এখন যাচ্ছি. কাল রাতে আবার আসব। যাওয়ার সময় তিনি আমাকে পাঁচটি স্বর্ণমুদ্রা, আর একটি সোনার, একটি নীলা বসানো, আর একটি হীরের—তিনটি আংটি দিয়ে বললেন, তোমার কাছে রেখে দেবে, খান্নমকে দিও না। আমি খুব খুশি হয়ে হাতে পরে নিজের আঙুলগুলো দেখতে থাকলাম। আমাকে ভারি সুন্দর দেখাচ্ছিল। পরে সিন্দুকটি খুলে চোরা জায়গায় স্বর্ণমুদ্রা আর আংটিগুলো রেখে দিলাম।

দ্বিতীয় দিন রাতে আবার সেই লোকটি এলেন। এসময়ে আমি পাঠ নিচ্ছিলাম। উনি এসে এক ধারে বসলেন। গান হলো। উনি পাঁচ টাকা গাইয়ে-বাজিয়েদের বখশিশ করলেন। ওস্তাদজী আর সারেঙ্গীবাদক খোশামোদের কথা বলতে লাগলেন। ওস্তাদজী তাঁর কোমরে বাঁধা চাদরখানি ঠকিয়ে নেবার চেষ্টা করে মুখ ফিরিয়ে সেইটে চাইলেন। কিন্তু যাচ্ঞা ব্যর্থ হলো। উনি দিলেন না।

সাহেবটি : ওস্তাদজী টাকা-পয়সা বা আর যা কিছু চান দিতে পারি কিন্তু এই শালটি দিতে আমি অপারগ। এখানি একটি বন্ধুর স্মৃতিচিহ্ন।

ওস্তাদজী ব্যর্থ ভিক্ষুকের মতো লজ্জারাঙা মুখ নিয়ে চুপ করে গেলেন।

এরপর শিক্ষা শেষ হলো। উনি হুসেনি পিসিকে পঁচাত্তর টাকা গুনে দিলেন আর তাঁকে আলাদা করে পাঁচ টাকা দিলে তিনি চলে গেলেন। যখন কামরায় আমি আর উনি দুজনে মাত্র ছিলাম তখন তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, আমাকে আপনি কোথায় দেখেছেন যে আমায় পছন্দ করে ফেললেন?

উনি : দুমাস হতে চলল, আয়েশবাগের মেলায়।

আমি : আর এলেন দুমাস পরে!

উনি : আমি বাইরে চলে গিয়েছিলাম, আবার চলে যেতে হবে।

এবার আমি বেশ্যার ছলাকলা শুরু করলাম।

আমি : তা হলে আমাকে ছেড়ে চলে যাবে?

উনি : না, আবার খুব শিগগির ফিরে আসব।

আমি : তোমার বাড়িঘর কোথায়?

উনি : বাড়িঘর তো ফরাক্কাবাদে। কিন্তু সেখানে থাকি খুব কম। বরং আমি এখানেই থাকি। কয়েকদিনের জন্য বাইরে যাই। আবার ফের চলে আসি।

আমি : এই শালটি কার স্মারক?

উনি : কারুরই না।

আমি : ওঃ বুঝেছি, এটি তোমার প্রেমিকার স্মৃতিচিহ্ন।

উনি : না, তোমার মাথার দিব্যি, আমার কোনো প্রেমিকা নেই, যা কিছু তা শুধু তোমার সাথেই আছে।

আমি : তবে এটি আমাকে দাও।

উনি : আমি দিতে অক্ষম।

এ কথাটি আমার কাছে খুব অপ্রীতিকর ঠেকল। এর মধ্যে উনি মুক্তো আর সোনার দানা বসানো মোতির মালা, আর একজোড়া হীরের বালা, সোনার ছুটি আংটি আমার সামনে রেখে দিলেন। এসবই আমি তো বেশ খুশিতেই তুলে নিলাম। সিন্দুক খুলে তার মধ্যে ভরতে লাগলাম। আমি কিন্তু আশ্চর্য হলাম এই ভেবে যে, এই হাজার হাজার টাকার জিনিসগুলি উনি আমাকে এমনিতেই দিলেন। কিন্তু এই শালখানি, যার দাম বড়জোর পাঁচশ, আমাকে দিতে কেবলই অস্বীকার করতে থাকলেন। প্রকৃতপক্ষে, যে-শালখানির জন্য আমি জিদ করছিলাম তা আমার আদৌ পছন্দ ছিল না। আমার কাজ নিয়েই কথা।

এই সাহেবটির নাম ফয়েজ আলি কখনো-বা এক প্রহর দেড় প্রহর রাতে আসতেন আবার কখনো-বা মাঝ রাতে অথবা রাতের শেষ প্রহরে উঠে চলে যেতেন। এক মাস দেড় মাসের মধ্যে কয়েকবার আমি দরজায় টোকা অথবা বাঁশির আওয়াজ শুনি আর ফয়েজ আলি তখনই উঠে চলে যান। ফয়েজ আলির সাথে এই ধরনের ব্যবস্থা হওয়ার মাস দেড়েকের মধ্যেই আমার সিন্দুক সোনাদানা আর দামী পাথরের গয়নায় ভরে গেল। স্বর্ণমুদ্রা আর টাকা তো ছিল অগুনতি। আমার কাছে হুসেনি পিসি আর খানুমের কাছ থেকে লুকানো দশ-বারো হাজার টাকার মাল জমে গিয়েছিল।

ফয়েজ আলির সাথে যদি আমার ভালবাসা না-ও থেকে থাকে তো ঘৃণাও ছিল না। আর ঘৃণা হওয়ার কারণই-বা কী ছিল। একে তো ওঁর চেহারাটি মন্দ ছিল না। দ্বিতীয়ত লেন-দেন ছিল অদ্ভুত ধরনের। সত্যি বলছি, যতক্ষণ পর্যন্ত উনি না আসতেন আমি দরজার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতাম। গৌহর মির্জার যাওয়া-আসাটা ইদানীং কেবলমাত্র দিনের বেলায় হত। রাতের অতিথিরাও প্রায় সকলেই বুঝে গিয়েছিলেন যে আমি কারো কিছু একটা বাঁধা-ধরার মধ্যে পড়ে গেছি. এই জন্য লোকে সন্ধ্যেবেলাতেই চুপিচুপি সরে পড়ত। আর রাতের বেলায় যাঁরা বসতেন তাঁদের কোনো-না কোনো অছিলায় ফিরিয়ে দিতাম। খুরশিদের অনেক খোঁজ করা হলো। কিন্তু কোনো সন্ধানই পাওয়া গেল না। ইতিমধ্যে ফয়েজ আলির আমার উপর খুব ভালবাসা হলো। আর তা প্রকাশ পাচ্ছিল ক্রমে ক্রমে। যদি আমার মন এর আগেই গৌহর মির্জার দিকে না যেত তবে আমি অবশ্যই ফয়েজ আলিকে ভালবাসতাম আর তাকে আমার মন দিতাম। আমিও ওকে সন্তুষ্ট রাখতে আর সোহাগ জানাতে এতটুকু কম করিনি। আমি ফয়েজ আলিকে ধোঁকা দিয়ে রেখেছিলাম যে তার উপরই আমার ভালবাসা আছে,

আর সেও বেচারা এই জালে ফেঁসে গেল। ও গোপনে আমাকে যা কিছু দিত কেউ তা জানতে পারত না। খানুম আর হুসেনি পিসির কথামত আমাকে ওদের জন্য কিছু চাইতে হত। উনিও তা দেওয়া পবিত্র কর্তব্য বলে মনে করতেন, কেননা টাকা-পয়সা তাঁর কাছে কিছুই না। এরকম উদার হৃদয়, না-ধনী না-বাদশা ভাব, কারো মধ্যেই দেখিনি।

রুশোয়া : জি হ্যাঁ, কেন হবে না ? মাল বিনা-পয়সার আর মনটি নিষ্ঠুর।

উমরাও : মাল বিনা-পয়সার কিরকম ?

রুশোয়া : নইলে কি আর তার মায়ের গয়না খুলে নিয়ে আসত ?

উমরাও : আমি তার কি জানি !

১০

রাতের অতিথিদের মধ্যে একজন ছিলেন পান্নামল চৌধুরী। ঘণ্টাখানেক ঘণ্টাদেড়েক বসে চলে যেতেন। সবার সাথে বসতে তাঁর কোনো আপত্তি ছিল না যদি কিনা তাঁকে বিশেষ যত্ন খাতির করা হয়। আর এটি হলে কারো আনা-গোনায়ও তাঁর কোনো মাথাব্যথা ছিল না। তাঁর সাথে মাসে দুশ টাকা দেবার কথা হয়। এ ছাড়াও যদৃচ্ছ উপঢৌকন। ফয়েজ আলির সাথে সাক্ষাতের দিন-গুলিতে এঁরও আসা-যাওয়া কম হয়ে এসেছিল। আগে যেখানে ইনি রোজই আসতেন, এখন দুই বা তিন দিন অন্তর আসতে শুরু করলেন। একবার দিন-পনের ডুব মারলেন। এবার যখন এলেন তাঁর ভাবটি উদাস-উদাস, সাধারণ কথাবার্তার জবাব দিয়েই চুপ হয়ে যান।

পান্নামল : তুমি কি কিছু শোননি ?

আমি : কি ?

পান্নামল : আমি তো সর্বস্বান্ত হয়ে গেছি। বাড়িতে চুরি হয়ে গেছে। পূর্ব-পুরুষদের ধনসম্পত্তি সব চলে গেছে।

আমি : (চমকে উঠে) হায় ! চুরি হয়ে গেল ? কত টাকার জিনিস গেল ?

পান্নামল : সর্বস্ব চুরি হয়েছে। বাকি আর কী রয়েছে ? দু লাখ টাকার গয়না গেছে।

এঁর বাবা ছান্নামল তো ক্রোড়পতি বলে খ্যাত ছিলেন. এই কথা ভেবে মনে মনে হেসেছি। সন্দেহ নেই যে দু লাখ বেশ একটি বড় অঙ্ক। কিন্তু ওঁর কাছে এ আর কী। বাইরে দুঃখের ভান করে খুব আফসোস করলাম।

পান্নামল : জি হ্যাঁ, আজকাল শহরে অনেক চুরি হচ্ছে। বেগম মালিকা আলমের ওখানে চুরি হয়েছে। চুরি হয়েছে লালা হরপ্রসাদের বাড়িতেও। অরাজকতা চলছে, শুনছি বাইরের থেকে চোর এসেছে। মির্জাআলি বেগ হয়রান হয়ে যাচ্ছেন। শহরের সব দাগী চোরদের থানায় তলব করা হয়। কিন্তু কারো কাছে কোনো পাত্তা পাওয়া যায়নি। ওরা সব কান ধরে বলেছে, তারা এসব কাজ করেনি। পান্নামল আসার দুদিন পরে আমি আমার নিজের ঘরে বসে চর্কে একটি গোলমালের আওয়াজ শুনি। আমিও জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়ালাম। দেখি যে জনতার একটি জটলা।

জনৈক : শেষপর্যন্ত ধরা পড়েছে, না ?

দ্বিতীয় : আহ, মির্জা কী আর বলব, কোতোয়াল হলে এই রকমই হতে হয়।

তৃতীয় : ভাই, মালের কিছু সন্ধান মিলেছে?

চতুর্থ : অনেক কিছুই পাওয়া গেছে। কিন্তু এখনো অনেক বাকি।

পঞ্চম : ফৈজু মিঞাও কি গ্রেপ্তার হয়েছে?

ষষ্ঠ : ও আসছে কে?

আমি নিজের চোখে দেখলাম ফৈজু বন্দী অবস্থায় আসছে, সিপাহীরা পাহারায় রয়েছে। বহু লোকের ভিড়। ফৈজু মিঞার মুখ কাপড় দিয়ে ঢাকা। তাকে দেখা যাচ্ছে না। দুপুরের আগের ঘটনা এটি।

হিসেবমতই ফয়েজ আলি রাতের কয়েক প্রহর বাদে এসে হাজির হলো। ঘরে আমি আর সে। এসেই সে বলল, আজ বাইরে যাচ্ছি, পরশু আসব। দেখ, উমরাওজান তোমাকে আমি যা-কিছু দিয়েছি, সেগুলি যেন কাউকে বলো না। হুসেনি পিসিকে দিও না। খানুমকেও দেখিও না। তোমার কাজে লাগবে। পরশু আমি নিশ্চয়ই আসব। আচ্ছা, বলোত আমার সাথে কয়েক দিনের জন্য বাইরে যেতে পারবে?

আমি : তুমি তো জানই আমি পরাধীন, খানুম সাহেবাকে তুমি বলো। উনি রাজি হলে আমার আর অসুবিধা কি!

ফয়েজ আলি : সত্যি কথা এই যে, তোমরা বড়ই অকৃতজ্ঞ। আমি তোমার জন্য প্রাণ দিচ্ছি, আর তুমি এই রকম শুকনো জবাব দিলে। বেশ, হুসেনি পিসিকেই বলব।

আমি হুসেনি পিসিকে ডাকলাম। তিনি এলেন।

ফয়েজ আলি : (আমাকে ইশারায় দেখিয়ে) কিছু দিনের জন্য বাইরে যেতে পারে?

হুসেনি : কোথায়?

ফয়েজ আলি : ফরাক্কাবাদ। আমার সেখানে জমিদারি আছে। উপস্থিত আমি দু মাসের জন্য যাচ্ছি। খানুম সাহেবা প্রার্থনা মঞ্জুর করলে দুমাসের টাকা আগাম দিচ্ছি। তা ছাড়া আর যা-কিছু বলবেন আমি দিতে তৈরি।

হুসেনি পিসি : আমার তো বিশ্বাস হয় না, খানুম রাজি হবেন।

ফয়েজ আলি : আচ্ছা, তুমি জিজ্ঞেস তো কর।

হুসেনি পিসি খানুমের কাছে গেলেন। খানুমের কাছে হুসেনি পিসিকে পাঠানো নিরর্থক, কেননা, আমার বিশ্বাস যে তিনি কখনই এতে রাজি হবেন না।

ফয়েজ আলি আমার সাথে আলোচনা করেছিল যে, আমি আমার নিজের বশে থাকলে আমার ওর সাথে যাওয়ার কোনো প্রতিবন্ধক নেই। আমি ভাবছিলাম যে আমার ঘরে বসে, যে আমাকে এত দিয়েছে দেশে গেলে সে আমাকে ঐশ্বর্যে ডুবিয়ে দেবে। এইরকম যখন ভাবছি সে-সময়ে হুসেনি পিসি এসে পরিষ্কার

জবাব দিলেন যে আমার পক্ষে কোনো রকমেই বাইরে যাওয়া সম্ভব নয়।

ফয়েজ আলি : দুগুণ টাকা দেব।

হুসেনি পিসি : চতুর্গুণ টাকা দিলেও নয়, আমরা বাইরে যেতে দিইনে।

ফয়েজ আলি : বেশ, যাক্‌গে।

হুসেনি পিসি চলে গেলেন। দেখলাম ফয়েজ আলির চোখ দিয়ে টপ-টপ করে জল পড়ছে। এই অবস্থা দেখে আমার খুবই কষ্ট হলো।

প্রিয়তমার এই অকৃতজ্ঞতার কথা গল্পে উপন্যাসে যখন শুনতাম তখন আমার খুব আফসোস হত, খুব খারাপ মনে করতাম। আমার মনে হলো, আমি যদি এর সঙ্গ না নিই তবে আমার অকৃতজ্ঞতায় আর উপকার ভুলে যাওয়ায় কোনো সন্দেহ থাকবে না।

আমি মনে মনে স্থির করলাম, নিশ্চয়ই লোকটির সঙ্গ নেব।

আমি : বেশ, আমি যাব।

ফয়েজ আলি : যাবে?

আমি : হ্যাঁ, কেউ যেতে দিক আর না-ই দিক আমি যাব।

ফয়েজ আলি : কী করে?

আমি : পালিয়ে।

ফয়েজ আলি : বেশ, পরশু রাতে আমি আসব। প্রহরখানেক রাত থাকতে তোমাকে নিয়ে চলে যাব। দেখো, ব্যথা দিও না। তাহলে ভালো হবে না।

আমি : আমি নিজের খুশিমতই চলে যাওয়ার কথা বলছি। আর তোমাকে কথা দিয়েছি। আমার প্রতিশ্রুতিটি দেখ।

ফয়েজ আলি : খুব ভালো কথা। দেখা যাবে।

এই রাতে ফয়েজ আলি দেড় প্রহর রাত থাকতে আমার কাছ থেকে উঠে চলে গেল। সে চলে যাওয়ার পর আমি মনে মনে চিন্তা করতে লাগলাম, প্রতিশ্রুতি তো দিলাম, দেখি যাই কি না-যাই।

ফয়েজ আলির ভালবাসা আর আমার প্রতিশ্রুতির কথা মনে করলে মন বলে যাওয়া উচিত কিন্তু কেউ যেন নিষেধ করছিল যেয়ো না। খোদা জানেন কী হবে।

এই রকম দুশ্চিন্তায় সকাল হয়ে গেল। কিন্তু কিছুই মীমাংসা করা গেল না। সারাটি দিন এই চিন্তাই মনে রইল। ঘটনাক্রমে রাতে কেউ আমার কাছে আসেনি। ঘরে একলাটি ভাবনা-চিন্তা করছিলাম। শেষ অবধি ঘুম এসে গেল। সকালের দিকে বেলা একটু বেড়ে যাওয়া অবধি শুয়ে রইলাম। কিছু সময় ঘুমানোর পর গৌহর মির্জা ঝাঁকি দিয়ে আমাকে উঠিয়ে দিল। আমার খুব খারাপ লাগল। সারাটি দিন নেশার ঘোরের মতো ঝিমুনিতে কাটল। মনে নেই হুসেনি পিসির কোন্ কথায় জড়িয়ে পড়েছিলাম....হ্যাঁ, খুব মনে পড়েছে। কথাটি

এই যে, কোথাও বাইরে থেকে মুজরো এসেছিল। হুসেনি পিসি আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, যাবে? আমার মাথার যন্ত্রণা হচ্ছিল। আমি একেবারে অস্বীকার করলাম। হুসেনি পিসি বললেন, বাঃ যখন-তখন অস্বীকার করছ! এই পেশায় এসে শেষঅবধি করবে কী? আমি বললাম, আমি যাব না। হুসেনি পিসি বললেন, না, যেতে হবে। তোমাকেই তারা বিশেষ করে বায়না করেছে। আর খানুমও কথা দিয়েছেন, টাকাও নিয়েছেন। আমি বললাম, পিসি, আমি যাব না, টাকা ফেরত দাও।

হুসেনি পিসি : ভালো, তুমি তো জান, খানুম টাকা নিয়ে কখনও ফেরত দেন না।

আমি : কারো শরীর ভালো থাকুক চাই না-থাকুক, তবুও হবে না। খানুম সাহেব যদি টাকাটা না-ই ফেরত দেন তো আমি আমার নিজের টাকা থেকে দেব।

হুসেনি পিসি : আহা! এখন তুমি বড় টাকাউলি হয়ে উঠেছ বুঝি! দাও, ফেরত দাও।

আমি : কত টাকা?

হুসেনি পিসি : একশ টাকা।

আমি : একশ টাকা নেবে, না কারো প্রাণ নেবে?

হুসেনি পিসিরও এই দিন, খোদা জানেন, কোথাকার জিদ চড়ে গেল।

হুসেনি পিসি : এতই ভালো যখন তখন দিয়ে দাও।

আমি : সন্ধ্যেবেলায় দিয়ে দেব।

হুসেনি পিসি : ওখানে বাইরের লোকটি বসে আছে। সে সন্ধ্যে পর্যন্ত অপেক্ষা করবে কেন?

হুসেনি পিসি মনে মনে ভাবছিলেন, ওর কাছে টাকা এল কোথা থেকে। এ অবস্থায় রাগ দেখালে আমি নাচার, রাজি হয়ে যাব। এ সময়ে আমার সিন্দুকে কিছু না থাকলেও হাজার দেড়হাজার স্বর্ণমুদ্রা ছিল। গয়নার তো কথাই নেই; কিন্তু সে সময়ে হুসেনি পিসির সামনে সিন্দুক খোলা পছন্দ করিনি।

আমি : যাও, ঘণ্টাখানেক বাদে এসে নিয়ে যেও।

হুসেনি পিসি : ঘণ্টাখানেক বাদে কি কোনো মুরুব্বি এসে দিয়ে যাবে?

আমি : হ্যাঁ, দিয়ে যাবে। যাও বাবা, এ সময়ে আমাকে আর কষ্ট দিও না। আমার শরীর খারাপ।

হুসেনি পিসি : আচ্ছা, বলোত মেয়ে, কী হয়েছে?

আমি : আমার জ্বরের মতো শরীরে তাপ উঠেছে। আর মাথায় ভয়ানক যন্ত্রণা হচ্ছে।

হুসেনি পিসি : (মাথায় হাত দিয়ে দেখে) হ্যাঁ, সত্যি তো, শরীর ফ্যাকাসে

হয়ে গেছে! কিন্তু মুজরোয় তো যেতে হবে পরশু। খোদা না করুন, তখনো কি শরীরের এই অবস্থা থাকবে? টাকা কেন ফেরত যাবে?

এ কথার জবাব দেবার আগেই চট করে উঠে পড়ে হুসেনি পিসি চলে গেলেন। এই জবরদস্তিতে আমার মনে কুচিন্তা এল। মন বলল বাঃ, এইসব লোকের যদি আমার রোগ-শোকের ব্যাপারে কোনো চিন্তা না থাকে তবে এদের সাথে থাকা নিরর্থক।

রুশোয়া: আগে কখনো এ-চিন্তা আপনার মনে এসেছে?

উমরাও: কখ্খনো না। কিন্তু আপনি এ-কথা জিজ্ঞেস করছেন কেন?

রুশোয়া: এই জন্য যে, ফয়েজ আলি আপনাকে সাহায্য করায় আপনার মনে এই চিন্তা এসেছিল।

উমরাও: এ তো সিধে কথা।

রুশোয়া: কথা তো সিধে কিন্তু এর মধ্যে একটু 'কিন্তু' আছে।

উমরাও: সে 'কিন্তু'টি কী? খোদার দোহাই, জলদি বলুন।

রুশোয়া: ফয়েজ আলির সাথে বেরিয়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়ার আগেই আপনার মনস্থির করে ফেলেছিলেন। তখন কেবল একটি বাহানা মনে মনে খুঁজছিলেন যে, কী করে বেরিয়ে যাবেন।

উমরাও: না একথা ঠিক নয়। আমি দোমনা ছিলাম, যাব কি যাব না। গৌহর মির্জার অসময়ে বিরক্ত করা আর হুসেনি পিসির জবরদস্তির ফলেই আমি যাওয়া স্থির করি। বরং এর আগে পর্যন্ত এই রকমই একটি মনোভাব ছিল। রাতে যখন ফয়েজ আলি এসেছিলেন তখন তাঁর চেহারা আর তৎপরতা দেখে পাকা সিদ্ধান্ত করলাম।

রুশোয়া: জি, না। গৌহর মির্জার বিরক্ত করা আর হুসেনি পিসির জিদ ধরার জন্যই মন সঙ্কল্পবদ্ধ হয়ে গিয়েছিল, এসব তো মামুলী কথাবার্তা মাত্র। আকছার এরকম ঘটে থাকে।

উমরাও: মানলাম এই রকমই হবে। কিন্তু বারণ করার ছিল কে? সত্যি বলছি যেতে যেতে কেউ যেন আমার কানে কানে বলছিল, উমরাও যেয়ো না, কথা শোনো। যে-সময়ে দু-তিন ধাপ সিঁড়ি নামছি সে-সময়েও যেন কেউ আমার হাত ধরে টেনেছে, যেন না যাই। কিন্তু আমি মানিনি।

রুশোয়া: এটি থামিয়ে দিতে চেয়েছিলেন একজন জবরদস্ত লোক। তাঁর হুকুম না মানায় আপনাকে ভুগতে হয়েছে।

উমরাও: আচ্ছা, বুঝলাম, এটি সেই জিনিস যা ভালো কাজে পরিচালিত করে আর খারাপ কাজ থেকে নিবৃত্ত করে।

রুশোয়া: জি, না। এটি তা নয়। খানুমের বাড়িতে থাকাটাই-বা কী ভালো কাজ ছিল?

আপনার কথায় বোঝা যাচ্ছে, আপনি অপকর্মগুলিকে সর্বদাই পাপ বলে মনে করছিলেন। কিন্তু আপনাকে এসব করতে বাধ্য করছিল। খানুমের বাড়িতে থাকার চেয়ে এক ব্যক্তির সঙ্গে থেকে তার আওতায় থাকা অনেক ভালো ছিল।

কথাটি হচ্ছে এই যে, ফয়েজ আলির সুন্দর ব্যবহারটিই আপনাকে ওর সাথে বেরিয়ে যেতে উৎসাহ যুগিয়েছিল। মুখ ও হাবভাব দেখে চরিত্র নির্ণয় করার আগ্রহ তার এইটিতে কিছু দক্ষ হয়ে যাওয়ায় আপনি বেশ ভালো একজন মনুষ্য-বিশেষজ্ঞ হয়ে গিয়েছিলেন।

আয়েশবাগের মেলায় লোকজনের চেহারা দেখার অবস্থাটি আমি খুব আগ্রহের সাথে শুনেছিলাম। ফয়েজ আলির কলাকৌশল আপনাকে বিশেষ প্রভাবিত করেনি, কিন্তু তার চেহারা আর গুণ, আর চলন-বলন দেখে আপনার মন সতর্ক হয়ে গিয়েছিল যে, এর সাথে গেলে কোনো-না কোনো বিপদের আশঙ্কা আছে। কিন্তু ওর ধোঁকাবাজির কথায় আর টাকার লালসায় আপনি চোখ বুঁজে ছিলেন। আফসোস, আপনি যদি ঠিকমত মনুষ্য-বিশেষজ্ঞ হতেন তো ওর জালে পড়তেন না।

উমরাও : কোনো বইয়ের নাম বলুন, আমি পড়ব।

চকে খানুমের বাড়িটি ছিল বেশ নিরাপদ জায়গায়। পশ্চিম দিকে বাজার, উত্তর ও দক্ষিণ দিকে প্রখ্যাত বেশ্যাদের কামরা। একদিকে বিবিজান আর অন্যদিকে হুসেন বাঁদীর ঘর।

পিছনে হুসেন আলি সাহেবের বৈঠকখানা। উদ্দেশ্য হলো কোনোদিক থেকে চোরের যেন কোনো সহায়তা না হয়। তার উপর তিনটি রাতের পাহারাদার নিযুক্ত। এরা সারারাত বাড়ির ছাদে ছাদে ঘুরে পাহারা দেয়। যখন থেকে ফয়েজ আলির যাতায়াত শুরু হয়, মকা পাহারাদার আমার ঘরে বিশেষভাবে পাহারাদারী করার জন্য নিযুক্ত হয়। ফয়েজ আলি একটু বেশি রাতে আসত আর শেষ রাতে চলে যেত, তাই সে-সময়ে দরজায় কুলুপ দেবার জন্যে এই নিয়োগ করা হয়।

পূর্বের প্রতিশ্রুতিমত ফয়েজ আলি এসেছিল কিছু সময় পর্যন্ত চুপিচুপি বেরিয়ে যাওয়ার পরামর্শ করা হলো। এমনি সময়ে মকা হাই তুলল। মনে হলো সে জেগে আছে। ফয়েজ আলি তাকে কামরায় ডাকিয়ে বললেন, একটা বখশিশ নাও, তোমাকে আমি কিছু দিইনি। দরজা বন্ধ করে যাও। কোনো ভয় নেই, আমি জেগে আছি। মকা সেলাম করে ঘরের বাইরে চলে গেল। ফয়েজ আলি বললেন, নাও, এখন চল। দু-জোড়া কাপড় দিনের বেলাতেই গাঁটরি বেঁধে রেখেছি। গয়নার বাক্সটি আগেই সরিয়ে রেখেছিলাম। গাঁটরি বগলদাবা করে আকবরী দরজার দিকের রাস্তা ধরলাম। গোহাটায় আগের থেকেই গরুর গাড়ি দাঁড় করিয়ে রাখা ছিল। আমরা দুজন সেটিতে উঠে রওনা দিলাম।

দোলন পার্কের শেষপ্রান্তে কিছু দূর গিয়ে ফয়েজ আলির ঘোড়া নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা সহিসের দেখা পাওয়া গেল। সেও গরুর গাড়ির সাথে চলল। ভোর হতে-না হতেই মোহনলালগঞ্জ পৌঁছে গেলাম। এখানে এক সরাইখানায় দুপুর পর্যন্ত থাকলাম। পাচক রান্না করে দিলে আমরা খেয়ে নিলাম।

ঘিয়ের গন্ধ যাতে গেছে বরবাদ
নুন ছাড়া অড়হর দালে নেই স্বাদ।

তৃতীয় দিনে রায়বেরিলিতে পৌঁছলাম। এখানে আমার জন্য কাপড় কিনে ভ্রমণকালোপযোগী পোশাক-আশাক দু-জোড়া বানিয়ে নিলাম। আর লখনৌ থেকে যে কাপড়-চোপড় পরে এসেছিলাম সেগুলি গাঁটরি-বন্দী করলাম। লখনৌ থেকে যে গরুর গাড়ি এসেছিল রায়বেরিলিতে সেটিকে ছেড়ে দিলাম। আরেকটি গাড়ি ভাড়া করে লালগঞ্জের দিকে রওনা হলাম। এই শহরটি রায়বেরিলি থেকে নয়/দশ ক্রোশের মতো দূরে। সন্ধ্যে হতেই সেখানে পৌঁছে গেলাম। সারারাত হোটেলে থাকলাম। ফয়েজ আলি দরকারী জিনিসপত্তর কিনতে বাজারে গেলেন। যে কামরায় আমি ছিলাম তার পাশের ঘরে পাড়াগাঁ থেকে এসেছিল একটি বেশ্যা, তার নাম নসিবন। গয়নাপাতি মানানসই। কাপড়-চোপড়ও ভালো।

সে তো ছিল গেঁয়ো। কিন্তু কথাবার্তা বেশ পরিষ্কার। স্বরটি ছিল শহুরে লোকের মতো। এর সাথে আমার অনেকক্ষণ আলাপ হলো।

নসিবন: আপনি কোত্থেকে আসছেন?

আমি: ফৈজাবাদ থেকে।

নসিবন: ফৈজাবাদে তো আমার বোন পিয়ারন রয়েছে, আপনি নিশ্চয়ই তাকে জানেন।

আমি: (শেষ অবধি ও হয়ত বুঝে ফেলেছে, আমিও একজন বেশ্যা) আমি কি করে জানব?

নসিবন: আমাদের জানে না ফৈজাবাদে এরকম মেয়েছেলে কে আছে?

আমি: অনেক দিন থেকে এঁর সংসারে এসেছি। ইনি লখনৌ থাকেন। এরই জন্য আমি আকছার সেখানে থাকি।

নসিবন: তবুও জন্ম তো তোমার ফৈজাবাদে।

আমি: (এ তো আগাগোড়া সত্যি কথা বলছে, কি এর জবাব দেব আমি) হ্যাঁ, জন্ম তো সেখানে, কিন্তু ছেলেবেলা থেকেই বাইরে।

নসিবন: তা ফৈজাবাদে কাউকে জানো না?

আমি: কাউকেই জানি না।

নসিবন: এখানে এলে কী করে?

আমি: ওনার সঙ্গে।

নসিবন : আর যাবে কোথায় ?

আমি : উনাও।

নসিবন : লখনৌ হয়ে আসছ ?

আমি : হ্যাঁ।

নসিবন : তা সিধে রাস্তা ছেড়ে এই ঘুরপথে কোথায় এসেছ। নবপতগঞ্জ হয়ে রাস্তা উনাও চলে গেছে।

আমি : রায়বেরিলিতে ওনার কিছু কাজ ছিল।

নসিবন : এইজন্য বলছি যে, এদিকের রাস্তা খুব খারাপ। ডাকাতদের দৌরাত্ম্যে এ পথে চলাচল বন্ধ। ছলিয়ার জঙ্গলে বহু যাত্রী লুণ্ঠিত হয়েছে। উনাও যাওয়ার রাস্তা ঐ দিক দিয়েই. তোমরা মাত্র তিনজন তার মধ্যে দুজন পুরুষ একজন স্ত্রীলোক, তোমার গায়ে আবার গয়না ভরা। ওখানে বরযাত্রীরা পর্যন্ত লুণ্ঠিত হয়। তা তোমাদের ব্যাপার কী বলত!

আমি : আমাদের বরাত।

নসিবন : মনটি তো বেশ শক্ত!

আমি : এ ছাড়া আর কী করব ?

এরপর একথা-সেকথা হলো, যার পুনরুক্তি করার প্রয়োজন নেই, আর আমার তা মনেও নেই। হ্যাঁ, আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, তুমি কোথায় যাবে ?

নসিবন : আমি মাঙনে বেরিয়েছি।

আমি : বুঝতে পারলাম না।

নসিবন : মাঙন বুঝলে না ? কিরকম মেয়েছেলে তুমি!

আমি : বোনটি, আমি জানব কেমন করে ? মাঙন তো ভিক্ষে করাকে বলে।

নসিবন : আমার শত্তুর ভিক্ষে করুক। আর সত্যি কথা যদি জিজ্ঞেস কর তো মেয়েছেলেরা ভিক্ষেই তো করে। তা তার বাড়িঘর থাকুক বা না থাকুক।

আমি : তা সত্যিই তো। আমার কিন্তু জানা নেই 'মাঙন' কাকে বলে।

নসিবন : বছরে একবার আমরা গাঁ থেকে বেরিয়ে গ্রামে-গ্রামান্তরে যাই আর ধনী, জমিদার, এঁদের বাড়ি গিয়ে উঠি। যাঁর যেরকম সাধ্য তিনি সেই রকম টাকা-পয়সা দেন। কোথাও মুজরো পাওয়া যায় আবার কোথাও-বা তা হয় না।

আমি : আচ্ছা, এইটিই তবে 'মাঙন' ?

নসিবন : হ্যাঁ, এখন বুঝেছ।

আমি : এখানে কোনো জমিদারের কাছে এসেছ ?

নসিবন : এখান থেকে কিছু দূরে শম্ভু ধ্যান সিংহের গড়। আমি সেখান থেকে আসছি। রাজাসাহেবের কাছে বাদশাহী হুকুম এসেছে ডাকাতদের শায়েস্তা করার। তাই তিনি বেরিয়েছেন। দিনকয়েক অপেক্ষায় রইলাম। শেষে বিরক্ত হয়ে এখানে চলে এসেছি। এখান থেকে দু ক্রোশ দূরে সমরিহা। এই গ্রামটিতে

শুধুই মেয়েমানুষ থাকে, সেখানে আমার মাসি রয়েছেন। তাঁর কাছে যাব।

আমি : তারপর কোথায় যাবেন ?

নসিবন : ওখানেই থেকে যাব। তারপর রাজাসাহেব গড়ে ফিরে আসলে সেখানে যাব। অনেক নাচিয়ে-গাইয়ের দল তাঁর অপেক্ষায় রয়েছে।

আমি : রাজাসাহেবের গান, বাঈজি নাচের শখও আছে নাকি ?

নসিবন : খুব-ই শখ ছিল।

আমি : কেন, এখন কি হলো ?

নসিবন : লখনৌ থেকে যেদিন একটি মেয়েছেলে এসেছে সেদিন থেকেই আমাদের কদর গেছে কমে।

আমি : ঐ স্ত্রীলোকটির নাম কী ?

নসিবন : নাম তো আমার মনে নেই। চেহারাটি দেখেছি, রং ফরসা, ছিরি-ছাঁদ ভালোই।

আমি : খুব ভালো গাইয়ে ?

নসিবন : ছাই, গান-টান তার আসে না। হ্যাঁ, নাচে ভালোই। রাজাসাহেব তাতেই মজে গেছেন।

আমি : স্ত্রীলোকটি কতদিন হলো এসেছে ?

নসিবন : এই মাস ছয়েক হবে।

রাতে ফয়েজ আলিকে আমি রাস্তা বিপজ্জনক হওয়ার কথা বললাম। উনি বললেন, মাথা ঘামাবার দরকার নেই, আমি সব বন্দোবস্ত করেছি।

দ্বিতীয় দিনে পাতলা আঁধারে মোহনলালগঞ্জের সরাইখানা থেকে রওনা হলাম। আমাদের পেছু পেছু চলেছে নসিবনের গাড়ি। আর ফয়েজ আলি চলেছে ঘোড়ায় চড়ে। আমি আর নসিবন কথাবার্তা বলতে বলতে চলেছি। কিছুক্ষণ চলার পর সমরিহা গ্রাম দেখা গেল। নসিবন দূর থেকে আমাকে গ্রামখানি দেখাল। সড়কের ধারে ক্ষেত। সেগুলিতে কিছু কিছু কুমারী মেয়ে জল দিচ্ছে। কিছু ক্ষেত নিড়ানো হচ্ছে। একখানি ক্ষেতে হাল চলছে। এখানে একটি ষণ্ডামার্কা মেয়েছেলে ধুতি পরে গরু হাঁকাচ্ছে। নসিবন বলল, এরা সব বাররামা। মনে মনে বললাম, বাঃ কি পেশা, আবার এদিকে মরদের পক্ষেও যে-কাজ করা শক্ত সেই কাজ করা। আর এদের বাররামা হওয়ারও ছিল কী ? কিন্তু এদের চেহারা ছিল এই ধরনের কাজের পক্ষে উপযুক্ত। লখনৌ-এ যেসব ঘুঁটেওয়ালী, দইওয়ালী, গোয়ালিনী আসে, এদের চেহারা তাঁদেরই মতো।

নসিবন এখান থেকে আলাদা হয়ে গেল।

ক্রোশ দুয়েক যাওয়ার পর একটি ঢালু জমি পাওয়া গেল। জমি এখানে-ওখানে অসমতল, বড় বড় গুহা। সামনে নদীর তীর নজরে পড়ল। বহুদূর পর্যন্ত দুধারেই বড় বড় গাছের ঘন সারি। আমরা যখন স্থানটিতে এসে পৌঁছলাম

তখন বেশ ভালো রোদ উঠেছে। কয়েক প্রহর পর্যন্ত রোদ চড়া থাকবে, আমরা ছাড়া আর কাউকেই এ রাস্তায় যেতে দেখা গেল না।

চারিদিক নিস্তব্ধ। নদী কিনারে পৌছে ফয়েজ আলি ঘোড়া নিয়ে এগিয়ে গেল। আমি থামাতে গিয়েও থেমে গেলাম। ও এজায়গা থেকে অনেক দূরে চলে গেল। কিছুক্ষণ পর্যন্ত ঘোড়া আর দেখা গেল না। নদীর ওপারে আবার তাকে দেখা গেল। আমার গাড়ি ঐ দিকেই যাচ্ছিল। গাড়োয়ান গাড়ি চালাচ্ছে। সহিস ঘোড়ার পিছু পিছু ছুটল। এর মধ্যে আমি দশ পনেরজন ডাকাতকে গাড়ির দিকে দৌড়ে আসতে দেখলাম। মনে মনে বললাম, খোদা রক্ষে কর। কিছুক্ষণের মধ্যেই ডাকাত এসে গাড়ি ঘিরে ফেলল। সবারই কোমরে তলোয়ার বাঁধা, কাঁধে বন্দুক। বন্দুকের পলতে থেকে আগুনের ধোঁয়া বেরুচ্ছে।

ডাকাত : (গাড়োয়ানকে) গাড়ি থামাও। কে আছে গাড়িতে?

গাড়োয়ান : এই সওয়ারি বেরিলি থেকে আসছে। উনাও যাওয়ার জন্য ভাড়া করেছে।

ডাকাত : গাড়ি থামাও।

গাড়োয়ান : কেন গাড়ি থামাব? খান সাহেবের বাড়ির স্ত্রীলোক সওয়ারি।

ডাকাত : কোনো পুরুষমানুষ সাথে নেই?

গাড়োয়ান : পুরুষমানুষ এগিয়ে গেছেন। এসে পড়বেন হয়ত।

ডাকাত : বিবি, গাড়ি থেকে নামো।

জনৈক : পরদা খুলে টেনে বের কর। শালী খান্‌কির আবার পরদা কেন?

একজন ডাকাত এগিয়ে এসে পরদা উল্টে দিয়ে আমাকে গাড়ি থেকে নামাল। তিনজন আমাকে ঘিরে দাঁড়াল। এরই মধ্যে নদীর ধার থেকে ধুলো উড়ে এল আর ঘোড়ার খুরের শব্দ পাওয়া গেল। ঘোড়া কাছে আসতেই দেখা গেল ঘোড়াটি ফয়েজ আলির। পেছনে আরও দশ-পনেরজন অশ্বারোহী। ডাকাতরা দেখেই একদফা বন্দুক ছুঁড়ল। ওপক্ষের দুজন এতে পড়ে গেল। ওরা তলোয়ার বের করে ডাকাতদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। এরাও তলোয়ার বের করল। দুই এক হাত চলার পর এপক্ষের তিন ডাকু জখম হয়ে পড়ে গেল। ও পক্ষের আরো একজন অশ্বারোহী পড়ে গেল। ডাকুরা পালিয়ে গেল।

আচ্ছা, যাবে কোথায়। নদীর ওপারে দেখব কি হয়।

ডাকুরা চলে যাওয়ার পর আবার আমি গাড়িতে বসলাম। যে অশ্বারোহীটি জখম হয়েছিল তার ক্ষতস্থানে পটি বাঁধা হলো। তাকেও গাড়িতে আমার পাশে বসিয়ে দেওয়া হলো। গাড়ি চলতে শুরু করল। দুটি অশ্বারোহী আমার গাড়ির এপাশ ওপাশ আর কিছু আগে পিছে চলতে লাগল।

ফয়েজ আলি : (নিজের সাথীকে) লখনৌ থেকে কোনো রকমেই বেরুতে

পারছিলাম না। অতিকষ্টে জান বাঁচিয়ে এসেছি।

ফজল আলি : বেশ আরামেই ছিলে, তা বলছ না কেন।

ফয়েজ আলি : হ্যাঁ, সে তো বলবেই।

ফজল আলি : বলব আর কি। উপহার তো সাথে সাথেই রয়েছে। ভাবী সাহেবকে আমিও তো একটু দেখব।

ফয়েজ আলি : তোমার উপর কোন্ নিষেধ আছে। দেখ।

ফজল আলি : বাড়িতে গিয়ে খুশি হয়ে দেখব।

ইত্যবসরে গাড়ি নদীর কিনারে গিয়ে পৌছল। নদীর পাড়টি ছিল খুব উঁচু। আমাকে গাড়ি থেকে নেমে পায়ে হাঁটতে হলো। অনেক কষ্টে গাড়ি অপর কিনারে গিয়ে উঠল। যে জখম লোকটি গড়িতে ছিল গাড়ির হেঁচকিতে তার বাঁধন খুলে গেল। ফলে সারা গাড়িটি রক্তে রক্তময় হয়ে উঠল। নদীর ওপারে গিয়ে তার ক্ষতটি আবার বাঁধা আর গাড়িটি ধুয়ে ফেলা হলো। আবার আমি গাড়িতে চড়লাম। এখন বেলা প্রায় দ্বিপ্রহর হয়ে গেছে। গাড়ির ঝাঁকুনিতে আমার খিদে লেগে ছিল। গাড়ি ঐ দিকেই চলছে। লোকগুলির ঘরবাড়ি দেখা যাচ্ছে না। নদীর থেকে প্রায় চার ক্রোশ যাওয়ার পর একটি গ্রামের পাশে একটি বাগান মিলল। সেখানে কতকগুলি চাকর-বাকর ও ঘোড়ার তাঁবু দেখা গেল। ঘোড়াগুলি বাঁধা। লোকগুলি এধার-ওধার ঘুরছে। কিছু লোক রান্না করছে। এখানে এসে আমাদের গাড়ি থামল। আমাদের সাথে যাত্রীদের দেখেই একটি লোক ঐ শিবির থেকে এগিয়ে এল। সে ফজল আলির কানে কানে কী বলল। ফজল আলির চোখ-মুখে উদ্বেগের লক্ষণ দেখা যেতে লাগল। সে ঘোড়াটি ফয়েজ আলির দিকে নিয়ে গিয়ে চুপি চুপি কথা বলল।

ফয়েজ আলি : আচ্ছা দেখা যাবে। খাবার খেয়ে তো নাও।

ফজল আলি : খাবার খাওয়ার সময় আর নেই, এখনি বেরিয়ে যাই চল।

ফয়েজ আলি : বেশ. যতক্ষণ না তাঁবু তুলে ফেলা আর ঘোড়ার উপর জিন বাঁধা হচ্ছে ততক্ষণ আমরা খেয়ে নিই।

আমি গাড়ি থেকে নামলাম। আমগাছের নীচে ফরাস বিছানো আর ব্যঞ্জনের পাত্র রাখা হলো। পুরু পুরু রুটির টুকরো। আমি, ফয়েজ আলি আর ফজল আলির তিনটি লোক, সবাই মিলে খাওয়া সেরে নিলাম। খাবার সময় তাদের মুখে ছিল উদ্বেগের চিহ্ন, কিন্তু হাসি-ঠাট্টা চলতে থাকল।

আমাদের খাওয়া শেষ করার মধ্যেই তাঁবুগুলি তুলে নিয়ে ঘোড়ার উপর চাপানো ও ঘোড়ার জিন বাঁধা শেষ হয়ে গেল। শেষে সকলেই দল বেঁধে যাত্রা শুরু করল। দু-তিন ক্রোশ যাওয়ার পরই একটি বিরাট অশ্বারোহী ও পদাতিক দল এসে আমাদের ঘিরে ফেলল। এ পক্ষ প্রথম থেকেই প্রস্তুত ছিল। দু-পক্ষই গুলি বর্ষণ শুরু করল। এই যুদ্ধে ফয়েজ আলি আমার গাড়ির আশপাশেই ছিল।

আমি গাড়ির ভিতর বসে আল্লার অনুগ্রহ প্রার্থনা করছিলাম। প্রাণটি যেন হাতের মুঠোর মধ্যে ধুকপুক করছিল। দেখুন না কি হচ্ছে! আমি পরদা তুলে দেখছিলাম। এ পড়ে গেল, ও মরে গেল। দুপক্ষেই অনেক লোক জখম হয়ে গেল। আমাদের পক্ষে ছিল পঞ্চাশ-ষাট জন। রাজা ধ্যান সিংয়ের ছিল বহুত লোকজন। আমাদের জনপ্রতি ওদের দশতন। অনেকেই জখম হলো। ফয়েজ আলি আর ফজল আলি সুযোগ পেয়ে পালিয়ে গেল। দশ-বারজন গ্রেপ্তার হলো। তার মধ্যে আমিও।

১১

আমাদের গ্রেপ্তার হওয়ার পর গাড়োয়ান অনুনয়-বিনয় করে রেহাই পেল। সে জখম লোকটিকে ময়দানে যেখানে অনেকগুলি লাশ ছিল সেখানে গাড়ি থেকে ফেলে দিয়ে নিজের প্রাণ নিয়ে বেরিলির রাস্তা ধরল। পুরুষগুলিকে পিঠমোড়া করে বেঁধে গড়ের দিকে রওনা হলো। গড় ওখান থেকে প্রায় পাঁচ ক্রোশ দূর। কিছুদূর যাওয়ার পর রাজাসাহেব আর তাঁর সঙ্গীসাথীরা সব এসে জুটলেন। রাজাসাহেব স্বয়ং ঘোড়ার উপর সওয়ার ছিলেন। আমরা সব সামনে গেলাম। উনি আমার দিকে ইশারা করে জিজ্ঞেস করলেন, ইনি কি লখনৌ থেকে এসেছেন?

আমি: (হাত জোড় করে) হুজুর অপরাধী তো হয়েছি, কিন্তু ভেবে দেখলে দোষ করিনি। মেয়েমানুষের জাত, জাল-জোচ্চুরি বুঝব কী করে!

রাজা: আপনি নির্দোষ প্রমাণ করার চেষ্টা করবেন না। আপনার অপরাধ প্রমাণিত। যে কথা আপনাকে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে তার জবাব দিন।

আমি: জো হুকুম, হাকিম।

রাজা: লখনৌয়ে বাড়ি কোথায়?

আমি: চকে।

রাজা: (লোকজনকে ইশারা করে) দেখ, গাঁয়ের থেকে একখানি গরুর গাড়ি নাও। লখনৌ-এ এর বাড়ি। আমাদের দেশওয়ালী বেশ্যাদের মতো নয় যে সারারাত মানুষের জমায়েতে নাচবে আর বরযাত্রীদের সাথে দশ দশ ক্রোশ পথ নাচতে নাচতে চলে যাবে।

আমি: হুজুরকে খোদা কুশলে রাখুন।

লোকজন গিয়ে গাড়ি নিয়ে এল। তারপর তারা আমাকে গাড়িতে বসিয়ে দিয়ে গাড়িটি গড়ের দিকে চালাতে থাকল. হাত পিঠমোড়া করে বাঁধা লোকগুলি সাথে সাথে চলল। গড়ে পৌঁছনোর পর জানিনে, লোকগুলিকে কোথায় পাঠানো হলো, তবে আমাকে কুঠিতে ডেকে নিয়ে গেল। একটি পরিচ্ছন্ন ঘর আমাকে থাকার জন্য দেওয়া হলো। সেবার জন্য নিযুক্ত হলো দুটি লোক। খাওয়ার জন্য মিলল তৈরি করা পুরি, কচুরি, মিঠাই আর নানান ধরনের আচার। লখনৌ ছাড়ার পর আজ রাতেই বেশ তৃপ্তিতে হামহুম করে খেলাম। পরদিন সকালে জানতে পারলাম অন্যান্য কয়েদীদের লখনৌ-এ রওনা করে দেওয়া হয়েছে।

আমাকে রেহাই দেওয়ার হুকুম আছে। কিন্তু রাজাসাহেব এখনই ফেরত পাঠাবেন না। বেলা প্রহর-খানেক হলে রাজাসাহেব ডেকে পাঠালেন।

রাজা : আচ্ছা আমি তোমাকে ছেড়ে দিয়েছি। ফৈজু আর ফজল আলি দুজনেই পালিয়ে গেছে। আর যেসব দুষ্কৃতকারীরা গ্রেপ্তার হয়েছিল তাদের লখনৌ পাঠানো হয়। সেখানে তারা সাজা খাটছে। নিঃসন্দেহে তোমার কোনো দোষ নেই। কিন্তু ভবিষ্যতে এই ধরনের লোকের সাথে আর জুটবে না। যদি ইচ্ছে কর দু-চার দিন এখানে থাকতে পার। আমি তোমার গানের প্রচুর তারিফ শুনেছি।

আমি : (রাজাসাহেবের ওখানে লখনৌ-এর কে একজন বাঈজি আছে, নসিবনের এই কথা আমার মনে পড়ল। থাক বা না-থাক, সে হয়ত আমার প্রশংসা করেছে।) হুজুর কার কাছ থেকে শুনলেন?

রাজা : বেশ, এটিও বুঝতে পারবে।

কিছুক্ষণ পরেই লখনৌ-এর সেই বাঈজির তলব পড়ল। লখনৌ-এর সেই বাঈজিটি কে? খুরশিদজান। খুরশিদজান দৌড়ে এসে আমার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল। দুজনে মিলে কাঁদতে থাকলাম। রাজাসাহেবের ভয়ে চটপট আমরা ছাড়াছাড়ি হয়ে সংযত হয়ে বসলাম। গান-বাজনার আয়োজন করা হলো। ছাড়া পাওয়ার খবর শুনে আমি সময়োচিত একটি গজল গাইলাম। অনেক কবিতা ছিল। যেসব কবিতা মনে পড়ছে শুনিয়ে দিচ্ছি। প্রত্যেকটি কবিতায় রাজা সাহেব ও উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দ খুবই খুশি। সবাই আত্মহারার ভাবে ভরপুর ছিলেন।

গজলটি এই :

পাখিটির মুক্তি মেলে ব্যাধের কৃপায়
গান ও ফুলের বাগ সাথে সে হারায়।
তুমি ছাড়লেও বাঁধে আমায় তোমার কেশপাশে
অত্যাচারের এই নতুন বন্দি থেকে
আজ মুক্তি আসে।
শিকারী এ বন্ধন-স্বাদ রইল গোপন
শৃংখল গেলেও খসে নিরানন্দ মন।
শিকারীর কোমল হৃদয় সইতে পারেনি আর
এ নালিশ আর কান্না। তাই ছাড়া
পেলাম এবার
এ পার্থিব দুঃখ ছাড়া আরো দুঃখ রয়েছে হাজার
জীবন-খাঁচায় বন্দী ছাড়া পেল কবে সে আবার।
নিত্য-নব বন্দিনীকে কেন ঈর্ষা হবে না আমার

আমি তো পেয়েছি ছাড়া পাইনি সে
বাঁধনের স্বাদ পুরস্কার
প্রেমের বন্ধন-মুক্তি যদি কারো হয়
বন্ধন দুঃখের অদা, সে তো মুক্তি নয়।

শেষ পঙ্‌ক্তিটি শুনে রাজাসাহেব বললেন, 'অদা' কার কাবিাক ছদ্মনাম ?

খুরশিদ বলল, এটি এঁরই স্বরচিত।

রাজা আরও খুশি হলেন। বললেন, এরকম জানলে আমি কখনই আপনাকে মুক্তি দিতাম না।

আমি : গজলেই হুজুরের মালুম হয়ে গেছে এই মুক্তিতে আমারও আফসোস হচ্ছে। কিন্তু এখন তো হুজুর হুকুম দিয়েছেন আর আমিও ছাড়া পেয়েছি।

এরপর জলসা ভেঙে দেওয়া হলো। রাজাসাহেব ভিতরে রান্নাঘরে চলে গেলেন। খুরশিদ আর আমি অনেক কথাবার্তা বললাম।

খুরশিদ : দেখ বোন, আমার কোনো দোষ নেই। খানুম সাহেবা আর রাজা সাহেবের সাথে অনেকদিন থেকেই জেদাজেদি চলছিল। রাজাসাহেব কয়েকবারই আমাকে ডাকিয়েছিলেন, উনি পরিষ্কার পাঠাতে অস্বীকার করেন। শেষে আয়েশ-বাগের মেলায় এঁর লোকজন গিয়ে আমাকে জোর করে ধরে নিয়ে আসে। তখন থেকেই আমি এখানে আছি। সব বিষয়েই আমার আদরযত্ন হচ্ছে। সব রকমেরই আরাম মিলছে।

আমি : এইসব গেঁয়ো ভূতদের তোমার ভালো লাগছে ?

খুরশিদ : কথাটি সত্যি, কিন্তু তুমি তো আমার মনমেজাজ জানো। রোজ একজন নতুন লোকের কাছে যাওয়াটা আমার একেবারে অপছন্দ। আর ওখানে তো আমাকে এই কাজটিই করতে হত। খানুমকে তো জানো। এখানে শুধু রাজাসাহেবের সাথেই যোগাযোগ। আর সবাই আমার হুকুমের অধীন। তারপর এটি আমার দেশ। এখানকার প্রত্যেকটি জিনিসই আমার ভালো বলে মনে হয়।

আমি : তাহলে তোমার লখনৌ যাওয়ার কোনো মতলব নেই ?

খুরশিদ : আমাকে মাফ কর। আমি এখানে ভালোই আছি আর বলতে-কি তুমিও এখানে থাকো।

আমি : এখানে আমি থাকব না। নিরুপায় হলে অন্য কথা।

খুরশিদ : লখনৌ-এ যাবে ?

আমি : না।

খুরশিদ : তবে কোথায় ?

আমি : খোদা যেখানে নিয়ে যান।

খুরশিদ : এখন কিছুদিন এখানে থাকো।

আমি : হ্যাঁ, এখন থাকব।

পনের-কুড়ি দিন পড়েই থাকলাম। খুরশিদের সাথে রোজই মিলতাম, খুরশিদের এখানেই মন বসে গিয়েছিল। শেষে রাজাসাহেবের কাছে প্রার্থনা জানালাম—

হুজুর আমাকে খালাস দেবার হুকুম দিয়েছেন?

রাজা : হ্যাঁ, আবার কি জানতে চাচ্ছ?

আমি : জি হ্যাঁ, এখন বাঈজিটিকে পাঠিয়ে দিন। আবার আসব।

রাজা : এতো লখনৌয়ী রীতি। আচ্ছা, কোথায় যাবে?

আমি : কানপুর।

রাজা : লখনৌ-এ যাবে না?

আমি : হুজুর, লখনৌ-এ কোন্ মুখ নিয়ে যাব?

খানুমের কাছে কতই না লজ্জা পাব। সাথীরা কিরকম হাসাহাসি করবে।

একে তো আমার লখনৌ যাওয়ার কোনো মতলব নেই। তারপর এটিও খেয়াল ছিল যে, রাজাসাহেবকে যদি বলি লখনৌ যাব তবে তিনি হয়ত ছেড়ে দেবেন না। কেননা, ওখানে গেলে খুরশিদের ব্যাপারটি প্রকাশ হয়ে যাবে, হয়ত খানুম কোনো একটি উত্তেজনা সৃষ্টি করবেন।

রাজাসাহেব আমার এই মতলবে খুব খুশি হলেন।

রাজা : তাহলে লখনৌ আর কখনো যাবে না?

আমি : লখনৌ-এ কে আমার জন্য বসে আছে? গান-বাজনার পেশা। যেখানেই থাকি না কেন, কেউ-না কেউ একজন মুরুব্বি জুটবেই। খানুমের কয়েদ-খানায় থাকতে আর আমি রাজি নই। যদি ওখানেই থাকব তবে বেরিয়ে আসব কেন?

আমি রাজাসাহেবকে বিশ্বাস জন্মিয়ে দিলাম যে, লখনৌ-এ আমি একদম যাব না।

পরের দিন রাজাসাহেব আমাকে দশটি স্বর্ণমুদ্রা, একখানি শাল ও একখানি রুমাল পুরস্কার দিলেন। আর দিলেন তিনটি বলদের একখানি গরুর গাড়ি। উদ্দেশ্য, আমাকে একজন তাঁবুওয়ালী বাঈজি বানিয়ে দেওয়া! একজন গাড়োয়ান আর দুজন লোক হলো আমার সাথী। আমরা উনাও-এর পথে রওনা হলাম। এখানে সলারু হোটেলওয়ালার হোটেলে পৌঁছে রাজাসাহেবের লোক দুটিকে ছেড়ে দিলাম। কেবল গাড়োয়ান থাকল।

সন্ধ্যেবেলায় নিজের ঘরের সামনে বসে আছি। ভ্রমণার্থীরা যাতায়াত করছেন। হোটেলওয়ালা চিৎকার করছে—মিঞাসাহেব, এদিকে এদিকে, ওদিকে না, ঘর পরিষ্কার, হুঁকার সুবিধে—ঘোড়া, টাট্টুদের জন্য নিমগাছের ছায়ার ব্যবস্থা আছে।

এমনি সময়ে দেখি ফয়েজ আলির সহিস আসছে। হোটেলের দরজা থেকেই ওর চোখ পড়ল আমার উপর। আমাদের চোখাচোখি হতে ও আমার এখানে

চলে এল। আমি কেমন আছি, এইসব কথাবার্তা হলো। তারপর আমি ফয়েজ আলির কথা জিজ্ঞেস করলাম। সে বলল, আপনার উনাও পৌঁছানোর খবর তিনি পেয়েছেন। আজ রাত এক প্রহর দেড় প্রহরের মধ্যে নিশ্চয়ই আসবেন।

শুনে তো আমার বুক ধড়ফড় করতে লাগল। কারণ, ফয়েজ আলিকে এখন আমি পছন্দ করছিলাম না। গাঁয়ের ঐ ঘটনার পর আমি ভেবেছিলাম গলবন্ধ থেকে মুক্ত হলাম। উনাও-এ ফয়েজ আলি যেন বুকের উপর চেপে বসেছে। মামুলী কথাবার্তা হওয়ার পর উনাও থেকে রওনা হওয়ার আলোচনা চলল। অনেকক্ষণ ধরে কথাবার্তা হলো। প্রথমে ঠিক হলো যে, গাড়োয়ানকে ফেরত পাঠাব। গাড়িটি সহিস হাঁকিয়ে নিয়ে যাবে, আমি নিজে ঘোড়ায় চড়ব। আবার ঠিক হলো গাড়িটি সলারু হোটেলওয়ালার কাছে রেখে দেব। রাতারাতি গঙ্গার ওপারে চলে যাব। এখন আমি আর কী করতে পারতাম। এখন আমি ফয়েজ আলির অধীনে। সে যা বলবে তা আমাকে অবশ্যই মেনে নিতে হবে। ফয়েজ আলি সলারুকে ডাকল। একধারে তাকে ডেকে নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে কথাবার্তা বলল।

প্রায় অর্ধেক রাতে ফয়েজ আলি আমাকে তার সাথে ঘোড়ার উপর বসিয়ে হোটেল থেকে বেরিয়ে পড়ল, পাঁচ ছ' ক্রোশ পথ চলতে হবে, রাতের বেলা। গিঁটে গিঁটে ব্যথা হয়ে গেল। অনেক দিন ধরে সে ব্যথা ছিল। কোনোরকমে তো গঙ্গার পাড়ে গিয়ে পৌঁছলাম। অতি কষ্টে নৌকোর ব্যবস্থা করে ওপারে গেলাম। ফয়েজ আলি বলল, আর কোনো ভয় নেই। ভোর হতে-না হতেই কানপুর পৌঁছে গেলাম। ফয়েজ আলি আমাকে লাঠি মহলে নামিয়ে দিয়ে নিজে ঘরের সন্ধানে গেল। কিছুক্ষণ বাদে এসে বলল, এখানে থাকা ঠিক হবে না, ঘর আমি ঠিক করে ফেলেছি, সেখানেই চলি, চল। একখানি ডুলি ভাড়া করা হলো।

কিছুক্ষণ বাদেই একটি বিরাট অট্টালিকার দরজার সামনে থামলাম। ফয়েজ আলি আমাকে এখানে নামিয়ে দিল। বাড়ির ভিতর গিয়ে দেখি যে, দুটো দড়ির চারপাই পড়ে আছে। একখানি চাটাই বিছানো। তার উপর একটি অদ্ভুত ধরনের হুঁকো রাখা। হুঁকোটি দেখেই আমার তামাক খাওয়ায় ঘেন্না ধরে গেল। বাড়িটির অবস্থা দেখে মনে ভয় হলো। কিছুক্ষণ পরে ফয়েজ আলি বলল, আমি বাজার থেকে খাবার কিছু আনি। আমি বললাম, ভালো হয়। কিন্তু তাড়াতাড়ি এস। ফয়েজ আলি বাজারে গেল। আমি এখানে একা বসে রইলাম।

এখন শুনুন, ফয়েজ আলি সেই যে বাজারে গেল তো গেলই, আজ এল না, কালও এল না এক ঘণ্টা, দু ঘণ্টা, এক প্রহর, দুই প্রহর, কত আর বলব। দুই প্রহর গেল সন্ধ্যে হয়ে এল।

উনাওয়ে সন্ধ্যে না হতেই রাতের খাবার খেয়ে নিয়েছিলাম। রাতে ঘোড়ায়

চলার ঝাঁকুনি, ঝিমুনি সকাল থেকেই মুখে একবিন্দু জলও পড়েনি। কিছুই খাইনি। খিদেয় মরে যাচ্ছি। কিছুক্ষণ পরেই সূর্য ডুবে গেল। শেষে রাত হয়ে গেল। হায় খোদা, এখন কী করি! গালাগালি দিতে থাকলাম। উঠে বসলাম। এই বিরাট বাড়িটি খাঁখা করছে। আমি একলা। খোদা ছাড়া আর কেউই নেই। মনে হচ্ছে, ঘর থেকে কে যেন বেরল, সে যেন সামনের ঘরে চলে-ফিরে বেড়াচ্ছে। ছাদের উপর দুমদাম আওয়াজ হচ্ছে। সিঁড়ি দিয়ে কে যেন খটখট আওয়াজ করে নেমে আসছে। এখন রাত-দুপুর। এ পর্যন্ত উঠোন আঙিনা ও দেওয়ালগুলিতে জ্যোৎস্নার আলো ছিল, এবার তাও ডুবে গেল। চারিদিক একদম অন্ধকার। শেষে আমি মুখের উপর শালখানি চাপা দিয়ে পড়ে থাকলাম। আবার একটি ঠকঠক শব্দ। দুঃখের দীর্ঘ ও বিরক্তিকর রাত্রি যেন আর কাটতে চায় না। শেষ অবধি কোনো রকমে রাত কাটল।

পরের দিন সকালে অভিজ্ঞতা হলো অদ্ভুত। লখনৌ-এর সমাদর হতে লাগল। মনে মনে বলতে লাগলাম, হায় খোদা এ কী বিপদে ফেললে! লখনৌ-এর আরাম-বিরাম আর নিজের ঘরখানির কথা মনে পড়ল। এদিকে একটি আওয়াজ দিলেই ওদিকে লোক হুঁকো, পান, খাবার, জল, যা কিছু হোক-না কেন নিয়ে প্রস্তুত। মুখ ঘোরালেই সামনে হাজির থাকবে। সংক্ষেপে, আজও দুপুরবেলা পর্যন্ত ফয়েজ আলি এল না। ঘরের চার দেওয়ালের মধ্যে কনে বউ-এর মতো বসে থাকা।

মেয়েছেলে হলে এ অবস্থায় হাঁকিয়ে হাঁকিয়ে মরে যেতাম। যদিও একেবারে উদোম ঘুরে বেড়াতাম না, তবুও তো হরেকরকমের পুরুষদের মধ্যে বসতাম। কানপুরে না হলেও লখনৌ-এর গলি, রাস্তা রীতিমত জানতাম। আর এখানকার হোটেলও তো দেখেছি, দেখেছি বাজারও। বসে যদি থাকতে হয় তো থাকুক আমার আপদ এই খালি বাড়িতে। আমি চট্ করে উঠে দরজার খিল খুলে বাইরে বেরিয়ে পড়লাম। দশ-বিশ পা এগিয়েই দেখি-কী, একজন সরকারি পোশাক পরা ঘোড়সওয়ার আর দশ-পনেরজন বরকন্দাজের একটি দলের মধ্যে বন্দী অবস্থায় ফয়েজ আলি সামনের দিকে এগিয়ে আসছে। দেখেই আমি হতভম্ব হয়ে পিছনে একটি সরু গলি দেখে ঢুকে পড়লাম। এই গলিতেই দেখি একটি মসজিদ। মনে ভাবলাম, সব থেকে ভালো জায়গা খোদার আশ্রয়, এখানেই কিছুক্ষণ থাকতে হবে। দরজা খোলাই ছিল। আমি তাড়াতাড়ি ভিতরে চলে গেলাম। এখানে পড়ে গেলাম একজন মৌলবী সাহেবের সামনে। গায়ের রং তাঁর কালো, মাথা মুড়িয়ে ফেলা। একটি নীল লুঙ্গি পরা। উনি রোদে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। প্রথমে উনি ভেবেছিলেন হয়ত-বা আমি ওঁর কুলুঙ্গিটি ভরিয়ে দিতে এসেছি। তাই খুশিই হয়েছিলেন। আমি চুপি চুপি নমাজ পড়ার জায়গাটিতে পা ঝুলিয়ে বসতেই তিনি কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন, কিরকম

বিবিসাহেব, আপনি এখানে কী মনে করে ?

আমি : আমি একজন যাত্রী। খোদার ঘর দেখে কিছুক্ষণের জন্য বসে পড়েছি। যদি এটা আপনার পছন্দ না হয় তো এখনই চলে যাচ্ছি।

মৌলবী সাহেব যদিও খুবই বেসামাল হয়ে পড়েছিলেন, কিন্তু মন-খুশি-করা কথার যাদুতে কাজ হলো। ভালো উত্তর আর কী মুখ থেকে বেরত। বিভ্রান্ত হয়ে উনি এদিক-ওদিক দেখতে লাগলেন। আমার মনে হলো উনি জালে আটকা পড়েছেন।

মৌলবী : (কিছুক্ষণ পরে সামলে নিয়ে) আচ্ছা, আপনি আসছেন কোত্থেকে ?

আমি : আসছি তো কোনো একটি জায়গা থেকে, তবে বর্তমানে এখানে বিশ্রাম নিতে মনস্থ করেছি।

মৌলবী : (ভয়ানক ঘাবড়ে গিয়ে) মসজিদে ?

আমি : জি, না। আপনার কুঠুরিতে।

মৌলবী : খোদা শয়তানের হাত থেকে রক্ষা করুন।

আমি : মৌলবী সাহেব, আপনি ছাড়া আর কাউকে তো এখানে আমি দেখতে পাচ্ছিনে।

মৌলবী : জি হ্যাঁ। আমি তো এখানে একলাই থাকি। এর জন্যই জিজ্ঞেস করেছি মসজিদে আপনি কী মনে করে ?

আমি : একি আপনার ব্যক্তিগত সম্পত্তি যে, আপনি যেখানে থাকবেন সেখানে আর কেউ থাকতে পারবে না। মসজিদে আমার কোনো কাজ নেই, বেশ তো বললেন। আপনার কী কাজ ?

মৌলবী : আমি ছেলেদের পড়াই।

আমি : আপনাকে আমি পড়াব।

মৌলবী : খোদা শয়তানের হাত থেকে রক্ষে করুন।

আমি : আপনি বার বার এটি পড়ছেন কেন ? কোনো শয়তান আপনার পেছু ফিরছে ?

মৌলবী : শয়তান মানুষের শত্রু। এই জন্যই সব সময় একে ভয় করা দরকার।

আমি : খোদাকে ভয় করা চাই। মুখপোড়াকে ভয় করব কেন ? আর এ আপনি কী বললেন, মানুষ আপনি ?

মৌলবী : (কিছু রেগে গিয়ে) জি হ্যাঁ, তাছাড়া আর কি ?

আমি : আপনাকে তো আমার মনে হচ্ছে অপদেবতা বলে। একলাটি এই মসজিদে থাকেন। আপনি মনে একটুও ভয় পান না !

মৌলবী : তা আর কী করি ? একলা থাকাই আমার অভ্যেস।

আমি : এইজন্যেই তো আপনার চেহারায় নিঃসঙ্গতার ছাপ পড়েছে। ও,

আপনি শোনেননি, নিঃসঙ্গ মানুষ আধা-পাগল হয় ?

মৌলবী : সেসব মেনেও আমি যে-অবস্থায় আছি, তাতে আমি খুশি, আপনি নিজের মতলবটি বলুন ।

আমি : মতলব তো বই দেখে সমাধান করতে হবে। উপস্থিত আমরা ভাষা নিয়ে বিতর্ক করছি ।

মৌলবী : বলছেন কী !

আমি : নিশ্চয়ই তাই হবে ।

আমি : মৌলবী সাহেবকে বেশ করে রগড়ে দিতে পারতাম। কিন্তু খিদের জ্বালায় মুখ থেকে কথা সরছিল না ।

রুশোয়া : এই মৌলবী সাহেবের সাথে এধরনের মজা করার কী দরকার ছিল ?

আমি : আহা, একথা জিজ্ঞেস করবেন না। কিছু কিছু লোকের চেহারাটিই এমন যে, ইচ্ছেয় হোক আর অনিচ্ছায়ই হোক হাসতেই হয় ।

রুশোয়া : জি হ্যাঁ, কারো কারো ন্যাড়া মাথা দেখলেই হাত সুড় সুড় করে। চাঁটি লাগাতে ইচ্ছে জাগে ।

আমি : ব্যাস, এইটিই বুঝে যান ।

রুশোয়া : আচ্ছা, মৌলবী সাহেবের বেলায় ব্যাপারটি কী এমন ছিল যে মজা করার ইচ্ছে করে ?

আমি : কি আর বলব! ভালো করে বোঝাতে পারব না। মৌলবী সাহেব ছিলেন জোয়ান আর দেখতেও খুব খারাপ না। শ্যামলা রং, গেঁয়ো চেহারা, মাথায় লম্বা লম্বা চুল, মুখে দাড়ি—কিন্তু সেগুলি বেয়াড়া ধরনের লম্বা। গোঁফ কামানো। লুঙ্গিটি খুব উঁচু করে পরা। নানা রংয়ের ছিট কাপড়ের একটি বড় টুপিতে গোটা মাথাটিই ঢাকা। কথা বলেন অদ্ভুত ধরনে। কথা বলতে মুখটি যত তাড়াতাড়ি খোলেন তত তাড়াতাড়ি বন্ধ করেন। নীচের ঠোঁট একটি অদ্ভুত রকমে উপরে উঠে যায় আর তার সাথে খোচাখোঁচা দাড়িটি নড়তে থাকে। তারপর একটি হুঁ হুঁ-র মতো নাকী সুর বেরয়। যেন উনি কিছু খেতে খেতে কথাবার্তা বলছেন। আর সতর্কভাবে মুখটি তাড়াতাড়ি বন্ধ করছেন যেন মুখ থেকে কিছু পড়ে না যায় ।

রুশোয়া : সত্যিই কি তিনি কিছু খাচ্ছিলেন ?

উমরাও : জি না, জাবর কাটছিলেন ।

রুশোয়া : কাঠ মোল্লারা প্রায়ই এইরকম চেহারা তৈরি করে নেন যাতে বেকুবরা দেখেই ভয় পায় আর বুদ্ধিমানদের হাসি আসে। আমার খুবই ইচ্ছে এইরকম চেহারার লোক দেখি ।

উমরাও : আরও শুনুন। ওর কথাবার্তায় আরেকটি বর্ণনার ব্যাপার আছে ।

সেটা এই যে, উনি প্রায়ই মুখ ফিরিয়ে নেন।

রুশোয়া : এটি একটি বিচার-বিবেচনা করে দেখার ব্যাপার যে, কথা বলার আগে তাঁর মুখ থেকে থুথু ওড়ে কিনা।

উমরাও : আরও কিছু বলব কি?

রুশোয়া : ব্যাস, মাফ করুন। এখন তো সকাল হয়ে গেল।

উমরাও : সংক্ষেপে আমি পকেট থেকে একটি টাকা বের করলাম।

মৌলবী : (আমি ওঁকে প্রণামী দিচ্ছি মনে করে তাড়াতাড়ি হাতটি তো বাড়িয়ে দিলেন, কিন্তু মুখে বললেন) এর কী দরকার ছিল!

আমি : (মুচকি হেসে) এর ভয়ানক দরকার আছে। আমি ভয়ানক ক্ষুধার্ত। কারো কাছ থেকে কিছু আনিয়ে দিন।

মৌলবী : (নিজের বিব্রত ভাবটি এড়াতে এইসব কথা বলতে থাকেন) আমি বুঝেছি (আমি মনে মনে বললাম, বুঝেছ তো কচু—বুঝলে তো একটি দামী জিনিস হয়ে যেতে) এই জন্যই তো বলছ এর দরকার কী ছিল। খানা কি এখানে মেলা সম্ভব না?

আমি : সম্ভাবনা কি বর্তমানে না ভবিষ্যতে, আবশ্যিক না আকস্মিক?

মৌলবী : এখনই তো সম্ভব না। আমার এক শিষ্য এখনই খানা আনবে আপনিও এই সাথে খেয়ে নেবেন।

আমি : এখনই তো সম্ভব না, আর আবশ্যিকতার তো আপনার কোনো উপায়ই নেই। আর এখানে প্রয়োজনটি তো একটি পুরুষের জন্য বলা আছে। সুতরাং, বাজার থেকে কিছু আনিয়ে দিন!

মৌলবী : একটুখানি সবুর করুন। খাবার আসবেই।

আমি : অপেক্ষা করা খুবই কষ্টসাধ্য হয়ে উঠেছে। আর আমি বিশ্বস্তসূত্রে শুনেছি যে, পবিত্র রমজান এক মাস ধরে সমগ্র দুনিয়া ভ্রমণ করছেন আর এগার মাস এই মসজিদেই আড়ালে থেকে প্রার্থনা করেন।

মৌলবী : এ সময়ে আমার কাছে কিছুই নেই, তা অস্বীকার করিনে। কিন্তু আমার এক শিষ্য খাবার নিয়ে আসবে বোধহয়।

আমি : আচ্ছা ধরেই নিলাম অসম্ভবটি সম্ভব হবে। কিন্তু খাবার যা আসবে সেটি তো আপনার একার পক্ষেই যথেষ্ট নয়। তার উপর আবার আমার ভাগ বসানো। আর যদি ধরেও নিই যে কুলিয়ে যাবে তাহলেও অপেক্ষা করাটা মরার চেয়েও খারাপ মনে হচ্ছে। কথায় বলে মানুষকে সাপে কামড়ালে সে ইরাক থেকে ওষুধ আনার জন্য অপেক্ষা করতে পারে না।

মৌলবী : আহা, আপনি তো খুব বিদুষী মনে হচ্ছে!

আমি : কিন্তু আমার কাঁচা বিচারে আপনি কোনো কাজেরই নন।

মৌলবী : ঘটনাটি এই রকমই কিন্তু....

আমি : (কথা কেড়ে নিয়ে) আপনি বাজে বকছেন আর এদিকে আমি খিদেয় মরতে বসে আল্লার নাম নিচ্ছি।

মৌলবী : আচ্ছা, আমি এখনই আনছি।

আমি : দোহাই, একটু তাড়াতাড়ি করুন!

খোদা খোদা করে তো মৌলবী সাহেব রওনা হলেন আর প্রায় এক ঘণ্টা দেড় ঘণ্টা বাদে চারখানি পাঁউরুটি আর মাটির ভাঁড়ে নীল হয়ে যাওয়া বাসি ঝোল এনে সামনে রাখলেন। দেখে পিত্তি জ্বলে গেল। মৌলবী সাহেবের দিকে তাকিয়ে রইলাম। মৌলবী সাহেব অন্য কিছু ভাবলেন।

মৌলবী : (তাড়াতাড়ি চাদরের প্রান্তের গিঁট খুলে সাড়ে-চৌদ্দ আনা পয়সা দু প'সা দামের কড়ি সামনে রেখে) শুনুন সাহেব, চার পয়সার রুটি আর ঝোল এক পয়সা আর টাকা ভাঙানোর জন্য কমিশন আধলা। বাকি টাকা আপনার সামনে রেখেছি। গুনে নিয়ে খাবার খান

আমি আবার একবার ওর দিকে তাকালাম। কিন্তু খিদে বড় বালাই। তাড়াতাড়ি দু-চার গ্রাস খেয়ে মৌলবী সাহেবকে বললাম—

মৌলবী সাহেব এই পোড়া শহরে এইরকম খাবার পাওয়া যায়?

মৌলবী : তবে কি এখানে লখনৌ-এর মাহমুদের দোকানের মতো অষ্টপ্রহর পোলাও পাওয়া যাবে?

আমি : মিষ্টির দোকান নিশ্চয়ই আছে?

মৌলবী : মিষ্টির দোকান? তা তো মসজিদের নীচেই রয়েছে।

আমি : তাহলে আর চার ক্রোশ দূরে যাবার দরকার কী ছিল? দু প্রহর গেল আর নিয়ে এসেছেন কী! এ তো কুত্তায়ও খায় না।

মৌলবী : এতটা বলবেন না। মানুষেই এসব খায়।

আমি : আপনার মতো লোকই এই বাসি পাঁউরুটি আর নীলচে ঝোল খায়।

মৌলবী : নীলচে তো না। বেশ, দই আনব?

আমি : জি, না। মাফ করুন।

মৌলবী : পয়সার জন্য ভাববেন না। আমি নিজের গাঁট থেকে দিচ্ছি।

আমি কোনো উত্তর দেবার আগেই মৌলবী সাহেব মসজিদের বাইরে চলে গেলেন। আর একটি মাটির খুরিতে বাসি টক দই এনে আমার সামনে এমনভাবে রাখলেন যেন হাতিমতাই-এর কবরখানার উপর লাথি মারলেন।

কোনোরকমে দু-চারখানি রুটি গলাধঃকরণ করে এক বদনা জল খেয়ে নিলাম। ওই দই আর ঝোল যেমন ছিল তেমনই রেখে দিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। পয়সা-কড়িও ওখানে সেইভাবে পড়ে থাকল।

আমি হাত ধোয়ার জন্য উঠে দাঁড়াতে মৌলবী সাহেব ভাবলেন, এবার আমি মসজিদ থেকে চলে যাব।

মৌলবী : আর এই পয়সা-কড়িগুলি তো উঠিয়ে নিন।

আমি : মসজিদে আমার হয়ে বাতি জ্বালাবেন।

হাতমুখ ধুয়ে নিজের জায়গায় গিয়ে বসলাম। মৌলবী সাহেবের সাথে কথা-বার্তা বলতে থাকলাম। কানপুরে মৌলবী সাহেবের সহায়তায় আমি অনেক আরাম পেলাম। ওঁরই মারফত একটি ঘর ভাড়া নিলাম আর ক্যানভাসের বিছানা, খাট, চাদর, সামিয়ানা, তামার বাসন-কোসন ও আর-সব দরকারি জিনিসপত্র কিনে ফেললাম। একজন পাচিকা আর আরেকজন ঘরের কাজ করার জন্য আর দু জন চাকর রেখে খুব ঠাট-ঠমকের সাথে রইলাম।

এবার বাজিয়েদের খোঁজ করা হতে থাকল। এমনিতেই তো অনেককে পাওয়া যায়, কিন্তু পছন্দসই হয় না। শেষে লখনৌ-এর এক তবলিয়াকে পাওয়া গেল। ইনি ছিলেন খলিফাজীর বংশের লোকদের শিষ্য। এঁর দ্বারা অনেক কাজ এগিয়ে গেল। এঁরই মারফত কানপুরের দুজন কিছুটা সমঝদার বাজনদারকেও পাওয়া গেল। এবার সব আয়োজন পুরোপুরি হয়ে যাওয়ায় সন্ধ্যে থেকে এক প্রহর দেড় প্রহর রাত পর্যন্ত ঘরে গান-বাজনা চলতে থাকল। 'শহরে লখনৌ থেকে একজন বাঈজি এসেছে' বলে সংবাদটি ব্যাপক বিস্তার লাভ করল, হরদম লোকজন আসা-যাওয়া করতে লাগল। কবিতাও চমক সৃষ্টি করল। এমন দুর্ভাগা দিন কমই ছিল যেদিন কোনো-না কোনো একটি জলসায় যাওয়া না-হত। মুজরো আসতে লাগল অজস্র। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই প্রচুর টাকা কামিয়ে নিলাম। তবুও কানপুরের লোকের চালচলন, কথাবার্তা ভালো লাগত না। বার বার লখনৌ-এর কথা মনে পড়ত। কিন্তু নিজের স্বাধীন জীবনের এমনই একটি মজা ছিল যে লখনৌ-এ ফিরে যেতে মন চায়নি। আমি জানতাম লখনৌ-এ ফিরে গেলে আমাকে আবার খানুমের ঘরের নাচিয়ে হয়েই থাকতে হবে। কেননা, এই পেশায় থেকে খানুমকে এড়িয়ে আলাদা থাকা সম্ভব ছিল না। এর একটি কারণ এই যে, সব বাঈজিই খানুমের হুকুম মানত। আমি যদি একা থাকি তবে কেউ আমার সাথে মিশবে না। দ্বিতীয় কারণ, ভালো বাজিয়ে সংগ্রহ করাও ছিল কষ্টসাধ্য। নাচের পরিকল্পনাটিই-বা কেমন করে করা যেত। যেসব রাজা-মহারাজাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারতাম তাও ছিল খানুমের মাধ্যমে। যদিও আমি সেরা গাইয়েদের একজন বলে গণ্য হতাম, কিন্তু লখনৌ-এ আমার মতো লোক ছিলেন অনেকে। সে ভালমন্দের বিচার তো করতেন বিশেষজ্ঞরাই। সাধারণ লোকের কাছে নামেই কাটে। বড় বড় লোক উঁচু দরজার দিকেই নজর দেন। এ অবস্থায় আমাকে ডাকবে কে? কানপুরে আমার যোগ্যতার চেয়েও মর্যাদা ছিল বেশি। কোনো আমির ধনীর বাড়িতে বিয়ে-শাদীর মতো এমন কোনো উৎসব ছিল না যেখানে আমাকে আমন্ত্রণ জানানোটা একটা গর্বের বিষয় ছিল না। বাইরে এসেই বুঝতে পারলাম লখনৌ

কী জিনিস!

এখানকার একজন হজরত শরিফ লখনভী ছিলেন খুব খ্যাতনামা। নিজেকে একজন খাঁটি প্রামাণ্য ওস্তাদ বলে মনে করতেন। শত শত লোক তাঁর শিষ্য। লখনৌ-এ কেউ তাঁর নামও জানত না। মনে পড়ছে এমন একটি দিনের কথা শুনুন। এক সাহেব আমার ঘরে এসে হাজির হলেন। কথাবার্তার মাঝখানে কবিতা ও কাব্য সম্বন্ধে কিছু আলোচনা হলো। শুরুতেই তিনি আমায় জিজ্ঞেস করলেন হজরত শরিফ লখনভীর নাম জান কিনা। আমি বললাম, না। কোন্ শরিফ? লোকটি ছিলেন শরিফ সাহেবের শিষ্যদের একজন। কথা শুনেই বিগড়ে গেলেন।

ভদ্রলোক: আমি তো শুনেছিলাম আপনি লখনৌ-এর।

আমি: জি, হ্যাঁ, গরিবের ঘর তো লখনৌতেই।

ভদ্রলোক: ভালো, লখনৌ-এর বাসিন্দা আর হজরত ওস্তাদের নাম জানেন না!

আমি: লখনৌ-এ বিখ্যাত কবিদের মধ্যে এমন কে আছেন যাঁর নাম আমি জানিনে, ওস্তাদদের নামই-বা কত। শিষ্যদের মধ্যে ওঁর চেয়ে কম-নামী ওস্তাদকেও জানি যাঁর কবিতা আমি শুনিনি। ওঁর স্বনামী কবিতার প্রথম পঙ্‌ক্তি পড়ুন তো। এই কাব্যিক নাম আমি তো কখনো শুনিনি। ভদ্রলোক (ভ্রূ কুঁচকে) নাম নিয়ে লাভ কি? শরিফ এই নামেই উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিম সর্বত্রই লোকের মুখে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আপনি না-জানলে না-ই জানলেন।

আমি: মাফ করবেন মশায়, এটি আমার কাছে কাব্যিক অতিশয়োক্তি। কিন্তু তিনি আপনার ওস্তাদ। আপনি তো তাঁর গুণগান গাইবেনই। আচ্ছা, তাঁর স্বনামের একটি কবিতার প্রথম লাইন বলুন। সম্ভবত আমি তাঁর কাব্যিক নামটি শুনিনি। কিন্তু নামে হয়ত চিনি।

ভদ্রলোক: মীর হাসিম আলি শরিফ।

আমি: নিশ্চিতই আমার কান এই নামের সাথে পরিচিত। (এই পর্যন্ত বলেই আমি চিন্তা করতে থাকলাম ইনি কোন্ মীর হাসিম আলি। শেষে এক ভদ্রলোকের বিষয়ে সন্দেহ হলো) আপনার ওস্তাদ তো শোকগাথা গান!

ভদ্রলোক: জি হ্যাঁ, শোকগাথায় তাঁর জুড়ি নেই।

আমি: খাঁটি কথা! মীর আর মির্জা সাহেবদের চেয়ে ইনি উঁচুদরের?

ভদ্রলোক: মীর আর মির্জা সাহেবদেরই সমগোত্রীয়।

আমি: বেশ, কার শোকগাথা পড়েন?

ভদ্রলোক: কে কার শোকগাথা পড়বে? উনি নিজেই রচনা করেন। এই সেদিনও স্বরচিত কবিতা পড়লেন, শ্রোতারা সকলেই বাহবা দিলেন।

আমি: আপনার তো তাহলে মনে আছে!

ভদ্রলোক : প্রথম পঙ্‌ক্তিটি তো মনে নেই। তবে তলোয়ারের প্রশংসায় কয়েক ছত্র পড়েছিলেন। তা আমার তো ছার, সারা শহরের লোকের মুখে মুখে ফিরছে। কী অপূর্ব লেখা!

আমি : একটু ইচ্ছে করুন, আমিও যাতে আস্বাদ নিতে পারি।

ভদ্রলোক : আলোর খাপ থেকে বেরিয়ে এল
কোরাণের ব্যথা-মুক্তোরাজি।

আমি : শোভানাল্লা এর খ্যাতি তো দূর দূর শহরে ছড়িয়ে পড়েছে। এর পাঁচটি পঙ্‌ক্তি আমার কাছ থেকে শুনুন না! আহা কি লেখা!

ভদ্রলোক : (খুবই খুশি হয়ে) জি হ্যাঁ, আপনি এই শোকগাথাটি লখনৌ-এ শুনে থাকবেন। সেই কথাই তো আমি বলছিলাম, আপনি লখনৌ-এর লোক, তার উপর আবার আপনার রয়েছে কাব্যের অনুরাগ। হজরত শরিফকে আপনি জানবেন না, সে তো অদ্ভুত! বেশ, এখন আমি বুঝেছি, আপনি মজা করছিলেন।

আমার মনে এসেছিল, বলে দিই যে, আপনার ওস্তাদ মরে গেলেও এমন কথা বলতে পারবেন না। এ তো প্রয়াত মির্জা দবির সাহেবের কবিতা। কিন্তু অন্য কথা ভেবে চুপ করে গেলাম।

রুশোয়া : সত্যি বলতে কি, আপনি খুবই বিবেচনার পরিচয় দিয়েছেন, নচেৎ বেচারার রুজিরোজগারের ক্ষতি হত। মীর হাসিম আলি শরিফ সাহেবের কথা ছেড়ে দিন। এইসব সাহেবদের প্রায়ই এই অভ্যেসটা দেখা যায়। বাইরে গিয়ে অন্যের লেখা কবিতা নিজের বলে চালিয়ে দেন। কিছুদিন আগের কথা, এক সাহেব তো আমার এক বন্ধুর খসড়া কবিতাগুলি চুরি করে দাক্ষিণাত্যে হায়দরাবাদে গিয়ে পড়তে লাগলেন। জ্ঞানী-গুণীদের প্রশংসা পেলেন। কিন্তু বুদ্ধিমানেরা তো বুঝে গেলেন। লখনৌ-এ তারপরই চিঠিপত্র এসে গেল বন্ধুদের কাছে। আসল লেখকের কাছে ব্যাপারটি পরিষ্কার হয়ে গেল। উনি হেসে থেমে গেলেন। নিজেদের নামের শেষে 'লখ্‌নভী' এই নাম অথবা ছদ্মনাম অনেক ভদ্রলোকই লিখে লখনৌ-এর বদনাম করেন। ফলে, এখন নিজের নামের শেষে 'লখ্‌নভী' লিখতে লজ্জা করে। এমন এমন মহাশয়রা 'লখ্‌নভী' লেখেন যারা পুরুষ-পরম্পরায় গাঁয়েই রয়েছেন। নিজে হয়ত-বা লখনৌ-এ পড়াশুনা করতে অথবা অন্য কোনো কারণে কিছুদিন থেকেছেন, পরে ফিরে গিয়ে খাস 'লখ্‌নভী' বনে গেছেন, যদিও এটি একটি খুব বড় কথা নয়, কিন্তু মিথ্যে বলায় কী লাভ?

উমরাও : জি হ্যাঁ, অনেক ভদ্রলোকই 'লখনৌ' নামটি বিক্রি করে নিজের সুবিধে করে নেন। কানপুরে আমারও ঠিক এই অবস্থাই ছিল। সে সময়ে রেলগাড়ি তো ছিল না, আর লখনৌ থেকেও কেউ বাইরে যেতেন না। অন্যদিকে জীবিকার জন্য রুজি-রোজগারের ধান্ধায় লোকে এখানেই আসতেন। নিজের যোগ্যতার উপযুক্ত মর্যাদা পেতেন। দিল্লী ধ্বংস হতে থাকল আর লখনৌ-এর

ঘটল শ্রীবৃদ্ধি। এ অবস্থাটিই ঘটেছে দাক্ষিণাত্যের বেলায়। লখনৌ শ্রীহীন হয়েছে আর শ্রীবৃদ্ধি ঘটল দাক্ষিণাত্যের। আমি অবশ্য দাক্ষিণাত্যে যাইনি, কিন্তু শুনেছি যে, লখনৌ-এর মহল্লা-কে মহল্লা দাক্ষিণাত্যে গিয়ে বসত করেছে।

উমরাও : যে ভদ্রলোক 'লখ্‌নভী' হওয়ার দাবি করেন তাঁকে বলুন যে প্রথমে তিনি যেন তাঁর ভাষাটির উদ্ভাবন শুধরে নেন।

রুশোয়া : কী খাঁটি কথাটিই না বলেছেন! সত্যি বলতে কি, ভাষা নিয়ে দিন তো কোনো রকমে এখনো কাটছে কিন্তু তার টানটি এখনো আসে না।

১২

সময় সময় আকস্মিক ঘটনায় এমনও হয় যে, হারিয়ে যাওয়া মানুষের দেখা মেলে।

তাও আবার এমন সব লোকের সাথে যাদের কোনো কালেই সন্ধান পাওয়া সম্ভব নয়। একটি দিনের ঘটনা শুনুন : কানপুরে রয়েছি, তা মাস ছয়েক হবে। আমার খ্যাতির এতদূর ব্যাপ্তি ঘটেছে যে গলিতে, বাজারে সর্বত্রই লোকে আমার গাওয়া গজলগুলি গেয়ে বেড়াচ্ছে। সন্ধ্যেয় আমার ঘরে প্রচুর লোক সমাগম হয়। গরমকাল। বেলা প্রায় দুটো বাজে। আমি নিজের ঘরে খাটে একলা শুয়ে আছি। চাকরানীটি রান্নাঘরে নাক ডাকাচ্ছে, একজন চাকর বাইরে বসে পাখা টানছে। খস্‌খসটি শুকনো হয়ে গেছে। চাকরটিকে খস্‌খসে জল ছিটিয়ে দেবার জন্য ডেকেছি এমনি সময়ে ঘরের নীচে দোকানে কেউ এসে জিজ্ঞেস করল, লখনৌ থেকে যে বাঈজি এসেছেন এটি কি তাঁর বাড়ি? নীচের দোকানী জবাব দিল, হ্যাঁ, এইটিই। আবার প্রশ্ন, দরজাটি কোথায়? লোকটি দেখিয়ে দিল। একটু পরেই প্রায় সত্তর বছর বয়সী এক বৃদ্ধা হাঁপাতে হাঁপাতে আর কাঁপতে কাঁপতে এসে উপস্থিত। তাঁর রং ফরসা, মুখের চামড়া কুঁকড়ে গেছে। চুল শণের মতো সাদা, কোমরটি গেছে বেঁকে। তাঁর সাদা মলমলের দোপাট্টা, পরনে মসলিনের জামা, ছাপানো পায়জামা, হাতে বড় বড় রুপোর বালা, আঙুলে আংটি, হাতে চেন। সমুখের ফরাসে এসে উনি বসলেন। সাথে দশ-বার বছরের একটি কালো মতো ছেলে। ছেলেটি রইল দাঁড়িয়ে।

বৃদ্ধা : লখনৌ থেকে তুমি এসেছ?

আমি : জি, হ্যাঁ।

আমি কথাটি বলেই পালঙ্কের থেকে নীচে নেমে পানদানটি এগিয়ে দিলাম। আর চাকরকে হুঁকো সাজতে হুকুম দিলাম।

বৃদ্ধা : আমার গৃহকর্ত্রী তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন, ছেলের জন্মবার্ষিকী, মেয়েদের মজলিশ। তোমার মুজরো কত?

আমি : বেগম সাহেবা আমাকে কী করে জানলেন?

বৃদ্ধা : সারা শহরটিতে তো তোমার গানের ধুম পড়ে গেছে। তার উপর বেগম সাহেবা নিজেই লখনৌ-এর।

আমি : আর আপনিও তো লখনৌ-এর?

বৃদ্ধা : কেমন করে জানলে ?

আমি : বাচনভঙ্গিটি কি কখনো লুকনো থাকে ?

বৃদ্ধা : হ্যাঁ, আমিও ওখানকার। ভালো, মুজরো কত নেবে বল, অনেক কাজ এখনো বাকি। আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে।

আমি : মুজরো তো আমার গোপন নেই, সকলেই জানেন পঞ্চাশ টাকা নিয়ে থাকি। কিন্তু বেগম সাহেবা লখনৌওয়ালী আর আমাকে মান দিয়ে ডেকেছেন, ওর কাছ থেকে কিছুই নেব না। কবে জলসা ?

বৃদ্ধা : আচ্ছা, উপস্থিত এই টাকাটি নাও, পরে বাকি ওখানে গিয়ে বুঝে নেবে।

আমি : (টাকা নিয়ে) এর কোনো দরকার ছিল না। তবে পাছে বেগম সাহেবা অসন্তুষ্ট হন, এই ভেবে টাকা নিলাম। আচ্ছা এবার বলুন বাড়িটি কোথায় ?

বৃদ্ধা : বাড়িটি তো একটু দূরে, নবাবগঞ্জে। এই ছেলেটি সন্ধ্যেবেলায় আসবে। এর সাথে চলে যাবে। কিন্তু যেন খেয়াল থাকে তোমার সঙ্গী-সাথী পুরুষমানুষ কেউ না থাকে।

আমি : আর বাদক ?

বৃদ্ধা : বাদক, নোকর এদের যেতে মানা নেই, তাছাড়া কিন্তু আর কেউ নয়।

আমি : জি, না। সাথে নিয়ে যাব। এখানে আমার জানাশোনা কে আছে ? এ ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকুন।

এরই মধ্যে ভৃত্য হুঁকো সেজে নিয়ে এল। তাকে ইশারায় বৃদ্ধার সামনে লাগিয়ে দিতে বললাম। বৃদ্ধা বেশ তারিয়ে তারিয়ে হুঁকো টানতে থাকলেন। আমি পানে চুন খয়ের আর ঝুড়ির মধ্যেকার পড়ে-থাকা কয়েকটি সুপুরির কুচি আর এলাচদানা ডাবরের ঢাকনার উপর গুঁড়ো করে পানের খিলি সেজে বৃদ্ধাকে খেতে দিলাম।

বৃদ্ধা : হায়, বেটি। দাঁত কোত্থেকে আনব যে পান খাব!

আমি : আপনি খান তো! আপনি খেতে পারেন এমনভাবে পান সেজেছি।

বৃদ্ধা বসে পড়ে পান নিয়ে খেলেন। খেয়ে তো ভয়ানক খুশি! আহা, আমার শহরের কি ভদ্রতার রীতি! এই বলেই আশীর্বাদ দিয়ে তিনি চলে গেলেন। চলতে চলতেই বলে গেলেন, যেন একটু বেলা থাকতে যাই। ঘণ্টাখানেক বেলা থাকতে উৎসব শুরু হবে।

আমি : মুজরো গানের রীতি এটি নয়। তবুও যাইহোক বেগম সাহেবা যখন বলেছেন সন্ধ্যে হতেই উপস্থিত হয়ে আশীর্বাদ গাইব।

বাস্তবিকই দেশের বাইরে না গেলে তার মূল্য বোঝা যায় না। কানপুরে বহু জায়গায় মুজরো হয়েছে। কিন্তু যাওয়ার এতটা আগ্রহ আর কোথাও হয়নি। মনে মনে কামনা করছিলাম এখনই যেন সন্ধ্যে হয় আর আমি রওনা হই।

গরমের দিনটি দীর্ঘস্থায়ী আর ক্লান্তিকর। খোদা খোদা করে দিনটি কাটল। পাঁচটা বাজতেই ছেলেটি এসে হাজির। আমি প্রথম থেকেই সেজেগুজে বসেছিলাম। বাজিয়েদেরও আনিয়ে রেখেছিলাম। ছেলেটি ওদের বাড়ির ঠিকানা বলে দিল। আমি পালকি চড়ে রওনা দিলাম।

বেগম সাহেবার বাড়িটি শহর থেকে প্রায় ঘণ্টাখানেকের রাস্তা। ছটার সময় সেখানে পৌঁছে গেলাম। পথের শেষ অংশটি একটি খালের ধার ধরে ফণিমনসা ও অন্যান্য কাঁটা গাছের ঘন করে বসানো বেড়া দিয়ে ঘেরা একটি বাগানে চলে গেছে। বাগানটি সাজানো ইংরেজি কায়দায়।

তাল, খেজুর আর সুন্দর সুন্দর গাছ থরে থরে সারিবদ্ধভাবে লাগানো হয়েছে। মাঝখানে লাল সুরকি বিছানো পথ। চারদিকে সবুজ ঘাসের চাদর। এখানে ওখানে কাঁকর দিয়ে পাহাড়ী স্তূপ করা হয়েছে। তার উপর আমলকি ও অন্যান্য পাহাড়ী গাছ যেন পাথর ফুঁড়ে বেরিয়ে এসেছে বলে বোধ হচ্ছে। পাহাড়ের চারধারে ঘাসের চাপড়া বসানো হয়েছে। বাগানের মধ্যে প্রতিটি চতুষ্কোণী পাকা নালায় মোতির মতো স্বচ্ছ জল বয়ে যাচ্ছে। মালিরা নালা ও ফোয়ারা থেকে গাছে জল দিচ্ছে। গাছের পাতা থেকে টপ টপ জল ঝরছে। ফুলগুলি রোদের তাপে ম্লান হয়ে গিয়েছিল, এখন জল পেয়ে তারা কেমন তরতাজা আর ফুল হয়ে উঠেছে। জন্মবার্ষিকীর অনুষ্ঠান কুঠির ভিতরে সম্পন্ন হয়েছিল। মেয়েদের গানের আওয়াজ আসছে। বাইরে আমি আশীর্বাদের গান গাইলাম। তারপর নিজেই একটি শ্যামকল্যাণ শুরু করে দিলাম। শোনার জন্য ছিল না কেউ। একলাই গানটি গেয়ে চুপ করে গেলাম। বেগম সাহেবা একটি স্বর্ণমুদ্রা আর পাঁচটি টাকা পুরস্কার পাঠিয়ে দিলেন। একটু পরেই সন্ধ্যে হয়ে গেল। চন্দ্রোদয় ঘটল। চাঁদের আলো চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। পুকুরের জলে চাঁদের প্রতিবিম্বটি তরঙ্গে দুলে দুলে একটি অপূর্ব সুন্দর দৃশ্যের অবতারণা করছিল।

বাগটির একপাশে একটি চমৎকার অট্টালিকা। বাগের মাঝখানে মজবুত করে তৈরি করা একটি পুকুর, পুকুরটির চারিপাশে নিতান্তই সুন্দরভাবে বিলাতী ফুলের টব বসানো হয়েছে। এই পুকুর সংলগ্ন একটি উঁচু চত্বর। এরই মধ্যে একটি চমৎকার খোলা কাঠের তাঁবু। তার পিলারগুলি রং করা। এই পুকুরে নালা থেকে জল পড়ছে। তার শব্দে মনে শান্তি আসে। সত্যিই জায়গাটি অপূর্ব সুন্দর। মনোমুগ্ধকর সন্ধ্যা, চমৎকার হাওয়া। রং-বেরংয়ের ফুলের গন্ধ। এরকম বসন্ত আমি আর কখনো দেখিনি। এই চত্বরে কার্পেটের উপর সাদা চাদর বিছানো রয়েছে। চেয়ারে তাকিয়া দেওয়া। এরই সামনে আমরা সব বসে পড়লাম। কুঠি থেকে এই চত্বর পর্যন্ত গোলাপ ফুলের শাখায় একটি ছাতার মতো তৈরি করা হয়েছে। মনে হলো এই রাস্তায়ই বেগম সাহেবা আসবেন। সামনে রাখা হুঁকো। চত্বরে সবুজ কাঁচের বাতিদানগুলি জ্বলে উঠল। আমার প্রতি গান করার

হুকুম এল। আমি কেদারায় একটি গান শুরু করলাম। অনেক্ষণ ধরে গাইলাম। এরই মধ্যে জনৈক চাকরানী দুটো সবুজ বাতিদান দু-হাতে নিয়ে কুঠির বাইরে এসে চেয়ারখানির সামনে রেখে দিল। বাজিয়েদের সে বলল, তোমরা এখন ঐ সামনের নোকর-চাকরদের ঘরে চলে যাও, খাবার পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এখানে এবার মহিলা-আসর বসবে।

লোকগুলি চলে গেলে বেগম সাহেবা বেরিয়ে এলেন। তাঁকে নমস্কার করে সম্মান জানাতে আমি উঠে দাঁড়ালাম। উনি আমাকে কাছে ডাকলেন। নিজে চেয়ারে বসলেন। আমাকে ইশারায় সামনে বসতে বললেন। আমি নমস্কার করে বসে পড়লাম। গাইবার হুকুম তো আগেই দেওয়া ছিল। এখন আমি গাঢ় মনোযোগ দিয়ে দেখতে থাকলাম বেগমের চেহারাখানি—

নকল যায় না করা আশ্চর্য সুন্দর চোখ তার।
এমন সুঠাম তনু সামনে দাঁড়াবে সাধ্য কার।

এই বাগান আর এই জোছনাভরা আকাশ তো আমাকে ধাঁধায় ফেলল। মনে হলো আমার সামনে পরী যেন তাকিয়া ঠেস দিয়ে বসে আছেন। চুলের সিঁথি বের করা আর চুল কোমর পর্যন্ত পড়েছে। সাদায় লালচে গায়ের রং। কপাল উঁচু, খাঁজকাটা ভুরু, গোলাপের পাতার মতো চোখ, লম্বা নাক, ছোট মুখ, পাতলা-পাতলা কোমল ঠোঁট, তাঁর সমগ্র চেহারায় এমন কিছুই ছিল না যার চেয়ে ভালো আমি কল্পনায় আনতে পারি। তাঁর সুগঠিত আর কিছুটা উজ্জ্বল শরীর চমৎকার। বহু স্ত্রীলোক আমি দেখেছি, কিন্তু এমন সুন্দরী আমি আর দেখিনি। খুরশিদের সাথে ওঁর অনেক মিল আছে সত্যি, কিন্তু কোথায় খুরশিদ আর কোথায় ইনি! খুরশিদের ছিল একটি নীচজাতীয় স্ত্রীলোকের স্বভাব, আর এঁর চেহারায় গাম্ভীর্য গরিমা ও মর্যাদা। খুরশিদকে এর সামনে বাকা-বোকা মনে হয়। তারপর এর মুখ কামিনীফুলের মতো নরম-নরম, এটি খুরশিদ পাবে কোথায়?

খুরশিদের চেহারায় অষ্টপ্রহরই একটি উদাস ভাব, কিন্তু ইনি সদাপ্রফুল্ল। যখন কথা বলেন, মুখ দিয়ে যেন ফুল ঝরে পড়ে। সব কথাতেই কারণে অকারণে হাসেন। কেউ সেটি বর্ণনা করতে অক্ষম। সরলতার মধ্যে রীতিনীতি আর গাম্ভীর্যের মধ্যে সজীবতা এরই মধ্যে দেখতে পাই। ধনীর খোশামোদ সকলেই করে, কিন্তু আমি মেয়েলোকের জাত হয়েও বলছি যে গরজে ধনীর খোশামোদ করাটা কোনো দোষের নয়। গহনাগাঁটি পোশাক-আশাকও তাঁর চেহারার সাথে মানানসই ছিল। পাতলা হলুদ রংয়ের দোপাট্টায় কাঁধ ঢাকা, লাল গ্রাণ্টের পায়জামা, কানে পদ্মরাগ মণির টাব, নাকে হীরের নাকছাবি, গলায় সোনার হার, হাতে সোনার বালা, বাহুতে নবরত্নের তাগা, পায়ে সোনার মল, চেহারার সৌন্দর্য, পরিচ্ছদের সারল্য আর পছন্দসই গহনাগাঁটি সবই ছিল আমার সামনে।

আর আমি অবাক হয়ে এই অপূর্ব চেহারা দেখছিলাম। আমারও যা চেহারা ছিল সে তো আপনার সামনেই রয়েছে, কিন্তু বিশ্বাস করুন উনি আর কোনো দিকেই দৃষ্টিপাত না করে আমাকেই শুধু দেখছিলেন। দুজনেই পরস্পরের দিকে তাকাচ্ছিলাম। বারবার আমার একটি কথা মনে আসছিল, কিন্তু তা প্রকাশ করার সময় পাইনি। কী করে যে বলি! একটি দাসী তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে পাখার হাওয়া দিচ্ছিল আর দুজন ছিল সামনে দাঁড়িয়ে। একজনের হাতে রুপোর জবা। আরেকজনার হাতে পানের ডিবে। অনেক্ষণ পর্যন্ত বেগম সাহেবা বা আমি কেউই কথা বলিনি। শেষে উনি কথার সূত্রটি এইভাবে ধরলেন—

তোমার নাম কি?

আমি: (হাত জোড় করে) উমরাওজান।

বেগম: খাস লখনৌ-এ বাড়ি?

(এই প্রশ্নটি উনি এমন ভঙ্গিতে করলেন যে, আমার পক্ষে জবাব দেওয়া মুশকিল হয়ে গেল। বিশেষত এই সময়ে এই কারণে যে, যদি আমি বলি লখনৌ-এ আমার বাড়ি তবে আমার একটি মতলব কাজে আসবে না, আর যদি বলি না, তবে অসময়ে একটি গোপন কথা ফাঁস হয়ে যায়। শেষে অনেক বিচার বিবেচনা করে)—

আমি: জি, হ্যাঁ, লালিত-পালিত হয়েছি লখনৌ-এ।

(জবাব যা দেবার দিয়েই সাথে সাথে খেয়াল হলো যে, এবার প্রশ্ন করলেই সেই ব্যাপারটা আবার সামনে এসে যাবে। আমার এ ভাবনাটি মিথ্যে ছিল না।) বেগম সাহেবা তৎক্ষণাৎ প্রশ্ন করলেন—

তবে কি তুমি লখনৌ-এ জন্মগ্রহণ করনি?

(ভেবে ব্যাকুল হলাম কী এর জবাব দেব। কিছুক্ষণ এই ভান করলাম যেন শুনতে পাইনি। শেষে এই প্রসঙ্গটি বদলে বললাম)

হুজুরানীর বাড়ি কি লখনৌ-এ?

বেগম: লখনৌ-এ ছিল এক সময়ে। এখন তো কানপুরের হয়ে গেছি।

আমি: আমারও এই ইচ্ছে।

বেগম: কেন?

আমি: (এই প্রশ্নটিরও জবাব দেওয়াটা ছিল বেশ শক্ত, কেননা কোন্ গল্প বলব) এখন কি আর বলব, শুধুই আপনার কর্ণপীড়া সৃষ্টি করা। কিছু ঘটনা ঘটে যাওয়ায় মন আর লখনৌ যেতে চাইছে না।

বেগম: যাক্ গে, ভালো লাগে তো আমার এখানে কখনো কখনো চলে এসো।

আমি: আসব কি, এখান থেকে যেতেই তো আমার মন চাইছে না। প্রথমত আপনার মতো গুণগ্রাহী, তার উপর আবার এই বাগান, এই আকাশ। একবার যে এসব দেখবে দ্বিতীয়বার তার আর জ্ঞান থাকা সম্ভব নয়। বিশেষ

করে এই ধরনের মেজাজী মেয়েদের তো এখানকার জলবায়ু টনিকের কাজ করে।

বেগম : আহা, তোমার এই জায়গাটি খুব পছন্দ! কোনো পুরুষমানুষ নেই এখানে এক খোদা ছাড়া। শহর থেকে কয়েক ক্রোশ দূর। চার পয়সার কোনো জিনিস আনতে যদি লোক পাঠাও তবে সে যাবে সকালে আর ফিরবে সন্ধ্যেয়। বনটি ছোঁও আর শয়তানকে কানা হয়ে যেতে দাও। কারো অসুখ হলে শহর থেকে ডাক্তার আনতেই এদিকে তার সব শেষ।

আমি : হুজুরানী, যার যা অভিলাষ। আমার তো জায়গাটি খুবই পছন্দ। আমি তো জানি এখানে থাকলে আমার আর কোনো জিনিসের দরকার হবে না, তারপর, এখানে থাকলে অসুখ কি করে হবে?

বেগম : প্রথম প্রথম এখানে এসে আমারও এই ধারণাই হয়েছিল। কিছুদিন থাকার পরই বুঝতে পারলাম শহরের লোক এমন জায়গায় থাকতে পারে না। শহরে রয়েছে হাজারো রকমের আরাম। অন্যসব কথা ছেড়ে দিলেও নবাব যেদিন থেকে কলকাতায় গেছেন, ভয়ে আমার রাতের ঘুম গেছে উবে। এমনিতেই তো খোদার দয়ায় সিপাই, পাহারাদার, চাকর-বাকর এই সময়ে দশ-বার জন রয়েছে আর মেয়ে দাসী তো অঢেল, তবুও ভয় করে। আমি আর দু-চারদিন দেখব। নবাব (তাঁর অনেক পরমায়ু হোক) আসলেই শহরে ঘর ভাড়া নিয়ে থাকব।

আমি : অপরাধ নেবেন না, আপনি কল্পনা-বিলাসে আছেন। এই ধরনের সন্দেহ কখনো মনে আনবেন না, যে শহরে গেলে নিরাপদে থাকবেন। সেখানে এমনই গরম যে লোক ঘুমোতে পারে না। আর অসুখ-বিসুখে খোদা যেন আশ্রয় দেন।

এমনি সব কথাবার্তার মধ্যে ধাত্রী বাচ্চাটিকে নিয়ে এল। তিন বছরের শিশু। খোদার দোয়ায় রং ফরসা, ময়নার মতো মিঠে মিঠে বুলি। বেগম ধাত্রীর কাছ থেকে ছেলেটিকে নিয়ে নিজের কোলের উপর বসালেন তার সাথে একটুখানি খেলা করে ধাত্রীর কাছে যেই দিতে যাবেন, আমি হাত বাড়িয়ে নিয়ে নিলাম। অনেকক্ষণ ধরে তার সাথে খেলা করলাম তারপর ধাত্রীর কাছে তাকে দিলাম।

আমি : এমনিতে হয়ত আসতাম না। কিন্তু কর্তাকে দেখার জন্য নিশ্চয়ই আসব।

বেগম : (মুচকি হেসে) আচ্ছা যেভাবেই হোক, আসবে নিশ্চয়ই।

আমি : নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই আসব, বার বার একথা বলছেন কেন। আমি এমন করে আসব যেন কর্তার একটি বোঝা হয়ে পড়ি।

এরপর একথা-সেকথা চলতে থাকল। বেগম আমায় গানের খুব তারিফ করলেন। এর মধ্যে পাচিকা এসে জানাল ভোজ তৈরি। বেগম বললেন, চল যাওয়া যাক।

আমি : ভালো কথা।

বেগম গদি আঁটা চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালেন, আমিও সাথে সাথে উঠলাম। তিনি আমার হাত ধরলেন। চাকরদের বললেন, তোমরা এখানে থাকো আমরা খানা খেয়ে এখানেই আসব।

আমি সত্যি বলতে কি আমার এই সময়টি এত ভালো লাগছে যে, খানা খেতে ইচ্ছে করছে না। কিন্তু কী করব হাকিমের হুকুম!

বেগম : তবে কি খাবার এখানে আনিয়ে নেব?

আমি : জি না, বেশ, খাবার খেয়ে এখানেই চলে আসব।

বেগম : (একজন চাকরকে) এঁর সাথের লোকজনদের খাবার দেওয়া হয়েছে কি?

চাকর : (হাত জোড় করে) হুজুর দেওয়া হয়েছে। আচ্ছা, ওঁদের ফেরত পাঠিয়ে দাও, পরের মুজরো আর হবে না। উমরাওজান খানা খেয়ে যাবে।

এরপর বেগম আর আমি ঘরের দিকে চলে গেলাম। একজন ভৃত্য আগে আগে বাতি নিয়ে চলল। বেগম সাহেবা চুপি চুপি আমার কানে কানে বললেন, তোমাকে অনেক কথা বলার আছে। আজ কথা বলার সময় পাব না, কালও আমার অবসর নেই। পরশুদিন তুমি সকালে আসবে আর খানা এখানেই খাবে।

আমি : আমারও কিছু প্রার্থনা আছে।

বেগম : আচ্ছা, তবে আজ কিছু বলো না, প্রথমে চল খানা খাই, তারপর তোমার গান শুনব।

আমি : আপনি তো বাজিয়েদের ফেরত পাঠিয়ে দিলেন

বেগম : পুরুষমানুষদের সামনে আমার গান ভালো লাগে না। আমার নিজস্ব মেয়ে তবলচী আছে, খুব ভালো বাজায়। তার সাথে গান করবে।

আমি : খুব ভালো।

এবার আমরা কুঠির পাশে এসে গেছি। প্রকাণ্ড অট্টালিকা। আর সাজসজ্জা এমনই যে, বাদশার প্রাসাদে তা দেখার পর এই কুঠিতেই দেখলাম। প্রথমে পড়ল বারান্দা। তারপরে কয়েকটি কুঠরি পার হয়ে গেলাম, প্রত্যেকটি কামরা নব নব রীতিতে সাজানো। প্রত্যেকটি কামরায় একেকটি নতুন রংয়ের আর নতুন রীতিতে ফরাস বিছিয়ে দেওয়া আর কাঁচের সামগ্রী রাখা আছে। শেষে আমরা টেবিলক্লথ ভাঁজ করে রাখা একটি কামরায় গিয়ে পৌছলাম টেবিলক্লথ নিয়ে দুজন স্ত্রীলোক আদেশের অপেক্ষায় ছিল। ঐ দুজনের একজন চিঠিপত্র লেখিকা আরেকজন সঙ্গিনী। দুজনের পরিধেয়ের বেশ চাকচিক্য, চেহারাও দুজনের ভালো।

টেবিলক্লথের উপর পোলাও, বিরিয়ানি, জাফরানা পোলাও, ভেড়ার মাংসের পোলাও, সবেদা, পায়েস, বাখরখানি, কয়েক পদের ব্যঞ্জন, কাবাব, আচার,

মোরব্বা, মিঠাই, দই, ক্রিম—আশ মিটিয়ে খাওয়ার নানা আয়োজন। লখনৌ থেকে বেরিয়ে আসার পর খাওয়ার স্বাদ আজ পেলাম। বেগম নানান ধরনের জিনিস আমার সামনে রেখে দিচ্ছিলেন। আমার কিন্তু খেতে বেশ কষ্ট হচ্ছিল। তাঁর পীড়াপীড়িতে প্রয়োজনের চেয়েও বেশি খাওয়া হয়ে গেল।

হাত মুখ ধোয়ার পাত্র আর ব্যাসমদান এল। আমরা হাত মুখ ধুয়ে পান খেয়ে আবার সেই চত্বরে এসে হাজির হলাম। জলসা জমে উঠল। এই জলসায় শুধু বেগম সাহেবাই ছিলেন না। পত্রলেখিকা, সঙ্গিনীরা, পরিচারিকা, দাসী ইত্যাদি দশ-বার জন স্ত্রীলোকও ছিল।

বেগম সাহেবা তবলাজোড়া আর সেতার আনতে হুকুম দিলেন, তবলা বাজাতে পারদর্শিনী এক সঙ্গিনী তবলা বাজাতে লাগলেন, আর বেগম সাহেবা নিজেই সেতার বাজাতে থাকলেন, আমার উপর হুকুম হলো গান গাইবার।

খেতে খেতেই দশটা-এগারটা বেজে গিয়েছিল। যখন গান গাইতে বসলাম তখন ঠিক বারটা। ওই সময়ে বাগানটি—যে বাগানে বহু টাকা ব্যয় করে নকল পাহাড় জঙ্গলের ঝাড় তৈরি করা হয়েছিল—অপূর্ব সুন্দর দেখাচ্ছিল। এই সুরম্য অট্টালিকার এক কোনা থেকে ঘন গাছের শাখা-প্রশাখার ভিতর দিয়ে চাঁদ নজরে পড়ছিল। কিন্তু সে চাঁদের এখন অস্ত যাওয়ার পালা। তারার মিটমিটে আলো ছড়িয়ে পড়ছিল, তার ফলে হরেক জিনিসই ভয়ানক হয়ে দেখা দিচ্ছিল। গাছগুলি যত না বড় তার চেয়েও বড় বলে মনে হচ্ছিল। শন্‌শন বায়ু বয়ে যাচ্ছিল। গাছের মাথায় সাঁইসাঁই শব্দ। চারিদিক নিস্তব্ধ। কিন্তু পুকুরে জলের শব্দটি শোনা যাচ্ছিল আরও জোরে।

কখনো-সখনো একটি পাখি তার বাসা থেকে আচমকা ডেকে উঠছে, আবার কখনো-বা পাখিরা শিকারী জানোয়ারদের কাছ থেকে পালাতে গিয়ে পাতাও খড়খড় শব্দ তুলছে, আবার কখনো-বা পুকুরে মাছ লাফিয়ে উঠছে। ব্যাঙ অর্থহীন তান ধরেছে আর ঝিঁঝিঁ পোকা তাতে দিচ্ছে তাল। যে চত্বরে এই জলসাটি বসেছিল সেখানে ঝকমকে পোশাক আর আপাদমস্তক গয়নায় ভরা দশ-বার জন যুবতী স্ত্রী ছাড়া আর আশেপাশে কেউই ছিল না। হাওয়ার ঝাপ্টায় বাতি নিভে গিয়েছিল। শুধু দুটি বাতি টিম্‌টিম্ করে জ্বলছিল, তাও আবার সবুজ কাঁচের বাতিদানের মধ্যে। আর ছিল পুকুরের তরঙ্গে তরঙ্গে কাঁপা তারার আলোর ঝিকিমিকি। চারিদিক অন্ধকার, রহস্যময়। সময় আর কুঠির সাথে সামঞ্জস্য রেখে আমি সোহিনী রাগ গাইতে শুরু করলাম। এই রাগিণীর ভয়ঙ্কর সুর মনে বেশ প্রভাব বিস্তার করল। সবাই ভয়ে জড়সড় হয়ে বসেছিল। ভয়ে বাগানের দিকে কেউ তাকাতে পারছিল না, বিশেষ করে ঘন গাছের তলায় পুঞ্জীভূত আঁধারের দিকে। সবাই একে অন্যের মুখ দেখছিল। জলসাটি ছিল যেন একটি শান্তির জায়গা আর যেখানে চোখ তুলে তাকালে দেখা যাবে এক সমতল

মরুভূমি। অন্যের আর কি-ই-বা কথা আমার নিজেরই বুক ধড়াস ধড়াস করছিল। মনে মনে বলছিলাম, বেগম ঠিকই বলেছিলেন, সত্যিই এটি থাকার উপযুক্ত জায়গা নয়।

তার মধ্যে শিয়ালের ডাক শোনা গেল। তাতে মন আরও গেল দমে। তার-পর ডাকতে লাগল কুকুর। অবস্থা এমনই হলো যে ভয়ে কারো মুখ থেকে কথা সরে না। এমনই সময়ে বেগম তাকিয়া থেকে দেহখানি তুলে সামনের দিকে দেখেই সজোরে একটি চিৎকার করলেন। আর চেয়ারে ঢলে পড়লেন। অন্য সব স্ত্রীলোক সেই দিকেই দেখতে থাকল, ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম আমিও।

বেগম সাহেবাকে আমি ধরে নিয়েছিলাম কল্পনাপ্রবণ বলে। কিন্তু এখন যা দেখলাম তাতে তাঁর কল্পনার বাস্তবতা নজরে পড়তে লাগল। সামনের দিক থেকে মুখ কাপড় দিয়ে ঢাকা, খোলা তলোয়ার হাতে দশ-পনের জন লোককে ছুটে আসতে দেখা গেল। স্ত্রীলোকদের চিৎকারে বেগম সাহেবার নোকর চাকর সেবক সবাই ছুটে এল — এদিকে কারো হাতে কিছু নেই আর কারো হাতে-বা লাঠি। ডাকাতরা সংখ্যায় অনেক বেশি আর এপক্ষের লোক কম। তার মধ্যে আবার জনাকয়েক রাস্তা থেকেই পালিয়ে গেল। চার-পাঁচ জন লোক চত্বরে পৌঁছে গেল। ওরা এসেই স্ত্রীলোকদের ঘিরে দাঁড়িয়ে লড়াই করে মরার জন্য স্থির-সংকল্প হয়ে দাঁড়াল। মেয়েরা তো সব বেহুঁস পড়ে রইল। খোদা জানেন কেন, মনটি ছিল আমার পাথরের মতো শক্ত, তাই বসে রইলাম। ভয়ে যেন দম বন্ধ হয়ে আসছে। হায় আল্লা, দেখা যাক কি হয়।

বেগম সাহেবার লোকজনদের মধ্যে যাদের কাছে লড়াই করার অস্ত্রশস্ত্র ছিল তারা এগিয়ে যেতে চাইলে সরফরাজ নামের একজন তাদের বারণ করল।

সরফরাজ : (নিজের সঙ্গীদের) থামো, এখন ব্যস্ত হয়ো না, প্রথমে ঐসব লোকদের উদ্দেশ্যটি আমাকে বুঝতে দাও। (ডাকাতদের দিকে লক্ষ করে) তোমরা কি উদ্দেশ্যে এসেছ?

জনৈক ডাকাত : যে উদ্দেশ্যে এসেছি, তুমিও তা টের পাবে।

সরফরাজ : সেকথাটিই আমি জিজ্ঞেস করছি, তোমরা কী নিতে চাও, জান না মাল?

দ্বিতীয় ডাকাত : আমাদের জান নেবার কোনো দরকার নেই, আমরা তো আর পিতৃহত্যার বদলা নিতে আসিনি। হ্যাঁ, বাধা দিলে তখন দেখা যাবে।

সরফরাজ : (একরকম দৃঢ় হয়ে) তবে কি বউ-বেটিদের ইজ্জত নেবে? কিন্তু সে মতলব থাকলে ...

সরফরাজ কথাটি পুরো শেষ না করতেই ডাকাতদের মধ্য থেকে কে একজন বলল —

না সাহেব, কারো বউ-বেটিকে কি দরকার, আমাদেরও কি বউ-বেটি নেই?

মেয়েদের গায়ে হাত দেবে কে ?

এই আওয়াজে আমার একটু সন্দেহ হলো

সরফরাজ : (খুশি হয়ে) আমি তো তা-ই জিজ্ঞেস করছি।

আচ্ছা ভাইরা আমি এখনই কামরাগুলোর চাবি আনিয়ে দিচ্ছি আর মেয়েদের এখানে জড়ো করবার ব্যবস্থা নিচ্ছি। ঘরের মালিক বেগম সাহেবা এখানেই আছেন। তোমাদের যার যা ইচ্ছে উঠিয়ে নিয়ে যাও। স্ত্রীলোকেরা তাঁদের গয়নাগুলিও খুলে দিচ্ছেন। আমাদের মালিক এতে গরিব হয়ে যাবে না। খোদার হুকুমে লাখ লাখ টাকা ব্যাঙ্কে জমা রয়েছে, আর জমিদারি থেকে যা আসে তার তো কথাই নেই—

ডাকাত : এর চেয়ে ভালো কথা আর কী আছে! কিন্তু দেখো, যেন কোনো চালাকি না করা হয়।

সরফরাজ : সিপাইদের ছেলেরা চালাকি করে না, বিশ্বাস কর।

যে ডাকুর গলার স্বর আমি চিনতে পেরেছিলাম সে এগিয়ে এল।

'বাঃ, বেশ বলেছ! পুরুষের কথা তো! উত্তম সমাধান'—এই পর্যন্ত বলতেই তার সাথে আমার চোখাচোখি হয়ে গেল। আমি চিনতে পেরেছি। কথা বলার চেষ্টা করলাম। কিন্তু মনে এত ভয় ঢুকে গিয়েছিল যে মুখ দিয়ে আওয়াজ বেরল না। এর মধ্যে সে নিজে এগিয়ে এসে বলল, ভাবী, তুমি এখানে কী করে এলে ?

আমি : তোমার ভাইয়ের জেল হওয়ার পর থেকেই এখানে আছি।

ফজল আলি : এখানে কার কাছে ?

আমি : থাকি তো আমি শহরে, তবে আমার এক বোন বেগম সাহেবার দাসী, তার সাথে দেখা করতে এসেছি।

ফজল আলি : তোমার বোন কোথায় ?

আমি : এখানেই আছে। তোমরা আসায় যে হাঙ্গামা শুরু হলো তাতে সে বেচারী ভয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। সে তো আর আমার মতো নয়। বেচারী পর্দানসীন, যৌবনে বিধবা। সম্ভ্রান্ত রাজা বড়লোকের ঘরে দাসীগিরি করে।

ফজল আলি : (নিজের সাথীদের) এখান থেকে একটি পয়সারও জিনিস নেওয়া তো আমার কাছে হারাম আর এখানকার এই ব্যাপারে আমি তোমাদের সাথেও থাকব না।

জনৈক ডাকু : এ আবার কি ? তবে এলেই-বা কেন ?

ফজল আলি : যে উদ্দেশ্যে আসা তা তোমরা জানোই, কিন্তু কারো কোনো খেয়াল আছে কি ? ফৈজু ভাইয়ের বিবি আর তার বোনের জিনিসপত্তর লুটে নেব বা যাদের সাথে তার সম্পর্ক রয়েছে তাদের উপর অত্যাচার করব! সে যদি জেলখানায় বসে এটি শোনে তো বলবে কী ?

এ কথায় ডাকাতদের মধ্যে ঝগড়া লেগে যেতে পারত কিন্তু সবাই ফজল

আলিকে মানে। কেউই ওর কথার বাইরে যেতে পারে না, আবার একদম খালি হাতে যে ফিরে যাবে কথাটি তেমন সহজও নয়। ডাকুরা গোলমাল করতে থাকল : উপোস করে মরছি, যদিও-বা একটা মওকা মিলে গেল তা খান সাহেব আবার ছেড়ে দিচ্ছেন, তবে খাব কী ?

ফজল আলি যখন দল ছেড়ে পৃথকভাবে এসে দাঁড়াল তখন তার সাথে সাথেই কালোটে একটি লোক এই কথা বলতে বলতে বেরিয়ে এল —

ভালো করে লক্ষ করে দেখি যে, লোকটি ফয়েজ আলির সহিস। আমি ওকে ডেকে আনিয়ে পৃথক একটি জায়গায় গিয়ে বেগম সাহেবা যে স্বর্ণমুদ্রা আর পুরস্কারের টাকা আমাকে দিয়েছিলেন তা চুপিচুপি দিলাম।

ফজল আলি : (সরফরাজ খাঁকে) ভাই আমি তোমার সাথে আছি। এখন তুমি আর এইসব লোক বোঝাপড়া করে নাও।

সরফরাজ : লোকদের এখনই রাজি করিয়ে দিচ্ছি, কিন্তু এখান থেকে চল। স্ত্রীলোকেরা বিহ্বল হয়ে পড়েছেন। মালিকা অজ্ঞান হয়ে পড়ে রয়েছেন। ওঁর একটু হুঁশ আসতে দাও, আমি তোমাদের খুশি করে দেব।

ডাকাতরা ওখান থেকে চলে গেল। বেগম সাহেবা তখনও বেহুঁশ হয়ে পড়ে-ছিলেন। দাঁতে দাঁত লেগে গিয়েছিল। আমি পুকুর থেকে আঁজলা ভরে জল এনে ওঁর মুখে-চোখে ছিটিয়ে দিলাম। অতিকষ্টে তাঁর জ্ঞান ফিরে এল। আমি তাঁকে বললাম, কাপড়-চোপড় সামলে নিয়ে বসুন, খোদার দোয়ায় আপদরা বিদায় নিয়েছে। এখন নিশ্চিন্ত থাকুন। অন্যান্য স্ত্রীলোকদেরও চোখে-মুখে জলের ঝাপ্টা দিয়ে উঠিয়ে দিলাম। সবাই উঠে বসল। সবাই শান্ত হলে আমি বেগম সাহেবাকে সব খুলে বললাম। বেগম সাহেবা খুব খুশি হয়ে সরফরাজকে ডেকে পাঠালেন।

সরফরাজ : কর্ত্রী কিছু দিয়ে দিন। তাছাড়া কোনো কাজ হবে না, এ সময়ে উমরাওজান এখানে না থাকলে ওরা সরে দাঁড়াত না।

এ কথার কোনো জবাব দিলাম না এই জন্য যে আমি বুঝতে পেরেছিলাম এই গোপন কথাটি এ সময়ে মুখ ফসকে বেরিয়ে গেছে। এ সময়ে এমনি ধারা কথা বলাটা ওর পক্ষে অমর্যাদাকর।

আমি : আমি আর কি করেছি, তাও তো আকস্মিক!

সংক্ষেপে বললে বেগম সাহেবা ছোট সিন্দুকটি আনিয়ে তার মধ্য থেকে পাঁচশ টাকা নগদ আর পাঁচশ টাকার সোনা-রুপোর গয়না ডাকাতদের দিয়ে ফিরিয়ে দিলেন। সবারই যেন ধড়ে প্রাণ এল। বেগম সাহেবার এই সময়ের কথাটি আজও আমার মনে আছে —

কি উমরাওজান, বাগানে থাকার মজাটি তো দেখলে!

আমি : হুজুর সত্যিই বলেছিলেন।

রাত তিনটে বেজে গিয়েছিল। সবাই উঠে কুঠির দিকে গেলেন। আমিও উঠলাম এঁদের সঙ্গে। কুঠির বারান্দায় আমার জন্য একখানি খাটিয়া পাঠিয়ে দেওয়া হলো। ঘুম কি আর আসে। সারারাত জেগে রইলাম। সকাল হতেই সবাই শুয়ে পড়ল। আমারও চোখ লেগে গিয়েছিল। ঘুমটি পুরো হয়নি। এমনি সময়ে আমার চাকরটি পালকি নিয়ে এসে আমাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে দিল।

আমি : চোখ ডলতে ডলতে বাইরে এলাম।

ভৃত্য : আপনি তো এখানে বেশ রয়েছেন, আর আমরা সারা রাত পথের দিকে তাকিয়ে আছি।

আমি : যেতাম কী করে, গাড়ি তো ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছিলাম।

ভৃত্য : বেশ, তা এখন চলুন। আপনার কাছে লখনৌ থেকে লোক এসেছে।

আমি বুঝতে পেরেছিলাম আর কেউ হোক-না হোক, হুসেনি পিসি আর গৌহর মির্জা হবে। ওরা শেষপর্যন্ত আমার খোঁজ পেয়েছে।

আমি : আচ্ছা যাচ্ছি, পালকি নিয়ে এসেছ ?

ভৃত্য : আছে।

যখন যাওয়ার কথা ভাবছিলাম, দু'একজন স্ত্রীলোক তখন জেগে গিয়েছিলেন। তাঁরা আমায় বাধা দিয়ে বললেন, বেগম সাহেবার সাথে দেখা করে যান। আমি বললাম, এখন সময় কম, বেগম সাহেবা কখন যে ঘুম থেকে উঠবেন, খোদা জানেন। সেরকম হলে আবার আসব।

১৩

ঘরে ফিরে দেখি যে হুসেনি পিসি আর গৌহর মির্জা বসে আছেন। হুসেনি পিসি আমার গলা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলেন। আমিও কাঁদতে থাকলাম।

হুসেনি পিসি : আল্লা! বেটি, মনটি তোর কী শক্তই না করেছিস। কারো উপর কি তোর কোনো স্নেহ-মমতা নেই?

আমি নিজেই ছিলাম খুব লজ্জিত। তাই শুধুই কাঁদতে থাকলাম।

সাধারণ কথাবার্তা বলার পর হুসেনি পিসি ঐ দিনই লখনৌ ফেরার সংকল্প করলেন। আমি থেকে যাওয়ার জন্য অনেক জিদ করলাম কিন্তু উনি মানলেন না। বেশি তাড়াহুড়ো করার কারণ এই যে মৌলবী সাহেব ছিলেন অসুস্থ। কোথাও তাঁর থাকা কষ্টকর। আবার আমাকে এত ভালবাসতেন যে তাঁকে ফেলে চলেও এসেছিলেন। সেদিনটি কাটল কানপুর থেকে জিনিসপত্তর কেনা-কাটায়। আর ঘরভাড়া, চাকর-বাকরদের মাইনে ইত্যাদি মিটিয়ে দিলাম। পুরো ঘরকন্নার জিনিস ভাড়ায় নিয়েছিলাম। দরকারী জিনিসগুলি রেখে বাকি সব চাকর-বাকরদের দিয়ে দিলাম। দ্বিতীয় দিনে গেলাম লখনৌ। ফের সেই দানা-পানি, সেই বাড়ি, সেই ঘর, সেই লোক—

লক্ষ্যহীন জনারণ্যে ঘুরেফিরে
ঘটেছিল চিত্তের বিক্ষেপ
অনুরাগী বন্ধু সব ঘিরে ফের
সে কারায় করেছে নিক্ষেপ।
এই ভয় বয়ে যাওয়া ঝড়ের মতন
উসকে তোলা এর এই চকিত স্ফুরণ
দেখুন তো কতদুর ঘাবড়ে দেয় মন।

বেগম মালিকা কিশোরের সময় থেকে শুরু করে অযোধ্যার শেষ নবাবের সময় পর্যন্ত এই শোকগাথা পড়ার রীতি চালু ছিল। এই সময়ের মধ্যে শাহজাদা সিকন্দর হশমত ওরফে জেনারেল সাহেবের সাথে আমারও পরিচয় হয়ে গিয়েছিল। জনাব আলি আর জেনারেল সাহেব কলকাতায় চলে গেলেন, আর ওদের তালুকমুলুক নষ্ট হয়ে গেল।

যখন বিদ্রোহী সিপাহীরা মির্জা ব্রিজিসকদরকে রাজ্যের সিংহাসনে বসিয়ে দেয় তখন তাঁর অভ্যর্থনা সভায় আমার ডাক পড়ে। কেননা শাহী মহলে তখন আমার

নাম লোকের মুখে মুখে। শহরে তখন এক ভয়ংকর দুর্যোগ। আজ এর বাড়ি লুঠ হয়ে গেল, কাল ও গ্রেপ্তার হলো, পরশু এর গুলি লাগল। চারদিকে দেখছি যেন শেষ-বিচারের দিন সমাসন্ন। সামরিক অফিসারদের মধ্যে সৈয়দ কুতুবুদ্দিন নামে একজন অফিসার রাজপ্রাসাদে নিযুক্ত ছিলেন। আমার অবস্থা দেখে নিতান্তই কৃপা করতেন। এজন্য প্রায়ই সেখানে থাকতে হত। মুজরোর জন্যও সময়ে-অসময়ে ডাক পড়ত।

কয়েকদিনের জন্য রাজত্বের এই কালে ব্রিজিস্‌কদরের ১১তম জন্মবার্ষিকীর অনুষ্ঠানটি বড়ই ধুমধামের সাথে হয়। এই জলসায় কাশ্মীরী গাইয়েরাও গজল গেয়েছিলেন — চন্দ্রকেও লজ্জা দেন ব্রিজিসকদর।

অমূল্য রতন যেন ব্রিজিসকদর॥

আমিও এ উপলক্ষে কবিতা লিখেছিলাম, তার প্রথম লাইনটি এই —

তোমার এ সরলতা জাগাবে হাজার প্রাণে সাড়া।

তাদেরও বাসবে ভালো তোমার অনিষ্ট খোঁজে যারা॥

রুশোয়া : উমরাওজান, এই প্রথম লাইনটিতে একটি অসাধারণ কথা বলেছ। আর কোনো কবিতা মনে থাকলে বল।

উমরাও : এগারটি কবিতা পড়েছিলাম কিন্তু আপনার মাথায় দিব্যি, এই লাইনগুলি ছাড়া আর কিছুই মনে নেই। সেই সময়টি ছিল এমনই বিপদসঙ্কুল। দুর্ভাগা দিনে-রাতে বুকটা ধড়ফড় করত। গজলটি টুকরো কাগজে লিখে নিয়েছিলাম বেগম সাহেবা যেদিন কাইজারবাগ ছেড়ে যান সেদিন পর্যন্তও ওই কাগজখানি আমার পানের ডিবের মধ্যে ছিল। আবার যেদিন ওখান থেকে বেরতে হলো সে-সময় ভয়-ভীতির মধ্যে পানের ডিবে তো হারিয়ে গেলই তার সাথে গেল জুতো, দোপাট্টাও।

রুশোয়া : ভালো, কাইজারবাগ থেকে বেগম সাহেবা কোন্‌দিন চলে গিয়েছিলেন কিছু মনে আছে কি ?

উমরাও : দিনটি তো মনে নেই, রজবের দ্বিতীয় বা তৃতীয় দিন।

রুশোয়া : হ্যাঁ, তোমার ঠিকই মনে আছে রজবের ২৯ তারিখ। ভালো, কোন্‌ ঋতু ?

উমরাও : শীতের শেষ। মনে হয় নওরোজের চার-পাঁচদিন বাকি ছিল।

রুশোয়া : আগাগোড়া ঠিক। মার্চের ষোল তারিখ। আচ্ছা, তুমি বেগম সাহেবার সাথে কাইজারবাগ থেকে বেরিয়ে পড়লে ?

উমরাও : জি, হ্যাঁ। বুন্দি পর্যন্ত একসাথে ছিলাম। রাস্তায় নিমকহারাম আর কাপুরুষ সেনাবাহিনীর অফিসারদের চুগলখোরীর কথা জীবনভর ভুলব না। এক সাহেব বললেন, 'নাও বেগম সাহেবার রাজত্বে আমরা পায়ে হেঁটে যাব নাকি ?' দ্বিতীয় সাহেব বলছেন, 'ভালো খাওয়ার ঠিকমত ব্যবস্থা হলে।'

তৃতীয় সাহেব আফিম পেটে পুরছিলেন, চতুর্থজন সময়মত হুঁকো পাচ্ছেন না বলে মড়াকান্না জুড়ে দিয়েছিলেন। বহরাইট থেকে ইংরেজ সৈন্য বুন্দির উপর হামলা চালালে সৈয়দ কুতুবুদ্দিন মারা গেলেন। বেগম সাহেবা নেপালের দিকে রওনা দিলেন। আর আমি প্রাণ বাঁচিয়ে এসে গেলাম ফৈজাবাদ।

রুশোয়া : শুনেছি, বুন্দিতে কিছুদিনের জন্য আমোদ-প্রমোদ শুরু হয়েছিল।

উমরাও : আপনি শুনেছেন, আর আমি চোখে দেখেছি। লখনৌ থেকে ভাগনেওয়ালারা সব ওখানে গিয়ে জমা হয়েছিল। বুন্দির বাজার হয়ে গিয়েছিল যেন লখনৌ-এর চক।

রুশোয়া : আচ্ছা, এ গল্পে আমার বেশি আগ্রহ নেই। ফয়েজ আলির কাছ থেকে যেসব গয়নাগাঁটি আপনি পেয়েছিলেন তার কী হলো বলুন।

উমরাও : (একটি নিরুত্তাপ আহ্ করে) এটি জিজ্ঞেস করবেন না।

রুশোয়া : বিদ্রোহের সময় সব লুটপাট হয়ে গিয়েছিল ?

উমরাও : বিদ্রোহের সময় লুটপাট হয়ে গেলে এত আফসোস হত না।

রুশোয়া : তবে কী হলো ?

উমরাও : সমস্ত গল্পটিই আবার বলতে হবে। যেদিন রাতে আমি ফয়েজ আলির সাথে পালিয়ে যাব সেদিন এক পানের ডিবের মধ্যে গয়নাগুলি ভরে আচ্ছা করে তার উপর কাপড় পেঁচিয়ে দিলাম। খানুমের বাড়ির পিছনে মীর সাহেবের একটি বাড়ি ছিল। ইমামবাজার কুঠির পাঁচিলের উপর চড়লে তাঁর বাড়িটি সামনে পড়ে। আমি প্রায়ই একটি খাটিয়া লাগিয়ে এই পাঁচিলের উপর উঠতাম আর মীর সাহেবের বোনের সাথে কথাবার্তা বলতাম।

ওই গয়নার বাক্সটি আমি তাঁর বোনের কাছে ছুঁড়ে দিয়ে হাতজোড় করে বলেছিলাম এটি তাঁর হেফাজতে রাখতে। ফৈজাবাদ থেকে ফিরে আসার পর উনি সেই ন্যাকড়া জড়ানো অবস্থায় পানের ডিবেটি আমায় ফেরত দিয়েছিলেন। বিপ্লবের সময় বহু লোকের ঘরবাড়ি লুঠ হয়ে গিয়েছিল। যদি উনি বলতেন যে ওটি লুঠ হয়ে গেছে তবে আমার আর কি-ই-বা করার ছিল। কিন্তু কী সৎ স্ত্রীলোক, একটি দানাও তার নষ্ট হয়নি। এই ধরনের লোকজনই পৃথিবী ও আকাশের মধ্যে থাম হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। নইলে কবেই শেষের-সে-দিনটি এসে যেত।

রুশোয়া : ভালো, কত টাকার মাল ?

উমরাও : প্রায় দশ-পনের হাজার টাকার মাল ছিল।

রুশোয়া : আর এখন তার কী হলো ?

উমরাও : কী হলো, যে রাস্তায় এসেছিল সেই রাস্তায়ই গেল।

রুশোয়া : কিন্তু লোকের প্রচার যে, বিপ্লবের সময় তোমার কানাকড়িটিও লুঠ হয়নি। সব মাল তোমার কাছেই আছে।

উমরাও : সে টাকা-পয়সা থাকলে তো আপনার মতোই থাকতাম।

রুশোয়া : লোকে বলে তুমি ভেক ধরে আছ। নইলে খরচ চলে কেমন করে? এমন কিছু খারাপ অবস্থায় থাক না, দুজন চাকর, খাওয়া-দাওয়া, সাজ-পোশাক ভালো।

উমরাও : দেনেওয়ালা খোদা, যার যা খরচ তার তা মিলেই যায়। সে মালের এক ছিদেমও নেই।

রুশোয়া : আচ্ছা! তবে তার হলো কী?

উমরাও : কী আর বলব! একজন অনুগ্রহ করে

রুশোয়া : বুঝেছি, এটি গৌহর মির্জা সাহেবের কাজ হবে বা।

উমরাও : আমি নিজের মুখে তা বলতে পারছিনে। আপনার অনুমানটি হয়ত-বা মিথ্যে।

রুশোয়া : তোমার মহত্ব সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ অবশ্যই নেই। দেখো, সে কেমন আরামে আছে। আর তোমার একবার খোঁজও করে না।

উমরাও : মির্জা সাহেব, বেশ্যার সাথে সম্পর্ক থাকলে থাকল, না থাকলে না-ই থাকল। ওর আমার খোঁজ-খবর নেবার কী দরকার! অনেকদিন আগেই তার সাথে দেখা সাক্ষাৎ বন্ধ হয়ে গেছে। ও কেন এখানে আসবে? আমিই হরদম যাচ্ছি। ওর স্ত্রীর সাথে খুব ভাব হয়ে গেছে। তিনি মাত্র চারদিন আগে ছেলের মাইয়ের দুধ ছাড়ানোর সময় নিমন্ত্রণ দিয়ে পাঠিয়েছিলেন।

রুশোয়া : তখন কিছু দিয়েই এসেছেন হয়ত।

উমরাও : জি, না। আমার কী ক্ষমতা যে কাউকে কিছু দেব!

রুশোয়া : তবে কি সে মাল গৌহরের কাজে লাগে?

উমরাও : মির্জা সাহেব, টাকা-পয়সা তো মায়া মাত্র। হাতের ময়লা, কেবল-মাত্র কথাই থাকে। নিজের সৃষ্টিকর্তার জন্যই আত্মোৎসর্গ করব। আমি খেয়ে পরেই আছি আর কোনো-কিছুর অভাবও নেই।

রুশোয়া : এতে আর সন্দেহ কি, সে তো প্রথমেই বলেছি। এখন তো একশ টাকাও ভালো, হাজার টাকাও ভালো, ও আল্লা সেটি তো তোমার ইচ্ছের ফল। খোদা তো তোমাকে হজে যাওয়ার মতো সম্মানও দিয়েছেন।

উমরাও : জি, হ্যাঁ। করুণাময় সকল ইচ্ছেই পূরণ করেছেন। এই আশা যে, তিনি যেন পুনরায় আমাকে কারবালা পাঠিয়ে দেন, আমার আত্মসমর্পণ যেন তাঁর প্রিয় হয়। মির্জা সাহেব, আমি এই ইচ্ছে নিয়েই গিয়েছিলাম যে আর ফিরে আসব না। কিন্তু খোদা জানেন কী যে হলো! লখনৌ মাথায় চেপে বসল। কিন্তু এখন খোদা চাইলে যদি যাওয়াই হয় তো আর ফিরে আসব না।

১৪

আমার সর্বনাশের কথা শুনেছ তো, তারি
আরো কিছু শোনো তবে, লাগছে মজা ভারি।

বুন্দি থেকে বেগম সাহেবা আর ব্রিজিস্‌কদর নেপালের দিকে রওনা হয়ে গেলেন। সৈয়দ কুতুবুদ্দিন যুদ্ধে গেলেন মারা। আমি অতি কষ্টে ফৈজাবাদ পৌঁছলাম। প্রথমে এসে উঠলাম এক সরাইখানায়। তারপর ত্রিপলিয়া গেটের পাশে একখানি ঘর ভাড়া নিলাম। বাজিয়ে রেখে গান-বাজনা শুরু করে দিলাম।

ফৈজাবাদে ছ-মাস কেটে গেল। এখনকার জলবায়ু স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী, মন বসে গেল। মাসের আট দশ তারিখের মধ্যেই কোনো-না কোনো মুজরো এসে যায়। এতেই চলে যায়। গোটা শহরে আমার গানের খুব ধুম। যেখানেই মুজরো হোক-না কেন লোক উপচে পড়ে। আমার ঘরের নীচ দিয়ে যাওয়ার সময় লোকে তারিফ করতে করতে যায়, মনে মনে আমি খুব খুশি। কখনো কখনো স্বপ্ন ও কল্পনার মতো ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে, আমার সাথে সাথে একটি খুশির আমেজ আসে। কিন্তু সুলতানী রাজত্বের শেষপর্ব, বিপ্লব, ব্রিজিস্‌কদর এইসব চোখের সামনে ছবির মতো ঘটতে দেখে মন আমার পাথর হয়ে গিয়েছিল। মা-বাবার কথা চিন্তা করতেই মনে এই ভাবনা আসে যে খোদা জানেন, কে-বা বেঁচে আছেন আর কে বা মরে গেছেন! যদি বেঁচে থাকেন তবে আমারই-বা কী। ওঁরা আছেন ওঁদের জগতে, আমি আরেক জগতে। রক্তের সম্বন্ধ আছে ঠিকই। কিন্তু কোনো সম্মানী লোক আমার সাথে মেলামেশাটা মেনে নেবেন না। এখন ওঁদের সাথে মেলামেশার চেষ্টা করাটা ওঁদের দুঃখের কারণ হয়ে দাঁড়াবে বাড়ির কথা মনে পড়তেই এইসব কথাবার্তা এসে যেত আর তাই মনটি অন্যদিকে ঘুরে যেত।

লখনৌ-এর কথা সর্বদাই মনটাকে পীড়া দিত। কিন্তু অরাজকতার কথা যখন মনে আসত তখন মনে আরও দুঃখ হত। ওখানে এখন আর কে আছে? কার জন্য সেখানে যাব? খানুম যদি বেঁচে থাকেন তো কী হয়েছে। ওঁর সাথে আর বনিবনা হবে কী করে। উনি আগেকার ধারাতেই সব চালাবেন। ঐ কয়েদখানায় আবার যাওয়া আমার একদম পছন্দ নয়। যে মাল মীর সাহেবের বোনের কাছে রেখেছিলাম সে কি আর মিলবে? তামাম লখনৌ লুঠ হয়ে গেছে। মীর সাহেবের বাড়িতে হয়ত লুঠ হয়ে গেছে। ঐ মালের কথা চিন্তা করাও এখন

নিরর্থক। ওসব যদি লুঠ না হয়েও থাকে তো এখন তার প্রয়োজন কী। আমার হাতে গলায় যা জিনিস এখনও রয়েছে তা কি কম?

একদিন আমি কামরায় বসে আছি। আধাবয়সী ভদ্রচেহারার জনৈক ব্যক্তি এলেন। আমি তাঁকে পান সেজে খেতে দিলাম। হুঁকোও সাজিয়ে আনালাম। অবস্থার বিষয়ে জিজ্ঞেস করায় জানতে পারলাম ইনি হুকোমের বংশধরদের একজন। মাসোহারা পান। কথায় কথায় আমি বেগম সাহেবার কবরে বাতি দেবার পুরনো চাকরদের প্রসঙ্গ উত্থাপন করলাম।

আমি : পুরনো চাকরদের মধ্যে কে কে এখন আছেন?

নবাব সাহেব : সবাই মরে গেছে। সব নতুন নতুন লোক। সে ব্যবস্থাও আর নেই। একেবারে নতুন ব্যবস্থা।

আমি : পুরনো চাকরদের মধ্যে একজন বুড়ো জমাদার ছিলেন।

নবাব সাহেব : হ্যাঁ, ছিলেন। কিন্তু তুমি জানলে কী করে?

আমি : বিপ্লবের আগে আমি একবার ফৈজাবাদ আসি। তখন ঐ কবরখানায় বাতিজ্বলা দেখতে গেলে উনি আমাকে খুব যত্ন করেছিলেন।

নবাব : সেই জমাদার না, যার একটি মেয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল?

আমি : আমি তার কি জানি। (মনে মনে) হায়, গল্পটি আজ চালু রয়েছে।

নবাব : এমনিতে তো কয়েকজন জমাদার ছিল আর এখনো আছে। কিন্তু বাতি দেয়া ইত্যাদি কাজ বিপ্লবের আগে ঐ লোকটিই করত।

আমি : ওঁর একটি ছেলেও ছিল।

নবাব : ছেলেটিকে তুমি দেখলে কোথায়?

আমি : সেইদিন ওঁর সাথে। ওঁর সাথে তার চেহারার এত মিল কম দেখা যায়। না বললেও আমি চিনতে পেরেছিলাম।

নবাব : জমাদার বিপ্লবের আগেই মারা গেছে। সেই জায়গায় ঐ ছেলেটিই কাজ করে।

এর পর কথার মোড় ফেরানোর জন্য এবিষয়-সেবিষয় জিজ্ঞেস করলাম।

নবাব সাহেব শোকগাথা পড়ার ফরমায়েশ করলেন। আমি দুটো শুনিয়ে দিলাম। উনি খুবই খুশি হলেন। রাত অনেক হওয়ায় উনি বাড়ি চলে গেলেন।

বাবার মরার খবর শুনে আমার খুব দুঃখ হলো। সেদিন সারা রাত কাঁদলাম। পরেরদিন ভাইকে দেখার জন্য মন অধীর হয়ে উঠেছিল। দুদিন পরে এক মুজরোর বায়না এসে গেল। তার প্রস্তুতি করতে থাকলাম। যেখান থেকে মুজরোর বায়না এসেছিল সেখানে গেলাম। জায়গাটির নাম মনে নেই। তবে বাড়িটির পাশেএকটি খুববড় পুরনো তেঁতুল গাছ ছিল। এই গাছটির নীচে তাঁবু খাটানো। চারপাশ চট দিয়ে ঘেরা। অনেক জনসমাগম। এই চটের সামনে ও পিছনে টালির বাড়িগুলিতে ছিলেন অনেক মহিলা। প্রথম মুজরো শুরু হলো রাত

ন-টায়, আর চলে রাত বারোটা পর্যন্ত। এই জায়গাটি দেখে মনে ভয় হচ্ছিল। মনটিতে ভেসে আসছিল, এই আমাদের বাড়ি! এই তেঁতুল গাছটি সেই গাছ যার নীচে আমি খেলা করতাম। এই সভায় যেসব লোক সমবেত হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে কিছু লোককে কোথাও আমি দেখেছি। সন্দেহ নিরসনের জন্য আমি চটের ঘেরার বাইরে এলাম। ঘরগুলির সারিতে কিছু ওলটপালট হয়ে যাওয়ায় এই চিন্তা এল যে হয়ত-বা সে জায়গা এটি নয়। একটি বাড়ির দরজা খুব মনোযোগের সাথে দেখে বিশ্বাস হলো যে এই-ই আমাদের সেই বাড়ি।

মন চাইছিল বাড়িটির মধ্যে ঢুকে পড়ি। মায়ের পায়ের উপর লুটিয়ে পড়ি। উনি আমাকে গলা জড়িয়ে ধরবেন। কিন্তু সাহস হচ্ছিল না। এই জন্য যে, আমি জানি গ্রামে বেশ্যাদের অশুচি মনে করে। দ্বিতীয়ত ভাইয়ের সম্ভ্রমের কথাটি মনে ছিল। নবাব সাহেবের কথায় বুঝতে পেরেছিলাম যে জমাদারের মেয়ের বেরিয়ে যাওয়ার কথা লোকে জেনে গিয়েছিল। আবার মন বলল, হায় কী অত্যাচার! স্রেফ একটি প্রাচীরের বাধা মা এদিকে হয়ত বসে রয়েছেন আর আমি এখানে তার জন্য দুঃখ করছি। নিমেষের জন্য তাঁর চেহারাটি দেখাও সম্ভব নয়, কী অসহায়তা!

এই রকম দোলাচল চিত্তের মধ্যে রয়েছি এমন সময়ে একজন স্ত্রীলোক এসে জিজ্ঞেস করলেন:

'তুমি লখনৌ থেকে এসেছ?'

আমি: হ্যাঁ।

এখন আমার প্রাণটি যেন হাতের তালুতে ধড়ফড় করছে।

স্ত্রীলোক: আচ্ছা, তুমি এদিকে চলে এস। তোমাকে একজন ডাকছে।

আমি 'আচ্ছা' বলে ওঁর সাথে চললাম। এক এক পা চলি আর কিরকম হয়ে যায়। কোথায় পা ফেলছি আর কোথায় পা পড়ছে। স্ত্রীলোকটি আমাকে সেই বাড়ির দরজায় নিয়ে গেল যেটিকে আমি নিজের বাড়ি বলে মনে করেছিলাম। এই বাড়ির বারান্দায় আমাকে বসিয়ে দিল। অন্দরের দরজায় ছিল চটের পরদা। পরদার পেছনে দু-তিনজন স্ত্রীলোক এসে দাঁড়ালেন।

একজন: লখনৌ থেকে তুমি এসেছ?

আমি: জি, হ্যাঁ।

দ্বিতীয়: তোমার কী নাম?

আমি: (মুখে তো এসেই গিয়েছিল, কিন্তু সেটিকে থামিয়ে বললাম) উমরাও-জান!

প্রথমজন: লখনৌ কি তোমার নিজের দেশ?

আমি: (এবার আমার কোনো আওয়াজ বেরল না, চোখের জল পড়তে থাকল) নিজের জায়গাটি তো এই যেখানে দাঁড়িয়ে আছি।

প্রথমজন : তবে কি ফৈজাবাদ ?

আমি : (অশ্রুধারা সব সময়েই ঝরছে। অতি কষ্টে জবাব দিলাম) জি হ্যাঁ।

দ্বিতীয় : তুমি কি বাঈজির ঘরের ?

আমি : বাঈজির ঘরের তো নই, ভাগ্যের লিখন পুরো করছি।

প্রথম : (নিজে কেঁদে) আচ্ছা, তা কাঁদছ কেন ? সত্যি বলোত তুমি কে ?

আমি : (অশ্রু মুছে) কে আমি কি আর বলব ! ভাষায় বলতে পারছিনে।

এত কথা আমি অতি কষ্টে নিজেকে সংযত রেখে বলেছিলাম। এখন আর যন্ত্রণা সহ্য হচ্ছিল না, যেন দম বন্ধ হয়ে আসছে।

এরই মধ্যে দুজন স্ত্রীলোক পরদার বাইরে এসেছেন, একজনের হাতে প্রদীপ। ইনি আমার মুখটি ফিরিয়ে নিয়ে কানের প্রতি মনোযোগ দিয়ে দেখলেন আর দ্বিতীয়জনকে দেখিয়ে বললেন, কেমন, আমি বলছি না যে এ সেই-ই।

দ্বিতীয় : হায়, আমার আমিরন।

এই কথা বলেই আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। মা-বেটি দুজনেই চিৎকার করে। কাঁদতে লাগলাম। হেঁচকি উঠে গেল। শেষে দুজন স্ত্রীলোক এসে দুজনকে সরিয়ে দিলেন। এরপর আমি সমস্ত কাহিনীটি বললাম। মা শুনে আরও কাঁদতে লাগলেন। ওখানে আমরা দুজনে বসে বাকি রাতটুকু কাটালাম। ভোর হতেই আমরা ছাড়াছাড়ি হয়ে গেলাম। ফিরে আসার সময় মা যে দুঃখভরা চোখ নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন তা আমি জীবনভর ভুলতে পারব না। কিন্তু নিরুপায়। ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতেই আমি আমার নিজের কামরায় ফিরে এলাম। পরের মুজরো ছিল সকালে। কিন্তু আমি শরীর-খারাপ এই বাহানায় সব টাকাই ফেরত দিলাম। বরের বাবা অর্ধেক টাকা ফেরত দিলেন। সেদিন আমার যে কী অবস্থায় কাটল তা একমাত্র খোদাই জানেন। কামরায় সারাটা দিন শুয়ে কেবল কাঁদলাম।

দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যের কাছাকাছি একজন জোয়ান শ্যামবর্ণ বিশ-বাইশ বছরের কাছাকাছি বয়স, মাথায় পাগড়ি বাঁধা, সিপাইয়ের মতো উর্দি পরে আমার ঘরে এল। আমি হুঁকো সাজিয়ে দেওয়ালাম। পানের ডাবরে পান না থাকায় চাকরানীকে ডেকে চুপি চুপি বললাম পান আনতে। দৈবক্রমে সেখানে আর কেউ ছিল না। কামরায় মাত্র সে আর আমি।

জোয়ান : কাল তুমিই কি মুজরো খাটতে গিয়েছিলে ? (সে এমনভাবে বলল যে আমি হকচকিয়ে গেলাম)

আমি : হ্যাঁ।

এই পর্যন্ত বলে তার চোখের দিকে তাকিয়ে দেখি যে তার চোখ দিয়ে যেন রক্ত ঝরছে।

জোয়ান : (মাথা নিচু করে) পরিবারের নাম খুবই উজ্জ্বল করেছ।

আমি : (এবার বুঝে নিলাম ব্যক্তিটি কে) এটি তো খোদাই জানেন!

জোয়ান : আমিতো বুঝেছিলাম তুমি মরে গেছ। কিন্তু তুমি এখনো জীবিত!

আমি : লজ্জাহীন জীবন সহজে যায় না, খোদা শিগগির টেনে নিন।

জোয়ান : নিশ্চয়ই তোমার এ জীবনের চেয়ে মরা ছিল শতগুণ ভালো। তোমার তো ঝিনুকের জলে ডুবে মরা উচিত ছিল। কিছু পান করেও শুয়ে পড়তে পারতে।

আমি : নিজে এত জানতাম না। এরকম সৎ পরামর্শ আজ অবধি কেউ দেয়নি।

জোয়ান : তুমি যদি এতই লজ্জাশীলা হতে তবে আর এ শহরে আসতে না। আর এলেই যদি-বা তবে যে মহল্লায় তুমি ছিলে সে মহল্লায় মুজরো খাটতে আসতে না।

আমি : হ্যাঁ, এটি ত্রুটি নিশ্চয়ই। কিন্তু আমি জানব কী করে?

জোয়ান : বেশ এখন তো জানলে!

আমি : এখন কী হবে।

জোয়ান : (ভয়ানক রেগে গিয়ে) এখন কী হচ্ছে—এখন কী হচ্ছে—এখন (কোমর থেকে ছোরা বের করে আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে দুটো হাত ধরে গলায় ছোরাখানি রেখে) এই হচ্ছে।

এর মধ্যে ঝি বাজার থেকে পান নিয়ে এসেছে। সে আমার এই অবস্থা দেখে চিৎকার করে উঠল, আরে দৌড়ে এস, বিবিকে মেরে ফেলছে।

জোয়ান : (গলা থেকে ছোরা সরিয়ে) মেয়েলোককে আর কি মারব? আর স্ত্রীলোকই-বা কে? বড় ..?

এই বলেই সে গভীর মনোবেদনায় কাঁদতে লাগল। আমি শুরু থেকেই কাঁদছিলাম। ও যখন আমার গলায় ছোরা রাখল তখন প্রচণ্ড একটি মানসিক ধাক্কায় আমার দম বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ও যখন ছেড়ে দিয়ে কাঁদতে থাকল তখন আমিও কাঁদতে লাগলাম।

ঝিটি দু-একবার চিৎকার করেছিল? এখন এই অবস্থা দেখে চুপ করে রইল। আমি এদিকে ইশারায় ওকে চেঁচাতে নিষেধ করলাম। ও একধারে দাঁড়িয়ে রইল।

দুজনে খুব কান্নাকাটি করার পর জোয়ান হাত জোড় করে—

বেশ, এই শহর ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাও।

আমি : কাল চলে যাব। কিন্তু একটিবার মাত্র যদি মাকে দেখতে পেতাম!

জোয়ান : ব্যস্। ও আশা মন থেকে দূর কর। কাল তোমাকে ঘরে ডেকে নিয়ে গিয়েছিলেন। আমি সে সময় বাড়ি ছিলাম না। থাকলে তখনই একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যেত। গোটা মহল্লায় এই আলোচনা চলছে।

আমি : তুমি তো দেখলে, আমি প্রাণের ভয় করিনে। কিন্তু হায়, তোমার প্রাণের জন্য চিন্তা হয়। তুমি ছেলেপিলে নিয়ে সুখে থাক। যা হোক, বেঁচে থাকি তো কোনো-না কোনো সময়ে তোমাদের কুশল সংবাদ নেব।

জোয়ান : খোদার দোহাই। কারো কাছে আমার কথা বলো না।

আমি : আচ্ছা।

জোয়ানটি তো উঠে চলে গেল। আমি রইলাম দুঃখে মগ্ন। ঝিটি এখন প্রাণ অস্থির করে তুলল, এ কে ?

আমি : রাঁড়ির বাড়িতে আসে হাজারজনা। কে তা তোমার কি ?

কোনো রকমে ঝিকে এড়িয়ে গেলাম। সারারাত শুয়ে রইলাম। সকালে উঠে লখনৌ যাওয়ার প্রস্তুতি করি। সন্ধ্যে হতেই ছ্যাকড়া গাড়ি ভাড়া করে লখনৌ যাত্রা।

১৫

লখনৌ-এ এসে খানুমের বাড়িতে উঠলাম। সেই চক। সেই কামরা। সেই আমি আগে যারা ফিরেছিল তাদের কেউ কেউ কলকাতায় চলে গিয়েছিল আর কিছু লোক অন্য শহরে। শহরে নতুন ব্যবস্থা, নতুন আইন জারি হয়েছে। আসফউ-দ্দৌলার ইমামবাড়া একটি দুর্গ হয়ে গেছে। চারিদিকে পাঁচিল তৈরি করা হয়েছে, এখানে সেখানে চওড়া রাস্তা তৈরি হচ্ছে। গলিতেও ইটের টুকরো দিয়ে রাস্তা তৈরি করা চলছে। পয়ঃপ্রণালিগুলি পরিষ্কার করা হচ্ছে। সংক্ষেপে, লখনৌ অন্য কিছু হয়ে গেছে।

আমি দু-চার মাস খানুমের বাড়িতে থাকি। শেষে নানা বাহানায় একটি পৃথক ঘর নিয়ে বসবাস শুরু করলাম। জমানা বদলে যাওয়ার সাথে সাথে খানুমেরও মনের পরিবর্তন হয়ে যায়। মনে যেন কেমন একটা উদাস ভাব। যেসব বাঈজি তাঁর বাড়ি ছেড়ে অন্য জায়গায় চলে গিয়েছিল তাদের তো কথাই নেই, যারা বড়িতে থেকে গিয়েছিল তাদেরও টাকা-পয়সায় তাঁর আর তেমন আগ্রহ ছিল না। আমার পৃথক হয়ে যাওয়ায়ও তাঁর মনে কিছু বিরূপ ভাব হয়নি। দু-তিনদিন অন্তর আমি তাঁর ওখানে যেতাম আর নমস্কার করে চলে আসতাম। এই সময়ে নবাব মহম্মদ আলি খান সাহেবের সাথে আমার ঘনিষ্ঠতা জন্মে। প্রথম প্রথম কিছুদিন আসতেন। তারপর দিতেন মালোহারা, তারপর চাইলেন আমাকে বিয়ে করতে। ভালো, লখনৌ-এ থাকব অথচ পুরনো মেলামেশার সাথীদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ বন্ধ করে দেব তা আমার দ্বারা হয় নাকি। নবাব সাহেবের মনের ভাব এমনটি দেখে আমি তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে চাইলাম। নবাব সাহেব আদালতে তাঁর সাথে আমার নিকে হয়েছে এই দাবিতে মামলা দায়ের করে দিলেন। একটি অদ্ভুত ধরনের বিপদে জড়িয়ে গেলাম। মকদ্দমা চালাতে হাজার হাজার টাকা খরচ হয়ে গেল, আদালত শুরুতে নবাব সাহেবের পক্ষে রায় দিলেন। এবার আমাকে লুকিয়ে থাকতে হলো। দীর্ঘদিন গোপনে চলতে-ফিরতে হলো। উকিল মারফত আপিল করলাম। আপিলে নবাব সাহেব গেলেন হেরে। নবাব সাহেব ঊর্ধ্বতন আদালতে আপিল করলেন। এখানেও হেরে গেলেন। এখন অবৈধ ভয় দেখাতে শুরু করলেন, মেরে ফেলব নাক কেটে নেব। এই সময়ে আমার জীবনের নিরাপত্তার জন্য দশ বার জন লাঠি-ধারী পাহারাদার রাখতে হলো। যেখানেই যাই-না কেন লোকজন পালকির সাথে

চলে। নাকের দম বন্ধ হয়ে গেল। শেষে আমি নবাবের কাছ থেকে মুচলেকা চেয়ে একটি ফৌজদারী মামলা আনি। সাক্ষী-সাবুদে প্রমাণ করে দিলাম নবাব সাহেব নিঃসন্দেহে ক্ষতি করতে উদ্যত। হাকিম নবাব সাহেবের কাছ থেকে মুচলেকা নিয়ে নিলেন, তবে প্রাণে বাঁচি। ছয় বছর ধরে মামলায় ফেঁসে ছিলাম। খোদা খোদা করে মুক্তি পাই।

যে সময়ে নবাব সাহেবের সাথে মামলা লড়ছিলাম সে সময়ে পেশায় মোক্তার, ধূর্ত, আপদের সিঁড়ি, অবৈধ কাজে পোক্ত, জোচ্চুরিতে ওস্তাদ, মিথ্যে মামলা সাজাতে পটু, আদালতকে ধোঁকা দিতে যার জুড়ি নেই সেই আকবর আলি খান ছিল আমার মামলার তদ্‌বিরকারক। ওর জন্যেই আদালতের কাজে আমার খুব সহায়তা মেলে। সত্যি কথাটি এই যে, ঐ লোকটি না থাকলে নবাবের সাথে মামলা জেতা সম্ভব হত না। যদিও নবাব সাহেবের সাথে আমার নিকে হয়নি এ ঘটনা সত্যি হলেও আদালতে প্রায়ই সত্যি ঘটনা প্রমাণের জন্য মিথ্যে সাক্ষীর দরকার পড়ে। বিরুদ্ধপক্ষের দাবি ছিল বিলকুল ঝুট। কিন্তু মামলাটি এমনভাবে তৈরি করা হয় যে, কোনো রকমে অনিষ্ট না ঘটে। নিকের সাক্ষী হিসাবে দুজন মৌলবীকে উপস্থিত করা হয়। তাদের কপালে ভস্ম মাখা, মাথায় বড় বড় টুপি, গায়ে ঢিলে আলখাল্লা হাতে জপের মালা, পায়ে চটি। তারা কথায় কথায় বলে, আল্লা বলেছেন, রসুল বলেছেন। ওদের চেহারা দেখে আদালতের হাকিম তো দূরের কথা যে কোনো সৎ স্বভাবের লোকই ওদের বদমায়েশি বা মিথ্যেবাদিতায় সন্দেহ পর্যন্ত করবে না। ওই ভদ্রলোকের একজন সেজেছিলেন নিকের পাত্রীপক্ষের উকিল, আরেকজনা পাত্রপক্ষের। তবু সত্যি সত্যিই, আর মিথ্যে মিথ্যেই।

জেরায় সব বিগড়ে গেল। নবাবের অন্যান্য সাক্ষীরা তো আরও খারাপ করল। আর ওদের সাক্ষ্যতেই নবাবের আপিলে হার হলো। ফৌজদারী মামলায় আমার পক্ষের সাক্ষীদের শিখিয়েছিল আকবর আলি। তারা একবিন্দুও টলেনি।

আমার ওখানে আকবর আলির আসা-যাওয়াটা ছিল অনেক কাল ধরে আর আমার সাথে ব্যবহার করেছিল প্রকৃত বন্ধুর মতোই। এক কপর্দকও আমার কাছ থেকে নেননি, অধিকন্তু নিজে বহু টাকা খরচ করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে ওঁর সাথে আমার একধরনের ভালবাসা ছিল। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হলো এই যে, খারাপ লোক একদম খারাপ নয় - কারো-না কারো সে ভালোও করে। আগেকার দিনের চোরের কথা আপনি শুনেছেন হয়ত যে, যারা বন্ধুত্ব করে তারা তার পুরো মান্য করে। কোনো-না কোনো রকমের ভালো না করে কেউ বাঁচতে পারে না। যে লোক সবার কাছে খারাপ সে কারো-না কারো কাছে ভালো হয়ে থাকে। নবাবের সাথে যতদিন পর্যন্ত মামলা চলছিল আমি কোনো অচেনা পুরুষকে আমার কাছে আসতে দিইনি। হয়ত সে কোনো গুপ্তচর হবে কোনো খবর নিতে বা কোনো ক্ষতি করতে। আকবর আলি খান কাছারি থেকে এখানেই আসতেন,

সন্ধ্যায় নমাজ পড়তেন এখানেই। বাড়ি থেকে আহার্য আসত, অনেকদিন আমি জিদ ধরেছি বাড়ি থেকে খাবার আনার দরকার কী। কিন্তু উনি শোনেননি। শেষে নিরুপায় হয়ে চুপ করে গেলাম। আমার ঘরের খাবার খেতে তাঁর আপত্তিও ছিল না। আমিও ওঁরই সাথে আমার খাবার খেতাম। এ সময়ে আমিও নমাজ পড়তে শুরু করি। আকবর আলি খানের রমজানের উপর আসক্তি ছিল। রমজান আর মহরমের সময় উনি এত ভালো কাজ করতেন যে ওঁর সারা বছরের পাপ সব ধুয়ে যেত। এটি সত্যি হোক মিথ্যে হোক ওঁর কিন্তু এই বিশ্বাসই ছিল।

রুশোয়া : এটি বিশ্বাসের কথা। এই জন্য আমাকে শুধু এইটুকুই বলতে দিন যে এরকম বিশ্বাস করা ঠিক না।

উমরাও : আমার কাছেও তাই।

রুশোয়া : জ্ঞানীরা পাপকে দুরকমে ভাগ করেছেন। একটি, যার প্রভাব নিজের অভিজ্ঞতা, আর অন্যটি যা অপরের কাছেও পৌঁছয়। আমার অপটু রায় হচ্ছে এই যে প্রথম পাপটি তুচ্ছ আর দ্বিতীয় রকমের পাপটি হচ্ছে গুরুতর। (যদিও অন্যের রায় হচ্ছে এর বিপরীত)। যে পাপের প্রভাব অন্যের উপর বর্তায় সে পাপের ক্ষমা কেবলমাত্র তারাই করতে পারে যাদের উপর এর ফলাফল পৌঁছয়। আপনি হয়ত শ্রদ্ধেয় হাফিজের এই লাইনটি শুনেছেন—

মদ্যপ যদি-বা কেউ
হয়ত পোড়ায় কেউ কাবা বা কোরাণ
মূর্তির পূজাও যদি করে
এত সব সহ্য হয়, জনপীড়কের নেই ত্রাণ ॥

উমরাওজান, মনে রেখো, জনগণের উপর পীড়ন করা গর্হিত কাজ। কোথাও এর মাফ নেই। এটিও যদি মাফ করতে হয় তবে খোদা ক্ষমা করুন, খোদার উপর বিশ্বাস করাই নিরর্থক।

উমরাও : আমার তো রন্ধ্রে রন্ধ্রে পাপ। কিন্তু আমিও জনপীড়নজাত পাপের ভয়ে কাঁপি।

রুশোয়া : আপনি কিন্তু লোককে বহু মনঃকষ্ট দিয়েছেন।

উমরাও : এটি তো আমার পেশা। এই মনঃকষ্টই আমাকে লাখ লাখ টাকা দিয়েছে, উড়িয়েছিও হাজার হাজার।

রুশোয়া : আর কী এর সাজা ?

উমরাও : এর কোনো সাজা হোক তা চাইনে। আমি যে ধরনের মর্মপীড়া দিয়েছি তাতে এক ধরনের স্বাদ রয়েছে যেটি মর্মপীড়ার বদলা হয়ে যায়।

রুশোয়া : কী চমৎকার !

উমরাও : ধরে নিন, জনৈক সাহেব আমাকে মেলায় দেখে পাগল হয়ে উঠলেন,

কিন্তু পকেটে পয়সা নেই, আর আমিও বিনাপয়সায় তার সাথে মিলব না। তাতে তার মনঃকষ্ট হলো কিন্তু এতে আমার অপরাধ কোথায় ? দ্বিতীয় সাহেব আমার সাথে মিলতে চান, তিনি পয়সাও দেবেন। কিন্তু আমি আরেকজনের কাছে বাঁধা বা তাঁকে পছন্দ করিনে, মনটি নিজের। এতে ওঁর মন খারাপ। আমার তাতে কী আসে যায়। আরেকজন সাহেব আমার কাছে এলেন এমন-ভাবে যে আমি যেন তাঁকে চাই। কিন্তু আমি তাঁকে চাইনে. একি একচেটিয়া নাকি ? এতে তিনি আঘাত পেলেন, এর আমি কানাকড়িও মূল্য দিইনে।

রুশোয়া : এসব গুলিমারার যোগ্য। খোদার দোহাই, আমাকে এদের একজন বলে গণ্য করবেন না।

উমরাও : খোদা না করুন! আপনি তো ভালো খেয়ে-পরেই আছেন। আপনি কাউকে চান না আর আপনাকেও কেউ চায় না। কিন্তু এতেই আপনি সবাইকে চান আর সবাই আপনাকেও।

রুশোয়া : এ কী কথা বললেন! আছে আবার নেইও, এরকম কী হয়, বলুন!

উমরাও : আমি তো আর তর্কশাস্ত্র পড়িনি, কিন্তু একটি কথায় দুটি অর্থ হতে পারে। বুদ্ধি-বিবেচনার সাথে চাওয়াটা একরকম আর অস্থানে চাওয়া আরেক-রকম।

রুশোয়া : এর উদাহরণ।

উমরাও : প্রথমটির হলো আপনি আমাকে যেমন চান আর আমি আপনাকে যেমন চাই।

রুশোয়া : থাক, আমার চাওয়ার অবস্থা তো আমার মনই জানে। আর আপনার চাওয়ার অবস্থা তো আপনার স্বীকারোক্তিতেই মালুম। দ্বিতীয়টির উদাহরণ দিন।

উমরাও : থাক, না চাইলে আমার অমঙ্গল চাইবেন। দ্বিতীয়টির উদাহরণ শুনুন, যেমন ভগবান সহায়।

রুশোয়া : না, এ উদাহরণ আপনি ভুল দিলেন। অন্য কোনো উদাহরণ দিন।

উমরাও : বেশ, মজনু যেমন লয়লাকে চেয়েছে।

রুশোয়া : আপনিও পুরনো কাহিনী খুঁজে নিয়ে এলেন ?

উমরাও : আচ্ছা. যেমন....নজির।

রুশোয়া : (কথায় বাধা দিয়ে) এ উদাহরণটি মাফ করুন, এই উপলক্ষে আমার একটি কবিতা মনে পড়ছে, শুনুন—

উমরাও : হ্যাঁ, সেই কলকাতাওয়ালা।

রুশোয়া : অত দূরে যাচ্ছেন কেন, লখনৌ-এ কি একরকম কেউ নেই ?

উমরাও : দুনিয়ায় এর অভাব নেই।

রুশোয়া : আমি শুনেছিলাম আপনি আকবর আলির অন্দরমহলে ছিলেন।

উমরাও : আমার মুখে শুনুন। যে সময়ে নবাব আদালতের প্রথম রায়ে জিতে গিয়েছিলেন আর আমাকে আত্মগোপন করতে হয়, সে সময় আকবর আলি আমাকে তার নিজের বাড়ি নিয়ে যায়। কয়েক বছর সেখানে থাকতে হয়। সে সময় তিনজন এই মিথ্যে ধারণা করে যে, আমি আকবর আলির ঘরওয়ালী হয়ে গেছি। একজন আকবর আলি নিজে, দ্বিতীয় হচ্ছে তাঁর স্ত্রী আর তৃতীয় জনের নাম বলব না।

রুশোয়া : আমি বলব ?

উমরাও : গৌহর মির্জা ?

রুশোয়া : জি, না।

উমরাও : তবে আর কে ? বলুন।

রুশোয়া : আপনিই বলুন।

উমরাও : এরকম ধোঁকা অন্যকে দিন।

রুশোয়া : ধোঁকা কিরকম, আমি এক টুকরো কাগজে লিখে রাখছি। আর আপনি বলুন।

উমরাও : তাই ভালো।

রুশোয়া : এক টুকরো কাগজে লিখে রেখে দিলাম। এবার বলুন।

উমরাও : আর তৃতীয় ব্যক্তিটি আমি নিজে।

রুশোয়া : কাগজটিতে লিখেছি 'আপনি নিজে'।

উমরাও : বাঃ মির্জা সাহেব, ঠিক ধরেছেন!

রুশোয়া : সে আপনার অনুগ্রহ। হ্যাঁ তারপর কী হলো ?

উমরাও : কী হলো শুনুন—

প্রথমে তো উনি আমাকে ছোট একখানি ঘরে এনে রাখলেন। ঘরখানি ওঁর অন্দর-মহলের সঙ্গে লাগোয়া। মাঝখানে একটি দরজা দিয়ে সংযোগ করা আছে। মাটির ঘর আর চালা, খড়ের একটি বারান্দা চালা দেওয়া. সামনে আর-একখানি চালা দেওয়া ঘর। ঐ ঘরে দুটো উনুন। এটি কি ?—এটি রান্নাঘর। অন্যান্য ঘরগুলিও এইরকম। এমনটি বুঝে নিন। এই রকম ঘরে আমিও থাকব আবার আকবর আলির ঘনিষ্ঠ বন্ধুরাও আসবেন। এদের একজন গাঁয়ের ধনী ব্যক্তি শেখ আফজল হোসেন শুরু থেকেই বউদি বলতে লাগলেন। ওর অসময়োচিত ব্যবহারে জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। পানের ফরমায়েশে খুব মুশকিল হলো। কথায় কথায় বলে উঠত, বউদি পান খাওয়াবে না ? একদিন দুদিন কিন্তু আর কতদিন চলে। একদিন তো আমি পানের ডাবর ওঁর সামনে ধরে দিলাম আর ঐদিন থেকে আমি পান খাওয়া ছেড়ে দিলাম। উনি সেটি এমনভাবে নিলেন যেন কোনো একটি জিনিস চিরকালের জন্য দখল করলেন। এমন অভদ্রভাবে পান খেতেন যে, যে দেখবে তার নির্ঘাত ঘৃণা হবেই। চুনের পাত্রে আঙুল

ঢুকিয়ে চাটতে থাকবেন। ওঁর পান খাওয়ার এই রীতি দেখে পান খাওয়া ছেড়ে দিয়ে এলাচ ব্যবহার করতে লাগলাম। এতেও উনি ভাগ বসাতে থাকলেন। আরও একজন সাহেব, ওয়াজেদ আলি প্রায়ই বিশেষ করে খাওয়ার সময় এসে উপস্থিত হতেন। ইনি ছিলেন আকবর আলির শ্যালক। ইনি এমন ঠাট্টা-তামাশা করতেন যেটি শ্লীলতার বাইরে চলে যেত।

এই দুই সাহেব ছাড়া আকবর আলি খাঁর আরও অনেক ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন যাঁদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন মামলাবাজ। দিন রাত আইনের কচকচি চলত। কিন্তু যখন আকবর আলি সাহেব বাইরে চলে যেতেন তখন সব একদম ঠাণ্ডা থাকত।

এই বাড়িতে কিছুদিন থাকার পর আমার মন খুব খারাপ হয়ে গেল। অন্য কোথাও থাকার ব্যবস্থা করার কথা চিন্তা করতে লাগলাম। এ সময় এমন ঘটল যে, আকবর আলি সাহেব ফৈজাবাদে মামলা করতে গেছেন আর আফজল আলি নিজের গাঁয়ে। দৈবক্রমে কেউ-ই বাড়িতে নেই। আমি দরজায় খিল দিয়ে ঘরে একা বসে আছি। এমনি সময়ে অন্দরমহলের দিকের দরজার খিল খুলে গেল আর আকবর আলির স্ত্রী ভিতরে চলে এলেন। ইচ্ছেয় হোক আর অনিচ্ছেয় হোক, আমি নমস্কার জানালাম। উঠানে কাঠের চেয়ার পাতা ছিল তারই পাশে ঘেঁষা আমার পালঙ্ক। প্রথমে বিবিসাহেবা অনেকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন। পরে আমি বললাম, আল্লার দোহাই, বসুন। শেষে উনি বসলেন।

আমি : গরিবের উপর কী দয়া। আজ এদিকে কোথায় এসেছেন?

বিবি : আমার আসাটা তোমার পছন্দ না হলে চলে যাব।

আমি : জি না। ঘর আপনার। আর এরকম হুকুম হলে তা আমার উপর হওয়াটাই তো সঙ্গত।

বিবি : নাও, কথা বাড়িও না। ঘর আমার হয় তো ঘর তোমারও। আর সত্যি বলতে কি, ঘর তোমারও না আমারও না। ঘর তো বাড়ির মালিকের।

আমি : জি, না। খোদা আপনার বাড়ির মালিককে বাঁচিয়ে রাখুন। বাড়ি তাঁর আর আপনারও।

বিবি : তুমি একলাটি বসে থাক আর আমিও মানুষ। তুমি এদিকে আস না কেন? হ্যাঁ হয়ত মালিকের হুকুম নেই।

আমি : মালিকের এই রকম হুকুমের অধীন তো আমি নই। হ্যাঁ, আপনার অনুমতির দরকার ছিল। সেটা যখন মিলে গেছে তখন এবার থেকে যাব।

বিবি : বেশ, চল।

আমি : চলুন।

ঘরে গিয়ে দেখি খোদা এঁকে সবই দিয়েছেন। তামার কলসি, ডেকচি, জলের

পাত্র রান্না ও পরিবেশনের পাত্র, কুঁজো নেওয়ারের খাট, মশারি, কাঠের তক্তা-পোশ, ফরাস, কম্বল। কিন্তু সবই অগোছাল, উঠোনে এখানে-সেখানে আবর্জনা। রান্নাঘরে আমিরন পিসি রান্না করছেন, মাছি ভনভন করছে। কাঠের চেয়ারে পানের পিক ফেলা। বিবির খাটের নীচে একরাশ ধুলো। চাকরানী পানদানটি সামনে এনে রেখে দিল। সেটি খয়ের আর চুনের গোলায় চিত্রবিচিত্র হয়ে গেছে। দেখে আমার গা-ঘিনঘিন করতে লাগল।

বিবি আমাকে পান সেজে দিলেন। আমি দুই আঙুলের মধ্যে রেখে কথা বলতে থাকলাম। এরই মাঝেখানে ঐ মহল্লার একটি বুড়ি এসে পড়ল। সে আরাম করে বসে বিবিকে আমার দিকে ইশারা করে জিজ্ঞেস করল, এ কে?

বিবি: এখন তোমাকে কী বলব!

আমি চুপ করে রইলাম। আর বুড়ি আকবর আলি খাঁর বিবিকে) ওঃ, আমি যেন জানিনে!

আমি: বড় বিবি, জানই যদি তবে আর জিজ্ঞেস করা কেন?

বুড়: অঃ বউ, তোমার সাথে আমি কথা বলছিনে। আমি তো আমার বউরানীকে জিজ্ঞেস করছি। আমি তোমার সাথে কথা বলার যোগ্য নই। তুমি বড় লোক।

বুড়ির মুখের ভাব দেখে আমি চুপ করে রইলাম।

বিবি: ওহে বুড়ি! এতটুকু কথা গাছের কাঁটা হয়ে গেল।

বুড়ি: (বিবিকে) তুমি এমনভাবে কথাটি চেপে গেলে যেন আমি তোমার শত্তুর। হায়, আমি ওঁরই ভালোর জন্য বলছি আর উল্টে উনিই বিগড়ে গেলেন।

বিবি: নাও, ব্যস। নিজের ভালো রেখে দাও। তুমি কোন কার ঘরের মালিক?

বুড়ি: আমার স্বত্ব হচ্ছে কী করে? এখন নতুন নতুন যারা আসবে স্বত্ব তো তাদেরই হবে।

বুড়ির এই কথায় আমার বেজায় হাসি পেয়ে গেল। আমি মুখ ফিরিয়ে হাসতে লাগলাম।

বিবি: কেন নয়? তুমি যে আমার সতীন। (আমার দিকে মুখ ঘুরিয়ে) শুনে নিন, খান সাহেবের প্রথমা বিবি হচ্ছে এই। বিবি, তুমি আসলে ওঁরই সতীন। আমি তো ওঁর পরে এসেছি।

বুড়ি: হুঁ, সতীন তোমারই হোক। আমার এসব কথা ভালো লাগে না। কথায় কথায় গালাগালি দাও। বেশ্যা-বাঈজিদের সঙ্গে মেলামেশা করে কী আর শিখব। দেখ, এতদিন এসেছি, বড় বেগম সাহেবা (আকবর আলির মা) আমাকে আধখানা কথা পর্যন্ত বলেনি। বউ সাহেবা এমনই গুণবতী যে, মহল্লার বুড়িদেরও গালাগালি দেয়।

বিবি : (রেগে গিয়ে) লড্ডনের মা, আমি বলে দিচ্ছি, আজ থেকে তুমি আমার কাছে আর আসবে না। ঐ বড় বেগমের কাছে গিয়ে বসবে।

আমার খুব রাগ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু দেখলাম যে, ও অভদ্র মেয়েলোক। তার মুখে কিছু আটকায় না। নিজেকে সংযত করে বসে রইলাম।

বুড়ি : আমার শত্তুর আসবে এখানে।

বিবি : মতির কপাল পুড়েছে। এই আপদ কুৎসিত মেয়েলোকটি কী বক্‌বক্‌ করছে।

বুড়ি : আমি কি তোমার অধীন নাকি? কারো দেনাপাওনায় থাকিনে; আলাপ একটু করতে আসি। তুমি আমার আর আমি তোমার সাথে কথা বলি। আর আসব না।

বিবি : কদাচ আর আসবে না।

বুড়ি : এই জেদের জন্য নিশ্চয়ই আসব। দেখি তুমি আমার কী করতে পার।

বিবি : আসলে মাথায় এমন জুতো মারব যে একগোছা চুলও থাকবে না।

বুড়ি : কি ক্ষমতা, কি সাধ্য! বেচারি গালি দেবে, জুতো মারবে।

বিবি : নাও, ওঠো, এখান থেকে যাও, নইলে হাতে জুতো নিচ্ছি।

বুড়ি : (ঠাট্টা করে আজ আমি জুতো খেয়েই যাব। মার, বড় বাপের বেটি।

বাবার কথা বলায় বিবির রাগ হয়ে গেল। রাগে মুখ লাল হয়ে উঠল। থরথর করে কাঁপতে লাগলেন।

বিবি : বলছি, দুর হয়ে যা এখান থেকে!

বুড়ি : এখন তো আমি জুতো খেয়েই যাব।

বিবি : (আমার দিকে ফিরে) দেখ তো, এ আমার জিদ ধরিয়ে দিচ্ছে। হতভাগী মতিকে ছাড়ব না।

আমি : বেগম, যেতে দিন, হতভাগী অভদ্র।

বুড়ি : (আমাকে) তুই কিছু বলবিনে, পয়সাওয়ালী। তোকে তো কাঁচাই খেয়ে ফেলব।

বিবি : (জুতো পা থেকে খুলে) এক, দুই, তিন এখন রাজি তো?

আমি : বেগম, যেতে দিন। (হাত থেকে জুতো ছিনিয়ে নিলাম)

বিবি : না, তুমি বলো না। মতিকে হদ্দমার মেরে ছাড়ব।

বুড়ি : আরো মার।

বেগম অপর পায়ের জুতো খুলে চার-পাঁচ ঘা আরো লাগিয়ে দিলেন। এবার বুড়ি মাটিতে পা ছড়িয়ে দিয়ে দু হাত দিয়ে মাটি চাপড়াতে শুরু করে দিল, হায়! হায়! আমাকে জুতো মেরেছে। এবার তো মন ঠাণ্ডা হয়েছে! সতীনের জ্বালাটি পড়ল আমার উপর! হায় মেরেছে! হায় মেরেছে! চিৎকার করতে করতে গালি দেয়া শুরু করল। রান্নাঘর থেকে রাঁধুনি আমিরন পিসি আর

নীচের দালান থেকে বড় বেগম দৌড়ে এলেন। একটি সাংঘাতিক ব্যাপার ঘটে গেছে।

বড় বেগমকে আসতে দেখে বুড়ি আরও জোরে দুহাত চাপড়াতে শুরু করল। এই বুড়ো বয়সে আমাকে জুতো খাওয়ালেন!

বেগম সাহেবা : নাও, আমি কী করে জানব যে তোমার উপর জুতো পড়ছে! জানলে তোমাকে রক্ষে করতাম। তারপর, ব্যাপার কী?

বুড়ি : (আমার দিকে ইশারা করে) এই পয়সাওয়ালা মার খাইয়েছে! ও, হো, ঐ তো মার খাওয়ালে!

আমি একেবারে ঠাণ্ডা মেরে গেলাম। এ সময় বেগম সাহেবা আর আমার চোখাচোখি হলো – কিছুই বলতে পারলাম না।

বিবি : ফের তুই এঁর নামে নালিশ করছিস?

বুড়ি : আমি তো নালিশ করবই তুমি কী করবে?

বেগম সাহেবা : শেষ অবধি, কথাটি কী?

বুড়ি : আমি হতভাগী এটুকুই জিজ্ঞেস করেছি, এই মেয়েলোকটি কে? ভালো, এতে কি অপরাধ করেছি?

বিবি : তুমি তো বলছিলে যে, তুমি জান, তবে আবার জিজ্ঞেস করার উদ্দেশ্য কী?

বুড়ি : উদ্দেশ্য কী? বেশ, উদ্দেশ্য কী তা বলব, এর বদলা আমি নেবই। তুমি আমাকে তো মেরেছ।

বেগম : বেরও উড়নচণ্ডী, তুই আর বদলা কী নিবি? কারো ভুলানো কথায় ভুলিস্‌নে।

বুড়ি : আমি তোমাকে কিছু বলছিনে। তুমি যা ইচ্ছে বলতে পার। তোমার অধিকার আছে।

বেগম : ওরে হতচ্ছাড়ি, বেরও এখান থেকে।

বুড়ি : দেখ, এও বের করে দেবার জন্য এসেছে, বেশ যাচ্ছি। (এই কথা বলে বুড়ি উঠে দাঁড়াল। ঘাঘরা ঝেড়ে বিড়্‌ বিড়্‌ করে) বড় বেরকরনেওয়ালী, যাচ্ছি, যাচ্ছি। দেখি তো কী করে আসতে না দেয়!

বেগম সাহেবা : (বউকে) তুমি এই ডাইনীর সাথে তর্কাতর্কি কর কেন?

বিবি : মা, আপনার মাথার দিব্যি, আমি তো কিছুই বলিনি। ও যেন সেই গায়ে বিছুটি গাছ ছুঁইয়ে এসেছিল। একে কিরকম গালিই না দিল।

বেগম সাহেবা আমার দিকে ভুরু কুঁচকে চেয়ে চুপ করে গেলেন। আমার বুড়ির ওসব কথা শুনে তত রাগ হয়নি, কেননা, আমি ওকে পাগলি বলেই ধরে নিয়েছিলাম। কিন্তু হ্যাঁ, বেগম সাহেবার এই উদ্ধত আচরণ আমাকে খুব আঘাত

দিল। উনি তখনও ওখানে দাঁড়িয়েছিলেন। আমি অন্দরমহলের পাশে আমার ঘরে এসে বসলাম।

বেগম সাহেবা : (আমি চলে আসার পর বউকে) তুমি তো এই হতচ্ছাড়িকে সত্যিই মারলে, তাও আবার এই বেশ্যার জন্য। ওর পক্ষ নেবার তোমার কী দরকার ছিল ?

আমিরন : আচ্ছা, এটি যেতে দিন। ও মুখ খারাপ করেছিল, তার সাজা পেয়েছে। কিন্তু জিজ্ঞেস করি, বেশ্যাদের সাথে মেলামেশা করা কেন ? আর বিশেষত যে মনিবের রক্ষিতা ওকে মনিব নিজে ঘরে নিয়ে এলে তুমিই কত গোলমাল করতে, আর তুমি নিজেই কিনা তাকে ঘরে ডেকে আনলে !

বেগম : (আমিরনকে) ওর সাধ্য কি ঘরে আসে, আমি কি এখানে বসে নেই ? বাইরে যার যা মন চায় করুক, ঘরে কার কী কাজ। এই দেখ, ওঁর সাথে (আকবর আলির বাবা) হুসেন বাঁদীর বহু বছর দেখা সাক্ষাৎ ছিল, সে অনেক অনুরোধ করলেও আমি কখনো তাকে সমর্থন করিনি। বোন আমিরন ! আমি চিন্তা করলাম, সে আজ অতিথি হয়ে তড়িঘড়ি চলে আসবে আর কাল কর্তা তাকে ঘরে ঠাঁই দেবেন আর সে আমার বুকের উপর ডাল বাটবে। আমার ছেলে আমার বশে। আজকালকার মেয়েরা ভবিষ্যৎ চিন্তা করে না।

আমিরন : সত্যি কথা, বেগম সাহেবা। পরের ঘাড় ভেঙে যে-মেয়েলোক খায় তার ঘর-গেরস্তিতে কাজ কী। বৃদ্ধ লোকরা বলতেন মেয়েমহলে একটি পুরুষকে যদিও-বা আনা যায় দুশ্চরিত্রাদের কখনও নয়।

বেগম : বোন, কথা হচ্ছে এই যে, পুরুষমানুষ যদি জেনানা মহলে ঢুকেও বসে থাকে তা হলেও-বা কি। এই সেদিনের কথা। সিপাহী বিদ্রোহের সময় হুসেন খাঁকে জেনানা মহলে কয়েক বছর লুকিয়ে থাকতে হয়। কিন্তু সে কি আমার শাড়ির আঁচলটুকুও দেখতে পেরেছে না আমার কথা শুনতে পেয়েছে। আমি জেনানা মহলের আরও ভিতরে বসে থাকতাম। আর চাকর-বাকরদের সাথে ইশারায় কথাবার্তা বলতাম।

আমিরন : দেখ, একে তুমি এমন একটি সাধ্বী স্ত্রীলোকের মেয়ে যে-স্ত্রীলোককে লোকে হজরতের মেয়ের মতোই শ্রদ্ধার্ঘ্য দিতে পারে। তার উপর ঐ বেশ্যাকে বিশ্বাস কী। হাজার রকম ব্যাধিতে ভরা। ওর পাশে বসলে কতক্ষণ আর তুমি নিজেকে বাঁচাবে। সে হয়ত তোমার চুন-খয়েরের কৌটোয় হাত ডুবিয়ে বসল। অথবা তোমার চোখের আড়ালে তোমার গ্লাস থেকে জল খেয়ে নিল। ওর ছায়া মাড়ানো থেকে তো বাঁচতে হবে।

বেগম সাহেবা : একটি কথা। বশীকরণের শিকড়-বাকড় এসব কথা থেকে তফাত থাকতে হবে। বোন যে-কথা বলেছে সব হয়ত ও বুঝবে না। ডাইনীরা যদি কিছু খাইয়ে দেয় ! মির্জা মহম্মদ আলির পুত্রবধূকে তার সতীন জোঁক খাইয়ে

দিয়েছিল। সংসারধর্ম তার কাছে অর্থহীন হয়ে গেল। সে নিঃসন্তান হয়ে রইল।

আমিরন : এই নাও, আমি কি আর জানিনে?

বেগম : সতীনদের এই শত্রুতার হাত থেকে বাঁচার রাস্তা হলো ওদের এড়িয়ে চলা। এড়িয়ে চললেও অবিশ্যি রেহাই নেই। আমাকেই দেখ না, ঐ মুখপোড়া ছোটলোকটির মেয়ে কী করতে বাকি রেখেছিল—খোদার কাছে দায় ভিক্ষে, তাবিজ, কবচ, কত ধরনের জিনিস যে আমার বালিশের তলা থেকে বেরত!

আমিরন : তবে তুমি ওকে ঘরে আসতে দিলে কেন?

বেগম : আরে বোন, ঝিগিরি করত। আমি কী করে জানব যে, আমার কর্তার সাথে ভাব-সাব রয়েছে! জানতে পেরেই সাথে সাথে বিদেয় করে দিয়েছি।

আমিরন : কিন্তু বেগম, একটি কথা বলি, খোদা জানেন, সে আপনার খুব সেবা করেছে।

বেগম : বেশ বললে, কর্তাকে ছিনিয়ে নিয়েছিল, তার সাথে আবার সম্বন্ধ কী। এই বুড়িকে কি ভাবো? এই বুড়ির সাথেও কোনো এক সময়ে কর্তা ছিলেন।

আমিরন : (খিল-খিল করে হেসে) না, বেগম সাহেবা।

বেগম : আমি কি মিথ্যে বলছি? সেজন্যই তো ও বারবার বলছিল যে, নিজের স্বত্ব বুঝে নেব।

আমিরন : আর বউরানী, তুমি কি জানতে না তোমার শ্বশুরের উপপত্নীকে এমন জুতো....

বেগম : বোন, এদের সে শিক্ষা কোথায়? সত্যি বলছি, আমিও এটি পছন্দ করিনি। শ্বশুরের উপপত্নীকে জুতো মারা হলো একটি বেশ্যার জন্যে। কাল মারা হবে শাশুড়িকে।

আমিরন : না, খোদা না করুন। কিন্তু একথা বলতে গেলে এসে যায়।

এই দুটো বুড়ি, বউ বেচারীকে এমনভাবে কথায় বিদ্ধ করতে থাকল যে, সে চিৎকার করে কাঁদতে থাকল। আর আমার অবস্থা হলো যেন আগুনের উপর শুয়ে আছি। মনে হচ্ছিল বুড়ি দুটোর মুখ ঘসে দিই।

রুশোয়া : হায় হায়! এত রাগ!

মেজাজটিকে রাখুন একটু বশে,
মর্যাদা না হারিয়ে ফেলেন শেষে।

উমরাও : মির্জা সাহেব, রাগ হওয়ারই কথা। একজন মানুষকে এতটা ঘৃণ্য ভাবা মনুষ্যত্বের বাইরে।

রুশোয়া : আমি তো এমন কোনো কথা দেখছিনে যাতে আপনার এত রাগ হতে পারে। ঐ দুটো বুড়ি ঠিকই বলছিল। আর লড্ডন খাঁর মাকেও মিছিমিছি পেটানো হলো। তা আপনি ভালোই বলুন আর মন্দই বলুন।

উমরাও : বাঃ! মির্জা সাহেব, আপনি বেশ বিচার করছেন।

রুশোয়া : জি হাঁ্যা, আমার বিচার এই রকমই। তিনি এই মামলায় একটি সীমা পর্যন্ত নির্দোষ ছিলেন। সব দোষ ছিল আকবর আলির বিবির।

উমরাও : ও বেচারীর কী দোষ ছিল?

রুশোয়া : দোষটি এমন ছিল যে, আমার বিবি এমনটি করলে তৎক্ষণাৎ পালকি ডাকিয়ে ওকে মায়ের কাছে পাঠিয়ে দিতাম আর ছমাস অবধি মুখ দেখতাম না। আচ্ছা, একটি কথা জিজ্ঞেস করি, আকবর আলি খাঁ এই বৃত্তান্ত শুনে কি বললেন?

উমরাও : লড্ডন খাঁর মাকে খুব চিৎকার করে তিরস্কার করলেন, চেঁচামেচি করলেন। বললেন, খবরদার এ ডাইনি যেন আমার বাড়িতে আর না আসতে পারে। কয়েকমাস ওর আসা-যাওয়া বন্ধ ছিল। বড় খানসাহেব আসার পর ও আবার আসতে থাকে। এই ঘটনা ওঁকে বলা হলে উনি আকবর আলির বিবির উপর রেগে যান।

রুশোয়া : বুড়োর বুদ্ধি বিবেচনা ছিল।

উমরাও : বুদ্ধি-বিবেচনা ছিল না ভগ্নস্নায়ু ছিল, জানিনে। লড্ডনের মা বুড়োর পা টিপে দিত, সেইজন্যই তার পক্ষ নিতেন, আর নেবেনই-বা না কেন। লড্ডনের মা ওঁর ভালবাসার প্রশ্রয়ে ছিল।

রুশোয়া : আপনিই হার মানলেন। ব্যবহারটি তাঁর খাঁটি ছিল। আচ্ছা, আরও একটি কথা বলেছিল। যৌবনে লড্ডনের মা কি বাঈজি ছিলেন, না গৃহস্থ ঘরের বউ? আর বোন আমিরন কে ছিলেন?

উমরাও : লড্ডনের হতচ্ছাড়ি মা ছিল ধুনুরীর বৌ। যৌবনে কুপথে চলে যায়; আমিরন পিসি ছিল এক গ্রাম্য মেয়ে। মাগুলক জিলায় ছিল তার বাড়ি। একটি জোয়ান ছেলে ছিল। ছেলেটিও বড় খান সাহেবের চাকর ছিল। আর মেয়েটির বাইরে কোথাও বিয়ে হয়।

রুশোয়া : বোন আমিরন আর বড খান সাহেবের সাথে কোনো সংযোগ ছিল না।

উমরাও : না, খোদার কাছে জবাবদিহি করতে হবে। আমিরন খুবই সচ্চরিত্র ছিল। গোটা মহল্লার লোক বলে, ও যুবতী বয়সে রাঁড়ী হয়ে এখানে চাকরি করতে আসে, আর কেউই ওকে খারাপ পথে যেতে দেখেনি।

রুশোয়া : আপনার কথায় পুরো ঘটনাটি বুঝতে পারলাম, এখন কী জিজ্ঞেস করবেন করুন।

উমরাও : আপনি কি কোনো মামলা বিচার করতে বসলেন নাকি?

রুশোয়া : খুব ভারি মোকদ্দমা! কথা হলো এই যে, স্ত্রীলোক হচ্ছে তিন রকমের, সচ্চরিত্র, বুদ্ধিহীনা ও বাজারি। দ্বিতীয় রকম স্ত্রীলোকের আবার দুটি

ভাগ, যে গোপনে খারাপ কাজ করে আর যে খোলাখুলি খারাপ কাজে লিপ্ত হয়।

সচ্চরিত্রদের সাথে কেবল তারাই মিশতে পারে যাদের কোনো বদনাম নেই। তুমি কি এটি বুঝতে পার না যে, ওই বেচারীরা সারাটি জীবন চারদেয়ালের মধ্যে কয়েদ থাকে, হাজার রকমের কষ্ট ভোগ করে। সুসময়ে সকলেই সঙ্গ দেয় কিন্তু দুঃসময়ে এই বেচারীরাই সঙ্গ দেয়।

যে সময়ে এঁদের স্বামী যুবক আর পয়সাওলা হয় সেসময় বাইরের স্ত্রীলোক নিয়ে বেশ মজায় থাকে। কিন্তু নিঃস্ব আর বৃদ্ধ বয়সে তার দুশ্চিন্তা করতে হয় না। এই সময়ে এই স্ত্রীলোকেরাই নানা ধরনের কষ্ট স্বীকার করেন আর স্বামীদের জন্য প্রাণে ধৈর্য ধরে থাকেন। এই জন্যই এঁদের একটি গর্ববোধ থাকবে না? এই গর্ববোধের ভিত্তিই হচ্ছে এই যে, এঁরা অসচ্চরিত্র স্ত্রীলোকদের খুব খারাপ চোখেই দেখেন। একে ক্ষমা করা দোষণীয় মনে করেন। ক্ষমার অযোগ্য যারা তাদের খোদা মার্জনা করতে পারেন কিন্তু এইসব স্ত্রীলোককে কিছুতেই তিনি মার্জনা করতে পারেন না। তাছাড়া আরেকটি কথা এই যে, হামেশা দেখা যায় অনেকের ঘরেই সুশ্রী, গুণবতী, যোগ্য পত্নী থাকলেও সেসব আহাম্মক এঁদের সাময়িক-ভাবে বা সারা জীবনের জন্য ছেড়ে দিয়ে এদের চেয়ে কুৎসিত আর অনেক গুণ খারাপ বাজারি মেয়েদের দিকে আকৃষ্ট হয়ে থাকেন। এই জন্যই এইসব স্ত্রীলোকের এমন ধারণা এমনকি বিশ্বাস যে, ঐসব নষ্ট চরিত্রের মেয়েলোক তাবিজ কবচ বা যাদু দিয়ে পুরুষদের বুদ্ধি-বিবেচনা লোপ করে দেয়। এটিও আবার এদের এক ধরনের মহত্ত্ব এই জন্য যে, এ অবস্থায়ও তাঁরা তাদের স্বামীদের উপর কোনো কলঙ্ক দেন না বরং ঐসব নষ্টা মেয়ে মানুষদেরই দোষী বিবেচনা করেন। এঁদের ভালবাসার এর চেয়ে বড় প্রমাণ আর কী হতে পারে!

উমরাও: এ সবই ঠিক, কিন্তু পুরুষমানুষ এমন আহাম্মক হয় কী করে?

রুশোয়া: এর কারণ হলো এই যে মানুষের স্বভাব মনের উন্মাদনার দিকে ঝোঁকা। একইভাবে জীবনযাপন করাটায় মনে একটা একঘেয়েমি আসে। সে চায় তার জীবনের ধারায় কোনো পরিবর্তন আসুক। বাজারি প্রণয়ীদের সাথে মিলেমিশে জীবন কাটানোয় এক ধরনের স্বাদ আছে যা তার ধারণায় ছিল না। এখানেও সে একটির আস্বাদনই যথেষ্ট মনে করে না। বরং নতুনত্বের সন্ধানে দৌড়ে নতুন কামরায় পৌঁছে যায় আর নতুন নতুন ঘর দেখে বেড়ায়।

উমরাও: কিন্তু সব পুরুষমানুষই এরকম নয়।

রুশোয়া: হ্যাঁ, এর কারণ এই যে, সুন্দর মিলেমিশে বাস করার নিয়মটি এই পুরুষমানুষেরা বর্জন করেছে। যেসব পুরুষমানুষ এরকম করে তাদের প্রিয় আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব তাদের তিরস্কার করে। এই ভয়ে সে প্রায়ই এসব কাজে জড়িয়ে পড়তে সাহস করে না। কিন্তু তারা যখন ভাই হিসেবে শয়তানের সাহচর্য

ঘটে তখন তার মনে এই সাহচর্যটি নানান ধরনের স্বাদ নেবার এক অদ্ভুত ধরনের ইচ্ছে সৃষ্টি করে। তার ফলে ঐ ভয়টি তার মন থেকে চলে যায়। আপনিই বেশ ভালভাবে বুঝবেন যে, যে লোক প্রথম প্রথম বেশ্যাবাড়ি যাতায়াত করে তার এক ধরনের গোপনীয়তার চিন্তা আসে। কেউ যেন না দেখে, কেউ যেন না শোনে, আর তুজন লোকের সামনে তো দূরের কথা বেশ্যার সাথে গোপনেও তার মুখ দিয়ে কথা বেরতে চায় না। কিন্তু ধীরে ধীরে এই অবস্থাটি একদম চলে যায়। সংক্ষেপে সে একেবারে নির্লজ্জ হয়ে পড়ে। আর তারপর দিনতুপুরে লোকজন নিয়ে সোরগোল তুলে রাঁড়ীর বাড়ি খটখট করে ঢুকে যায়। গাড়ির জানালা খুলে রাঁড়ীর সাথে হাওয়া খেতে বেরয়। মেলায় আমোদ-প্রমোদের জায়গায় হাতে হাত দিয়ে চলাফেরা করে।

উমরাও : সে তো ঠিক, কিন্তু শহরের লোক এসব পাপ বলে মনে করে না।

রুশোয়া : বর্তমানে দিল্লী আর লখনৌ ধ্বংস হয়ে যাওয়ার কারণই হলো এই-সব। গ্রামগঞ্জে এই রকম বদলোকের সাক্ষাৎ মেলে কম, যারা যুবকদের এইসব বদ কাজে নিয়ে যায়। তাছাড়া শহরে বেশ্যাদের মতো গ্রামগঞ্জে বেশ্যাদের অত দাপট নেই। এরা স্থানীয় ধনী ও জমিদারদের হুকুমের অধীন। আর এদের শক্তিতেই তাদের ধনপ্রাণ বাঁচে। তাই ভয়ও করে। আর এইজন্য এদের ছেলেদের সাথে খুব গোপনে মেলামেশা করে। কিন্তু শহরে কে কার ধার ধারে, সবাই স্বাধীন। তার ফলে এইসব ঘটে।

উমরাও : কিন্তু গেঁয়োরা বিগড়ে গেলে সীমা ছাড়িয়ে যায়। মিশলা মির্জা আর এরশাদ আলি খাঁয়ের ঘটনা তো আপনি শুনেছেন।

রুশোয়া : তার কারণ, ওরা এই ব্যাপারটি একদম জানে না। কিন্তু একবার মজা পেয়ে গেলে এরা সীমার বাইরে গিয়েও তাকে আঁকড়ে ধরে। আর শহরের লোক এর কিছু-না কিছু জানে। আর সেইজন্যই তাদের আবেগ এত তীব্র হয় না।

১৬

রুশোয়া : হ্যাঁ, আপনার সেই নাচিয়েটির হলো কি ? সেই যে ভালমত কি যেন একটি নাম !

উমরাও : আবাদী।

রুশোয়া : আবাদী তো বেশ সুশ্রী ছিল। ওর যখন দশ-বার বছর বয়স তখন আমি ওকে দেখেছি। যৌবনে ও আরো হয়ত লাবণ্যময়ী হয়েছে।

উমরাও : মির্জা সাহেব, আপনার বেশ মনে আছে !

রুশোয়া : মনে থাকারই তো কথা, ভবিষ্যতে সে একটি ফ্যাশনদুরস্ত স্ত্রীলোক হয়ে উঠবে। আমিও সেই দৃষ্টিতেই দেখতাম যে, সেও একদিন যুবতী হবে।

উমরাও : আবাদীর উমেদারদের মধ্যে আপনিও একজন ছিলেন, তাই বলুন না কেন !

রুশোয়া : শুনুন উমরাওজান, আমার একটি কথা খেয়াল রাখবেন। কোনো সুন্দরী নজরে পড়লে অবশ্যই আমার নাম স্মরণ করবেন আর সম্ভব হলে তার উমেদারদের একজন হিসেবে নাম লেখাবেন। আর যখন (খোদা না করুন) মরে যাব তখন আমার নামে প্রার্থনা জানাবেন।

উমরাও : আর যদি কোনো সুশ্রী পুরুষমানুষ নজরে পড়ে ?

রুশোয়া : আপনার নিজের নাম প্রার্থী তালিকায় আর আমার নাম তার বোনের প্রার্থীদের মধ্যে লিখিয়ে দেবেন। তবে শর্ত এই যে, শরিয়ত বাধা না হয়।

উমরাও : বাঃ, বেশ তো ! এতে শরিয়তের অধিকারের কী কথা ?

রুশোয়া : শরিয়তের অধিকার নেইই-বা কোথায় ? বিশেষত আমাদের শরিয়ত কোনো কিছুই বাদ দেয়নি।

উমরাও : তবে সোজাসুজি একথাটি বলছেন না কেন, শাস্ত্রে আছে জানি, কজনে তা মানি।

রুশোয়া : একথা বলার জায়গা অন্যত্র উমরাওজান, আমার জীবনের একটি বনিয়াদ রয়েছে সচ্চরিত্র স্ত্রীলোকদের আমি নিজের মা-বোন মনে করি, তা সে যে-কোনো বংশের বা জাতের হোক-না কেন। এঁদের সাথে কোনো খারাপ আচরণে বা এমন কোনো কথাবার্তা যা তাঁদের সতীত্বের উপর খারাপ প্রভাব সৃষ্টি করে আমার মনে ভীষণ আঘাত দেয়। যেসব লোক এঁদের ফুসলানো বা অন্য

কোনো বদ কাজে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে, আমার বিচারে তাদের গুলি করে মারা দরকার। কিন্তু উদার ও দয়াবতী স্ত্রীলোকের উদারতা থেকে লাভবান হওয়াটা আমার কাছে কোনো দোষের নয়।

উমরাও : শোভানাল্লা, চমৎকার।

রুশোয়া : এখন এইসব অপ্রাসঙ্গিক কথাবার্তা রেখে দিন। আবাদীর অবস্থা কী তাই বলুন।

উমরাও : মির্জা সাহেব, আবাদীকে যদি তার যৌবনে দেখতেন তবে আপনি নিশ্চয়ই এই কবিতাটি পড়তেন :

ওরে মন, কতই সে বদলে গেল
যৌবনের প্রত্যুষ যখন।
বিশ্বস্ততা, কোথায় সে
আমাদের বদলে যায় মন॥

যৌবনে ওর শ্রীছাঁদ এমনই ছিল যে সে ছিল শয়ের মধ্যে এক।

রুশোয়া : তার হলো কী, খোদার দোহাই জলদি বলুন। সেকি দারুচিনি দ্বীপে চলে গেল? যা হোক, তার বিপদটি কী ঘটল যে আপনি এমন হতাশার স্বরে কথা বলছেন?

উমরাও : আমার এখান থেকে সে গিয়েছে, দুনিয়া থেকেও গিয়েছে।

রুশোয়া : কিন্তু সে কোথায় এখন?

উমরাও : হাসপাতালে আর কোথায়?

রুশোয়া : যৌবনফুলের বিস্ময়।

উমরাও : খোদার কৃপায় খুব ফুলে-ফেঁপে গেছে। চেহারা খারাপ হয়ে গেছে। রং তো উল্টো হয়েই গেছে। সংক্ষেপে কথাটি এই যে, সৌন্দর্য তো গেছেই এখন জীবন বাঁচানোর জন্য হাসপাতালে পড়ে আছে।

রুশোয়া : তার হয়েছিল কী?

উমরাও : আর হবে কী? পোড়া রোগে ধরেছে। খারাপ চর্মরোগ। আমি খুবই আশা করেছিলাম যে মানুষ হবে, কিন্তু হয়নি। আমি কী না করেছি! ওস্তাদজিকে মাইনে দিয়ে রেখেছিলাম, মৌলবী তালিম দেয়া শুরু করেছিলেন। কিন্তু এসব কথায় তার মনোযোগ ছিল কবে? যৌবনে পড়তেই ওর ঘর আলাদা করে দিয়েছিলাম। শহরের কিছু নচ্ছার লোক বসতে লাগল। দিনরাত গালিগালাজ, ঘুসোঘুসি, জুতো মারমারি ঝঞ্ঝাট লেগেই ছিল। দম বন্ধ হয়ে যাওয়ার মতো। কারো উপর বাধা-নিষেধ নেই। যে-ই আসুক, তাকেই স্বাগতম। আমি ওকে মারপিট করেছি, বুঝিয়েছি। কিন্তু কবে সে তা শুনেছে? ছেলেবেলা থেকেই তার দুষ্কর্মে আসক্তি ছিল। সেসময়ে হুসেনি পিসির প্রপৌত্র জুম্মন যাওয়া-আসা করত, ওর সাথে খেলা করত। আমি ভাবলাম ছেলেমানুষ,

খেলা করুক। শেষে এমন সব ব্যাপার চোখে পড়ল যাতে জুম্মনের আসা-যাওয়া বন্ধ করে দিলাম। জনৈক মহাশয় আমার কাছে আসতেন। ভদ্রলোক একটু লাজুক। আমি গান গাইতাম। এরই সাথে ভাব জমানো শুরু করে দিল। ভদ্রলোক তো ছিলেন সদ্বংশের, কিন্তু ভারি পাজি। আমার কোনো মর্যাদাই রাখলেন না, না দেখলেন নিজের ইজ্জত। একদিন দেখি সন্ধ্যে হয়-হয়। এমন সময় দেউড়িতে আবাদীর সাথে কথাবার্তা হচ্ছে।

ছুট্টন সাহেব : আরে, আমি তো তোর চেহারাটাই ভালবাসি। হায় আবাদী, কী করব! আমি উমরাওজানকে বড় ডরাই।

আবাদী : যাও, এসব কথা বলো না, ভয় কিসের?

ছুট্টন : (আবাদীর ঘাড়ে হাত দিয়ে) নিরাকার মোহিনী চেহারা।

আবাদী : তাতে তোমার কী?

ছুট্টন : (একটি চুমু খেয়ে) আমার কী? প্রাণ যায়! মরছি!

আবাদী : মুখপোড়া চার আনা পয়সা পর্যন্ত দেয় না আবার মরছে। মিঞা সকলকেই মরতে দেখেছি, কিন্তু মরার পর প্রার্থনা সভা কারো দেখিনি।

ছুট্টন : চার আনা! আমি জান নিয়ে হাজির!

আবাদী : অকেজো প্রাণটি নিয়ে আমি করব কী?

ছুট্টন : নাও, আমার প্রাণের দাম নেই কারো কাছে!

আবাদী : নাও, কথা আর বাড়িও না। চার আনা পকেটে পড়ে থাকে তো দিয়ে দাও।

ছুট্টন : ও আল্লা, মার টাকা এখনো ভাগ হয়নি। পরশু নিশ্চয়ই নিয়ে আসব।

আবাদী : আচ্ছা, এখন প্রিয় ছেড়ে দাও, যাও।

ছুট্টন : আচ্ছা, আরেকটি চুম্বন তো দাও

ছুট্টন আবাদীর গলা জড়িয়ে ধরল। আবাদী তার পকেটে হাত দিয়ে আচমকা পড়ে থাকা তিনটে পয়সা বের করে নিল।

ছুট্টন : তোমাকে আমার মাথার দিব্যি, এ পয়সা আমার দিদির, সে রং আর দাঁতের মিশি কিনতে দিয়েছে।

আবাদী : তোমার মাথার দিব্যি, আমি দেব না।

ছুট্টন : কী করবে? পরশু চার আনা নিও।

আবাদী : বাঃ! ওমলেট খাব।

ছুট্টন : তিন পয়সার ওমলেট আচ্ছা, এক পয়সা নাও।

আবাদী : তিন পয়সার ওমলেট কি খুব বেশি হলো? অনেক দিন থেকে আমার খাওয়ার ইচ্ছে। কিন্তু কর্ত্রী দেয় না, বলে, পেট ব্যথা করবে। আমি তো একদিন লুকিয়ে এক আনার ডিম খেয়ে নিয়েছি, কিন্তু কিছুই হয়নি।

আমি মনে মনে বললাম, আমার তো একটুখানি খেলেই বদহজম হয়।

হতভাগিনী পীড়িতা।

রুশোয়া : ওকে কি ছুর্ভিক্ষের সময় কিনে নিয়েছিলেন ?

উমরাও : জি, হ্যাঁ। ওর মা এক টাকায় বেচে গিয়েছিল। তিনদিন ছিল উপোসী। আমি রুটি খাওয়াই আর একটি টাকা দিই। মির্জা সাহেব, আমার ভীষণ কষ্ট হয়েছিল। ওকে বললাম আমার এখানে থাক্, কিন্তু সে থাকল না।

রুশোয়া : হতভাগী কি আর কখনো এসেছিল ?

উমরাও : জি, কয়েক দফায় এসেছিল। মেয়েকে দেখে ভা-রি খুশি। আমাকে আশীর্বাদ করল। বছরে দু-একবার আসা-যাওয়া করত। আমিও সাধ্যমত তাকে সাহায্য করতাম। এখন কয়েক বছর আর আসে না। খোদা জানেন, মরে গেছে না বেঁচে আছে।

রুশোয়া : কোন্ জাতের ?

উমরাও : পাশী।

রুশোয়া : আচ্ছা সে গল্পটি তো রয়ে গেল, ছুট্টন কি চার আনা দিয়েছিল, না দেয়নি ?

উমরাও : আমার জীবনের জঞ্জাল একটি। ছুট্টন চলে যাওয়ার পর আমি মুখপুড়িকে খুব তিরস্কার করলাম, পয়সা ছিনিয়ে নিয়ে চকে ছুঁড়ে দিলাম।

আমার কামরার পাশাপাশি আরেকটি ছোট কামরা ছিল, মাসিক দু টাকা ভাড়া। এই কামরায় থাকত এক রাঁড়ী হুস্না। সেও ছিল যুবতী। এর সাথে আবাদীর চরিত্রগত মিল ছিল খুবই। দুজনে একসাথে উঠত বসত। হুস্নার সব বদগুণই সে রপ্ত করে নিয়েছিল। সে যেমন বেশ্যা তেমনি ছিল তার মেলা-মেশার লোকগুলি। কেউ-বা চলে এল একপোয়া তেলে ভাজা পুরি নিয়ে, কেউ-বা আবার নিয়ে আসে দু-আনায় একশটি আমের পঞ্চাশটি আম, কারো কাছে-বা ফরমান হয় দু গজ নয়নসুখের, আবার কারো কাছে বুটিদার মখমলের পায়জামা। মেলায় আমোদ-প্রমোদের জায়গায় থাকে দু-চার জন চেলা। মাথায় তাদের বড় বড় রুমাল বাঁধা ময়লা আঁট-সাঁট জামা অথবা পায়জামা, কারো-বা ধুতি পরা, হাতে তাদের লাঠি, গলায় হার। হুস্না বিবি ওদের সাথে দুলকি চালে চলেন। হরিণওয়ালী সরাইখানায় গিয়ে এক বোতল দেশী মদ উড়িয়ে দিয়ে ওখান থেকে ঝিমুতে-ঝিমুতে টলতে-টলতে নাচতে-নাচতে আর গাইতে-গাইতে বেরিয়ে আসে বিবি হুস্না। কখনো-বা ওর বগলের তলায় আবার কখনো-বা অন্যের গলায় তার হাত।

রাস্তায় কান্নাকাটি, গালিগালাজ আর জুতো ছোঁড়াছুঁড়ি চলে। এ অবস্থায় দু-এক জন তো রাস্তায়ই পড়ে গেল। তিন-চার জন মেলা পর্যন্ত পৌছয়। সেখানে গিয়ে মারে চরসে দম। এদের মধ্যে যার হুঁস থাকে সে হুস্নাকে আলিঙ্গনে বেঁধে অন্য বন্ধুদের এড়িয়ে নিজের ঘরে নিয়ে যায়। মেলার শেষে বন্ধুরা এসে হুস্নার

বাড়ির নীচে হৈ-হল্লা করে, গালাগালি দেয়, ঢিল ছোঁড়ে। হুম্মা তো কামরায় থাকে না আর থাকলেও সাড়া দেয় না। এরই মধ্যে চলে আসে পুলিশ। তারপর জনতা ছত্রভঙ্গ হয়। যে যার ঘরে চলে যায়। ব্যাস, আবাদীও এমনটি চাইত। ভালোর দিকে ওর মতি কোনোদিনই ছিল না। আমার কাছে আসতেন একজন নবাব, হোসেন আলি ছিল তার চাকর। শেষে এই হোসেন আলির সাথে বেরিয়ে গিয়ে তার ঘরে বসে রইল। তার স্ত্রী একটি দারুণ গণ্ডগোল সৃষ্টি করে বাড়ি থেকে চলে গেল। মিঞা হোসেন আলি আবাদীকে ভালবাসত। তার স্ত্রী বেরিয়ে যাওয়ায় সে ভ্রুক্ষেপ করল না। কিন্তু একটি মুশকিল ঘটল। রান্না করে কে? আবাদীকে তো উনুনে ফুঁ দিতে হলো। ওর এ অভ্যেসটি ছিল কবে? এইভাবে কোনো রকমে কয়েকটি দিন কাটল। এখানে তার একটি ছেলে হয়। খোদা জানেন, ছেলেটি হুসেন আলির না অন্য কারো। দু মাসের শিশুটি মারা গেল। এদিকে হুসেন আলির বিবি ভাত-কাপড়ের দাবিতে নালিশ করল। সে ডিক্রি পেল মাসে দেড় টাকার। নবাব ওকে দিচ্ছিলেন তিন টাকা মাসে। দেড় টাকায় কী হবে। বাড়তি টাকার উপর ছিল নির্ভর। কিন্তু তাতেও চলে না। আবাদীর ছিল বেহিসেবী খরচ করার অভ্যেস। শেষে মিঞা হুসেন আলির ঘর ছেড়ে দিয়ে ঐ মহল্লার একটি ছেলের সাথে ভেগে পড়ল। ওর পাঠানী মা ছিল এক ডাকসাইটে বেশ্যা যোগানদার। ওর ওখানেও দু-চার জন ইতর বেশ্যা থাকত। আবাদীর এটিই হলো বর্তমান ঠিকানা। ঐ পাঠানীর আয় কোনোরকমে আর একটু বাড়ল। মুন্না অর্থাৎ বাচ্চা নামটির আর বাস্তবতা ছিল না। মিঞা অর্থাৎ জোয়ান মরদ; মুন্নার এক গুরুভাই সাদাত মিঞা পাঠানীকে ধোঁকা দিয়ে আবাদীকে নিয়ে নিজের মায়ের কাছে পালিয়ে গেল। এর মায়ের ছিল মুরগী পালন করার শখ। বাড়ির পাশে ছিল একটি কবরখানা। মুরগীগুলি সেখানে চরত। বিবি আবাদী এখন এই মুরগীর দায়িত্বে নিযুক্ত হলেন। সাদাত মিঞা কাজ করতেন কোনো একটি কারখানায়। সে সারাটি দিন কাজ করত সেখানে আর ইনি চরাতেন মুরগী। এঁর সাথে কাল্লু সবজীওয়ালার ছেলে মহম্মদ বখশের হয়ে গেল ভাব-ভালবাসা, সাদাতের মা সেটি দেখেও ফেললেন, এবং ছেলেকে বলে দিলেন। সাদাত আচ্ছা করে জুতো পেটা করল আবাদীকে। মিঞা মহম্মদ বখশের আর একজন বন্ধু ছিল আমির মিঞা। নবাব মির্জা আমিরের সেবকদের মধ্যে একজন চাকর। সে ছিল ফুসলে নিয়ে যাওয়ার বিদ্যায় ওস্তাদ। এখানে আরো অনেক বন্ধুবান্ধবের মজলিশ বসত। এই সময়ে জানিনা কার দৌলতে এই রোগটি তাকে ধরে। এখন আর আমির মিঞার প্রয়োজন ফুরিয়েছে। সে ওঁকে হাসপাতালে রেখে আসে। বর্তমানে উনি সেখানেই আছেন। বলেন তো ডাকিয়ে আনি।

রুশোয়া: আমাকে মাফ করুন।

যা কিছু কামনা ছিল, যত অভিলাষ।
সকলি সফল হলো, হইনি নিরাশ॥

মুসলিম সপ্তম মাস রজবের নবম দিন। বসে থাকতে থাকতে মনে এল দরগায় যাই। প্রার্থনা করে সেলাম জানাই। সন্ধ্যে হতেই পালকি চড়ে সেখানে পৌঁছে গেলাম। বহু মানুষের জমায়েত। প্রথমে আমি দরগায় পুরুষমানুষদের এলাকায় এখানে-সেখানে ঘুরে বেড়াই। তারপর শমা অর্থাৎ কাঁচপাত্রের মধ্যে বাতি জ্বালাই, নৈবেদ্য দিই। একজন শোকগাথা পড়ছিলেন, তা শুনলাম। এলেন এক মৌলবী সাহেব। তিনি হদিশ, ধর্মগ্রন্থ পড়লেন. তারপর বুক চাপড়ে শোক প্রকাশ করলেন। এবার মানুষ নিজের নিজের ঘরে ফিরতে লাগল। ফিরে আসার সময়ের প্রার্থনাটি পড়ে আমিও চলে আসার মতলব করে দোরগোড়ায় পৌঁছে ইচ্ছে হলো দরগার মহিলা মহলটি দেখে চলে যাই। শোকগাথা গাওয়ার কল্যাণে আর নবাবের মায়ের সুপারিশে মেয়েরা প্রায়ই আমাকে জানত। ভাবলাম দু-চার জনের দেখা মিলবেই। আর এই সুযোগে কথাবার্তাও হবে। পালকিতে চড়ে পর্দা এঁটে জেনানা মহলের দরজায় পৌঁছুলাম।

মেয়ে প্রহরী এসে আমাকে পালকি থেকে নামাল। আমি ভিতরে গেলাম। আমার ধারণাটি ভুল ছিল না। অনেক স্ত্রীলোকের সাথে কুশল বিনময়, সিপাহী বিদ্রোহের পরের অবস্থা, একথা-সেকথা হলো। অনেক দেরি হয়ে গেল। আমি ফিরে আসারই মতলব করছিলাম। এরই মধ্যে দেখি কি ডানধারের প্রান্ত থেকে কানপুরের সেই বেগম চলে আসছেন। খুব ঠাট-ঠমক। গায়ে প্রচুর সোনার গয়না-গাঁটি। চার-পাঁচজন চাকরানী রয়েছে সাথে। একজন মাটিতে লুটিয়ে যাওয়া আঁচল ধরেছে, একজনের হাতে পাখা। একজন নিয়ে চলেছে লোটা আর পানের ডিবে। আর একজনের হাতে বিতরণের জন্য মিঠাইয়ের থালি। দূর থেকে আমাকে দেখেই দৌড়ে এসে কাঁধে হাতখান রাখলেন।

বেগম: আল্লা. উমরাও! তুমি তো খুব নিষ্ঠুর! কানপুর থেকে সেই যে উধাও হলে আর আজ দেখা হলো, তাও আবার দৈবাৎ।

আমি: কি যে বলি, যেদিন বাগে আপনার সাথে রাত্রে ছিলাম তার পরদিন সকালে লখনৌ থেকে লোক এসে আমাকে লখনৌ ধরে নিয়ে গেল। ফের পালাতে হলো সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে। খোদা জানেন, কত জায়গায় যে কিভাবে দিন কাটল। আমি পেলাম না আপনার কোনো পাত্তা, না আপনি পেলেন আমার খোঁজ-খবর।

বেগম: যাক, এখন তো আমরা দুজনেই লখনৌ-এ।

আমি: লখনৌ কেন, এ সময়ে আমরা একই জায়গায় তো আছি।

বেগম: এ থাকাটার কোনো অর্থ নেই। তোমার তো আমার বাড়িতে আসতে হবে।

আমি : সানন্দে। আপনি থাকেন কোথায় ?

বেগম : চৌপড়িতে নবাব সাহেবকে কে না জানে !

আমি জিজ্ঞেস করতেই যাচ্ছিলাম, কোন্ নবাব সাহেব, এরই মধ্যে এক চাকরানী বলে উঠল, নবাব মহম্মদ তকিখানের বাড়ি কে না জানে !

আমি : যাওয়ার তো ভয়ানক ইচ্ছে, কিন্তু নবাব সাহেব আবার কিছু মনে না করেন।

বেগম : না, ওঁর মনটি সেরকমের নয়। আর তাছাড়া তোমার জন্যই আমি সে রাতের অবস্থাটি তিলে তিলে বর্ণনা করেছি। উনি নিজেও কয়েকবারই কানপুরে তোমাকে খুঁজতে লোক পাঠিয়েছেন। আর হরদম তোমার কথা লোকের কাছে জিজ্ঞেস করেন।

আমি : বেশ, আমি নিশ্চয়ই যাব।

বেগম : কবে আসবে, কথা দাও।

আমি : সামনের বৃহস্পতিবার আমি যাব।

বেগম : ওহো, তুমি আবার বৃহস্পতিবারে ঘুরে বেড়াবার ইচ্ছে কবে পেলে ? এখন তো পুরো আট দিন বাকি। এর মধ্যে আসছ না কেন ?

আমি : বেশ, সামনের সোমবার আসব।

বেগম : রবিবারে এস। নবাব সাহেবও বাড়িতে থাকবেন। সোমবার উনি কে একজন ইংরেজ সাহেবের সাথে দেখা করতে যাবেন বোধহয়।

আমি : আপনার পছন্দমত রবিবারেই যাব।

বেগম : কোন্ সময়ে আসবে ?

আমি : যে সময়ে বলবেন, ঘরে আমার কোনো কাজ নেই। আমার সব সময়ই সমান।

বেগম তুমি থাক কোথায় ?

আমি : চকে, সৈয়দ হুসেন খানের ফটকের পাশে।

বেগম : বেশ, আমি পরিচর্যাকারিণীকে পাঠিয়ে দেব, ওরই সাথে তুমি চলে আসবে।

আমি : বহুত আচ্ছা !

বেগম : আচ্ছা, খোদা কুশলে রাখুন।

আমি : বেশ, হ্যাঁ, বলুন তো সাহেবজাদা কেমন আছে ?

বেগম : নব্বন, খোদার দোয়ায় ভালোই আছে, নাও এখন তোমার মনে পড়ল।

আমি : কি বলব, কথায় কথায় ভুলে গেছি। আর কী রকম ভুল। জিজ্ঞেস করব ভাবছি এদিকে অন্য কথা এসে পড়ছে।

বেগম : এখন ভালোই আছে, বড় হয়েছে। ঐ দিন ওকেও দেখবে।

আমি : রাতের ঘুম চলে গেল। এখন আর কিছু বলবেন না, খোদা রক্ষে করুন।

বেগম : খোদা রক্ষে করুন, দেখ নিশ্চয়ই আসবে কিন্তু।

এরই মধ্যে সেবাদাসী দেখল যে, কথা চলেছেই; সে বলতে লাগল বেগম সাহেবা চলুন, বেয়ারা দেরি দেখে চিৎকার শুরু করেছে—পালকি এসে গেছে।

কম-বেশি রাত দিন
করেছি অনেক গবেষণা
দুনিয়া কী চালে চলে
রহস্যের মেলেনি ঠিকানা॥

খানুমের কাছ থেকে আমি পৃথক হয়ে গেলেও যতদিন তিনি বেঁচে ছিলেন, তাঁকে আমার অভিভাবক বলে ভেবেছি। আর সত্যি, উনিও আমাকে স্নেহ করতেন। ওঁর কাছে এত টাকা-পয়সা ছিল যে উনি আর তার লালসা রাখতেন না। তাঁর বয়স যত বাড়তে থাকে দুনিয়ার দিক থেকে তিনি ততই মুখ ফিরিয়ে নিতে লাগলেন। তখন উনি কারো কোনো কথায় কান দিতেন না। কিন্তু সেই রকমই ভালবাসতেন। বেঁচে থাকতে উনি কোনো বাঈজিকেই তাঁর বাড়ি থেকে চলে যেতে দেননি। আমার উপর তো তাঁর স্নেহ ছিল আন্তরিক। বিসমিল্লাজান তাঁকে অনেক জ্বালাতন করেছে। সেজন্য তিনি ওর উপর রুষ্ট ছিলেন, কিন্তু তবুও তো নিজের মেয়ে। সিপাহী বিদ্রোহের পর খুরশিদও এসে খানুমের কাছেই রয়ে গেল। আমিরজানও অন্য জায়গায় ঘর ভাড়া নিয়েছিল। সেও যাওয়া-আসা করত, থাকত।

যে-ঘরটি খানুম আমাকে দিয়েছিলেন তিনি বেঁচে থাকতে সে ঘর আর খালি করে দেননি। আমার আসবাবপত্তর সব ছিল ঐ ঘরে বন্ধ। আমার তালা লাগানো ছিল সেটিতে। মন চাইলে ওখানেই গিয়ে থাকতাম, সারাটি বছর যেখানেই থাকি-না কেন মহরমের সময় তাজিয়া তৈরি করে শোক প্রকাশ করতে আসতাম। খানুম না মরা পর্যন্ত আমার নামে তাজিয়া রাখতেন।

বৃহস্পতিবার বেগমের সাথে দেখা হয়। পরের দিন, শুক্রবার লোক এসে খবর দিল খানুমের শরীর খারাপ, তোমাকে স্মরণ করেছেন। তখনি আমি পালকিতে গেলাম, ওঁকে দেখে ঘরে ফেরার মতলব করছি, মনে হলো দামী কাপড়-চোপড় ঘর থেকে বের করে নিই। ঘরের তালা খুলে দেখি চারধারে মাকড়সার জাল বিছিয়ে রয়েছে, খাটে একরাশ ধুলো, বিছানার চাদর ও কার্পেট ওলট-পালট হয়ে পড়ে আছে, এখানে-সেখানে জঞ্জাল। এসব দেখে আমার পুরনো দিনের কথা মনে পড়ল। আল্লা, এমনও দিন ছিল যখন এ ঘরখানি সর্বদা সাজানো গোছানো থাকত। দিনে চার বার ঝাড় পড়ত, বিছানাও ঝাড়া হত। ময়লার লেশমাত্র ছিল না। কুটোটি পর্যন্ত দেখা যেত না। আর অবস্থাটি হয়েছে এখন:

এমন যে, একটি নিশ্বাস ফেলা পর্যন্ত ওখানে বসতে ইচ্ছে করে না, যে খাটে আমি শুয়ে থাকতাম সেখানে এখন পা পর্যন্ত রাখতে ঘেন্না করছে। সাথে লোক ছিল। তাঁকে বললাম, মাকড়সার জাল অন্তত সরিয়ে দাও। খুঁজেপেতে সে কোথা থেকে একটি ঝাড়ু নিয়ে এসে মাকড়সার জালগুলি সাফ করতে থাকল। এর ফাঁকে আমি নিজের হাতে খাটিয়াটি উল্টে দিলাম। চাঁদোয়া ঠিক করে চাদর বিছানোর পর পালঙ্কের বিছানাটি ঝাড়িয়ে নিলাম। পাশের ঘর থেকে রূপসজ্জার পাত্র পানের ডাবর ও পানের পিকদানটি নিয়ে এলাম। সব জিনিসই তাদের নিজের নিজের স্থানানুযায়ী সাজিয়ে দেওয়া হলো, ঠিক যেমনটি আগের কালে ছিল। নিজে পালঙ্কে তাকিয়া ঠেস দিয়ে বসে লোকটির কাছ থেকে পানের ডিবের পান নিয়ে খেলাম। সামনে আয়না রেখে মুখ দেখতে লাগলাম। স্মরণে এল আগেকার দিনগুলো। যৌবনের দিনগুলো যেন ছবির মতো চোখের পর্দায় ভাসতে থাকল। সেই সময়ের গুণগ্রাহীদের ছবি মনে গেঁথে গেল, গৌহর মির্জার ফকড়ামি, রসিদ আলির নির্বুদ্ধিতা, ফয়েজ আলির ভালবাসা, সুলতান সাহেবের চেহারা, সংক্ষেপে যে-যে মহাশয়রা এই কামরায় আসতেন তাঁরা সকলেই নিজের নিজের বৈশিষ্ট্য নিয়ে আমার চোখের সামনে এসে দাঁড়ালেন। কামরাটি এই সময়ে ম্যাজিক চীনা লণ্ঠন হয়ে উঠেছিল। একটি ছবি সামনে আসে আর চলে যায়, আবার আরেকটি আসে। সব চেহারা চোখ থেকে সরে গেলে আবার নতুন করে গোড়া থেকে শুরু হলো। আবার সেই চেহারাগুলোই একের পর এক আসতে থাকল, প্রথমে খুব তাড়াতাড়ি শেষে একটু ধীরে ধীরে। এবার প্রতিটি ছবির উপর আমার আরো বেশি মনোযোগ দেওয়া ও চিন্তা করার সুযোগ মিলল। যেসব ঘটনা যেসব ব্যক্তির সাথে সম্পর্কিত ছিল তার অনুপুঙ্খ বিবরণ মনে পড়তে থাকল। মগজ যখন প্রথমে ক্রিয়াশীল ছিল তখন কয়েকটি ছবিই মাত্র চোখের সামনে ভাসছিল, এখন প্রত্যেকটি ছবি থেকে অনেক ছবি বেরিয়ে আসতে লাগল আর ততই ম্যাজিক চীনা লণ্ঠনটিতে অনেক লোকের উপস্থিতি বেড়ে যেতে থাকল। সারা জীবনভর যা কিছু দেখেছি সবই চোখের সামনে ভাসছে।

এর ভিতর সুলতান সাহেবের চেহারা একবার মনে এল আর সেই সাথে মনে এল আমার প্রথম মুজরো গাওয়ার সভার কথা যে-সভায় সুলতান সাহেবের সাথে দেখা হয় আর তার পরের দিন তাঁর চাকর আমার ঘরে আসে। তারপর তাঁর নিজের আসা, মজার মজার কথাবার্তা, কাব্যচর্চা, খান সাহেবের হাজির হয়ে ব্যাঘাত ঘটানো, অশ্রাব্য কথা বলা, সুলতান সাহেবের পিস্তল দিয়ে গুলি করা, খান সাহেবের পড়ে যাওয়া, সমশের খাঁয়ের প্রভুভক্তি, কোতোয়ালের আগমন, খান সাহেবকে ঘরে পাঠিয়ে দেওয়া, সুলতান সাহেবের না-আসা, জনসমাবেশে ওঁকে দেখা, ছেলেটির হাত দিয়ে চিরকুট পাঠানো, আবার নতুন

করে সম্পর্ক পাতানো নওয়াজগঞ্জ জলসা, এসব ঘটনাগুলি এমনই হচ্ছিল যেন কালই হয়েছে। এই চিন্তাধারাটিই সমানে চলছিল। কিন্তু যখন প্রথম মুজরোর পরে সুলতান সাহেবের চাকরের সংবাদ নিয়ে আমার কথা মনে পড়ে গেল তখন একটু যেন থেমে গেলাম। মনে হচ্ছিল যেন এই সময়ের কিছু ঘটনা বাদ পড়ে যাচ্ছে। এরই মধ্যে আমার চাকরটি একটি জোর চিৎকার করে উঠল।

লোকটি : বিবি, দেখুন আপনার দুপাট্টার উপর টিকটিকি উঠেছে।

আমি ওঃ করে উঠে দোপাট্টাটি ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে একটু সরে দাঁড়ালাম। লোকটি দোপাট্টাটি তুলে ঝাড়া দিতেই টিকটিকিটি থপ করে মাটিতে পড়ে বুকে হেঁটে পালঙ্কের পায়ের নীচে চলে গেল।

লোকটি খাটের পায়া তুলে দেখে যে পায়ার নীচে পাঁচটি স্বর্ণমুদ্রা পাশাপাশি বিছানো রয়েছে।

লোকটি : (খুবই আশ্চর্য হয়ে) আহা, নিন এসব কী?

আমি : (মনে মনে আহা, এ যে সেই স্বর্ণমুদ্রাগুলি! লোকটিকে) স্বর্ণমুদ্রা।

লোকটি : বাঃ, স্বর্ণমুদ্রা এখানে এল কোথা থেকে?

আমি : (হেসে) ঐ টিকটিকিটি সোনা হয়ে গেছে। বেশ, কুড়িয়ে নাও। লোকটি প্রথমে একটু ইতস্তত করে স্বর্ণমুদ্রাগুলি তুলে আমাকে দিল।

রুশোয়া : তবে কি সিপাহী বিদ্রোহের সময় খানুমের বাড়িটি লুঠ হয়নি?

উমরাও : লুঠ হবে না কেন? কিন্তু মেনে নিন যে কেউ আমার পালঙ্কের পায়াটি তুলে দেখেনি।

রুশোয়া : তা সম্ভব।

যেভাবেই হোক, তৃপ্তি পাক হৃদয়-বাসনা
দ্বেষই বা করি বল কিসে,
বাঞ্ছিতের দেখা পাব আজ
সমপসারিণী সাথে মিশে।

রবিবার দিন সকাল আটটায় বেগমের দাসী পালকি বেহারা নিয়ে একেবারে আমার মাথার উপর চেপে বসল। আমি সবেমাত্র ঘুম থেকে উঠেছি, ভালো করে তামাকও খাওয়া হয়নি। সে তো তাড়াতাড় যাওয়ার জন্য তাগিদ দিতে শুরু করল। আমি তো ভেবেছিলাম খানা-দানা খেয়ে তারপর যাব। সে বলল, বেগম সাহেবা মাথার দিব্যি দিয়ে বলেছেন যে খানা ওখানেই গিয়ে খেতে হবে। আমি জিজ্ঞেস করলাম নবাব সাহেব বাড়িতে আছেন? সে বলল, না। সকালে উঠেই তিনি জমিদারি দেখতে গেছেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, ফিরবেন কখন? দাসী বলল, আসলে তিনি সন্ধ্যে নাগাদ আসবেন। বেগম সাহেবার সাথে আমার অনেক কথাবার্তা ছিল, সেইজন্য তড়িঘড়ি উঠে বসলাম। হাত মুখ ধুয়ে, মাথার চুল বেঁধে কাপড় পরে একজন দাসীকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

গিয়ে দেখি বেগম সাহেবা আশা করে বসে আছেন। আমি যাওয়ার সাথে-সাথেই খানার টেবিলে চাদর বিছানো হলো। আমি আর বেগম সাহেবা একসাথে বসে খেয়ে নিলাম। খাওয়াটি ছিল বেশ শ্রমসাধ্য।

পরোটা, কোরমা, নানারকম ব্যঞ্জন, সরু চালের পোলাও, নয় রকমের চাটনি, আপেলের মোরব্বা, চমৎকার হালুয়া।

খাওয়া-দাওয়া সেরে চুপি চুপি আমার কানে কানে বললেন, কি হে, সেই করিমের ঘরে অড়হরের ডাল আর জোয়ারি রুটির কথা মনে পড়ে?

আমি : চুপ কর, কেউ শুনে না ফেলে।

বেগম : শুনলে কী হয়েছে? কেউ কি জানে না যে নবাবের মা (খোদা তাঁকে স্বর্গে স্থান দিন) নবাবের জন্য আমাকে কিনে নিয়েছিলেন?

আমি : খোদার দোহাই, কোনো জায়গায় আলাদাভাবে চল তো, সেখানে কথাবার্তা হবে।

খাওয়ার পর হাতমুখ ধুয়ে পান খেলাম। দাসী এসে হুঁকো সেজে দিয়ে গেল। বেগম সাহেবা কোনো-না কোনো ছুতোয় সকলকে সরিয়ে দিলেন।

আমি : বা রে! তুমি তো আমাকে চিনে ফেলেছ!

বেগম : প্রথম তোমাকে যেদিন কানপুরে দেখি সেইদিনই চিনতে পেরেছি। প্রথমে তো মনে অনেকক্ষণ আলোড়ন চলছিল। মনে মনে ভাবছিলাম এঁকে কোথায় যেন দেখেছি কিন্তু কোথায়? কিছুই মনে আসে না। নানাভাবে চিন্তা করেও কিছু বুঝতে পারলাম না। এমনি সময়ে করিমন চাকরানীর দিকে চোখ পড়ল। করিমন নামেই হারামজাদা করিমের নাম মনে এল। বেটার মাথাটি যেন কেটে ফেলি! মন বলল, ওহো, হয়েছে, একে করিমের বাড়ি দেখেছি।

আমি : আমারও সেই ভাবনা হচ্ছিল। অনেকক্ষণ ধরে চিন্তা-ভাবনা করলাম। আমার সাথীদের একজন আছে খুরশিদ। তোমার চেহারার সাথে তার খুব মিল রয়েছে। যখন আমি খুরশিদকে দেখতাম তোমার কথা মনে পড়ত।

বেগম : এখন আমার অবস্থা শোনো, তোমার কাছ থেকে ছাড়াছাড়ি হওয়ার পর নবাবের মা উমদাতুন্নেষা বেগমের কাছে আমাকে বিক্রি করা হলো। তোমার বোধহয় মনে আছে আমার বয়স তখন বার বছর হবে, নবাবের বয়স তখন ষোল। নবাবের বাবা থাকতেন কানপুর। বেগম সাহেবা থাকতেন স্বতন্ত্রভাবে। নবাব সাহেবের বাবা নবাবের বিয়ে তাঁর বোনের মেয়ের সাথে দেবেন বলে স্থির করেন। বাড়ি ছিল দিল্লী। বেগম সাহেবার ইচ্ছে ছিল না যে সেখানে বিয়ে দেন। উনি চাইতেন ওঁর ছেলের বিয়ে ওঁর ভাইয়ের মেয়ের সাথেই হোক। মিঞা-বিবির তো প্রথম থেকেই বনিবনা ছিল না। এ ব্যাপারে জেদ আরও

গেল বেড়ে। এ ঝগড়ার কোনো মীমাংসা না হতেই নবাবের ছেলে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। হেকিমরা বিচার-বিবেচনা করে বললেন, খুব তাড়াতাড়ি বিয়ে দিন, নইলে পাগল হয়ে যাবে। বিয়ে দেওয়া তো কোনো রকমেই সম্ভব ছিল না, এমনি সময়ে আমি গেলাম পৌঁছে। বেগম সাহেবা আমাকে কিনে নিলেন।

নবাব সাহেব আমার দিকে ঢলে পড়লেন, আর এমনই ঢলে পড়লেন যে দুটি জায়গাতেই বিয়ে করতে খোলাখুলি অস্বীকার করলেন। কিছুদিন বাদে, খোদার এমনই করুণা যে, বেগম সাহেবা মারা গেলেন আর তার কয়েকদিন বাদেই বড় নবাব সাহেবেরও মৃত্যু হলো। মা-বাবা দুজনেরই সম্পত্তি ছিল। আর ইনি ছিলেন একমাত্র পুত্র। উভয়েরই ধন-সম্পত্তির মালিক হলেন ইনি।

নবাব সাহেবকে খোদা সুস্থ রাখুন, যাঁর দৌলতে আমি বেগম হয়ে বসেছি, আর আরাম করছি। নবাব আমাকে তাঁর বিয়ে করা বিবির মতোই ভালবাসেন। আমি যতদূর জানি তিনি আর কারো দিকে ফিরেও তাকান না। বাইরে ইনি নিজের বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে যা খুশি করেন। পুরুষমানুষের জাত, আমি তো আর তাঁর পিছু পিছু যেতে পারি না।

খোদা আমার সকল কামনাই পূর্ণ করেছেন। একটি ছেলের আকাঙ্ক্ষা ছিল। খোদার কৃপায় ছেলেও হয়েছে। এখন শেষ প্রার্থনা এই যে, খোদা বব্বনের উন্নতি করিয়ে দিন, বিয়ে দিয়ে বউ ঘরে আনি আর পৌত্রের সাথে খেলা করি, তারপর যেন মরে যাই। নবাবের হাতের স্পর্শে আমার কবরের মাটি পবিত্র হয়ে যাবে। এবার তোমার কথা বল।

রামদেই যখন একথা বলছিল তখন আমার ভাগ্যের জন্য খুবই আফসোস হচ্ছিল আর মনে মনে বলছিলাম ভাগ্য যদি হয় তো যেন এমন ভাগ্যই হয়। একে আমার ভাঙা কপাল। বেশ্যার ঘরের বেশি কথা বলারই-বা কী আছে?

এরপরে আমার সংক্ষিপ্ত কাহিনী শোনালাম, যা আপনি সবই জানেন। আমি সারাটি দিন সেখানে থাকলাম। নিজেদের ব্যক্তিগত কথাবার্তা শেষ হয়ে গেলে চাকরদের উনি ডাকলেন। তবলাজোড়া, সেতার, তানপুরা চাকর এনে দিলে গান-বাজনার আসর বসল।

যখন আমরা দুজনে আলাদাভাবে থাকতাম তখন ও ছিল রামদেই আর আমি আমিরন। সব লোকজনের সামনে ও হয়ে যেত বেগম সাহেবা আর আমি উমরাওজান। তিন-চার ঘণ্টা ধরে গান-বাজনা চলল। বেগম সাহেবাও একরকম বাজাতে পারতেন। আমার গাওয়া শেষ হলে সেতারে ও কয়েকটি গান বাজাল। একটি স্ত্রীলোক ছিল সুকণ্ঠ। তাকে দিয়ে গাওয়ালাম। সন্ধ্যে পর্যন্ত গান-বাজনার একটি জলসা চলল।

১৭

ওরে চোখ, প্রেমিকের দিকে
ফেরাবে দৃষ্টি সাবধানে
আলোচ্য না হয়ে পড়ে সেটি
সকলের কাছে সভাস্থানে।

সন্ধ্যের কাছাকাছি বাড়িতে নবাব আসছেন, একটি সোরগোল উঠল। খাসা জলসাটি বন্ধ করে দেওয়া হলো। তবলাজোড়া, সেতার, তানপুরা সব সরিয়ে রাখা হলো। পরদা টাঙাবে যারা তারা উঠে পরদা টাঙাতে গেল। আর সবাই যে যার জায়গায় সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়াল। আমিও বেগম সাহেবার কাছ থেকে সরে পোশাক-আশাক ঠিক করে বসে পড়লাম। যে হলটিতে আমরা বসেছিলাম সেখান থেকে দরজা সামনে পড়ে। দরজায় পরদা দেওয়া। নবাবের অপেক্ষায় চোখ দুটি পরদার উপর নিবদ্ধ হলো। আমিও তেমনিভাবে দেখছিলাম। এরই মধ্যে একজন ভৃত্য চিৎকার করে উঠল, নবাব সাহেব আসছেন। কয়েক মুহূর্তেই দাসী পরদা উঠিয়ে বলল, পরম কারুণিক খোদার নামে।

নবাব সাহেব ভিতরে প্রবেশ করলেন।

আমি : (চেহারা দেখেই মনে মনে) ওই তো তিনি! (সুলতান সাহেব)। হায়, হায় কোন্ সময়ে সামনে এসে পড়েছি। নবাবের চোখ পড়ল আমার উপর। প্রথমে একটু চমকে গিয়ে পরে আমার দিকে দৃষ্টি রেখে তিনি এগিয়ে এলেন। আমিও ওঁর দিকে তাকিয়ে রইলাম।

দেখছি আমি তাঁর চোখে বিস্ময় অপার।
তিনি দেখেন আমার চোখে প্রকাশ বেদনার॥

নবাব এখন হলের কাছাকাছি পৌঁছে আমাকে দেখতে দেখতে যাচ্ছিলেন, সে সময়ে বেগম বললেন, ওহো নবাব, দেখছ কী? ওই-ই সেই উমরাওজান যে কানপুরে . ।

(অজ্ঞতার ভান করে) হ্যাঁ, এঁর কথাই তোমার কাছ থেকে শুনেছিলাম।

এবার উনি পাতা কার্পেটের কাছাকাছি এসে গেলে মাননীয়কে উঠে দাঁড়িয়ে সবাই সম্মান দেখাল। নবাব বেগমের একটু পাশে মসনদের উপর বসলেন।

এখন সন্ধ্যে হয়ে গেছে দাসী দুটি সাদা আলোর বাতি এনে সামনে রাখল। বেগম পান তৈরি করতে লাগলেন। এই ফাঁকে নবাব আড়চোখে আমার দিকে

চাইলেন। তির্যক দৃষ্টিতে আমি দেখলাম তাঁকে। না পারছেন তিনি আমাকে কিছু বলতে, না পারছি আমি। মুখে কিছু বলার সুযোগ ছিল না। কিন্তু সে সময়ে চোখই ভাষার কাজ করেছিল। নালিশ-ফরিয়াদ চোখ ঠারাঠারি সব হলো ইশারায়।

নবাব: (অচেনার ভঙ্গিতে) উমরাওজান সাহেবা, বাস্তবিকই আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ। সত্যি বলতে কি সেদিন তোমার জন্যই আমার বাড়ি লুঠ হওয়া থেকে রক্ষে পায়।

আমি: আমাকে আবার কানপুরে টানছেন কেন, সেতো একটি দৈবচক্রের কথা।

নবাব: সে যা কিছু হোক তোমার জন্যেই তা সম্ভব হয়েছে। আসবাবপত্র তো ওখানে কিছু ছিল না। কিন্তু একটি বড় উপকার হয়েছিল। সমস্ত জরুরি দলিলপত্র জমা ছিল ওখানেই।

আমি: হুজুর অমন দিনগুলোতে স্ত্রীপুত্র ছেড়ে গিয়েছিলেন কোথায়?

নবাব: সে আর কী বলব, ঐ রকমই নিরুপায় ছিলাম। লখনৌ-এর সব সম্পত্তি বাদশাহ বাজেয়াপ্ত করে নিয়েছিলেন। তাই কলকাতায় লাট সাহেবের কাছে যাওয়াটা ছিল খুব জরুরি। এত তাড়াতাড়ি যেতে হয় যে কিছু আনা বা নিয়ে যাওয়ার কোনো ব্যবস্থাই করতে পারিনি। শমশির খাঁ আর একজনকে সাথে নিয়ে রওনা হতে হয়।

আমি: ঐ বাড়িটি এমনই জঙ্গলে যে দুর্ঘটনা কিছু না ঘটলেই আশ্চর্য হওয়ার কথা।

নবাব: ঐ ঘটনা ছাড়া আর কোনো দুর্ঘটনা কখনো হয়নি। কারণ এই যে বিদ্রোহে বদমায়েশরা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল। দেশ অন্ধকারে ডুবে গিয়েছিল।

এরপর আরও একথা-সেকথা হলো। তারপর খাবার টেবিলে চাদর বিছানো হলো। সকলে মিলে একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করলাম। পান-তামাক খাওয়া চুকে গেলে গানের জন্য নবাবের ফরমাস হলো। আমি গজল শুরু করলাম:

মরতে বসেও তবু মরণের চিন্তা না আসে
অদা, সেই কাফেরটি শুধু মনে ভাসে।
তোমার তো মনে অদা, আসে না কো
সে প্রেমের কথা
যদিও-বা মনে আসে সে তো শুধু
পেয়েছ যে ব্যথা!
প্রিয়তমের রাত কেটে যায়
কোনোরকমেই

প্রিয়তমার সেই বেণীটির
কথাটি ভেবেই
বিচ্ছেদে তোমার কথা বারবার
এসেছে স্মরণে
তুমি ছাড়া আর শুধু মরণের
কথা ভাবি মনে।
নিষিদ্ধ এ প্রেমের কী স্বাদ
জিজ্ঞেস করো না কিছু তার
স্বর্গে যদি-বা যাই তবু এ আপদ
সঙ্গ ছাড়ে না আমার।
তোমরা কাজের লোক, তাই
কিছু বিষ এনে দাও
তবেই তো আমার এ অসুখের
ঠিক ওষুধ পাও।

কবিতার আর কোনো অংশ মনে নেই, তার শেষ চরণটি হলো এই—

চমৎকার গজলটি গেয়েছে কে সে
বাতাসে সুবাস আজ কেন আসে ভেসে।

বর্ষাকাল, ঝম্‌ঝম্‌ বৃষ্টি ঝরছে। সময়টি আমের মরশুম। আমার কামরায় আজ জমা হয়েছে বাঈজিদের মধ্যে বিসমিল্লাজান, আমিরজান, বেগাজান, আর খুরশিদজান, আর পুরুষদের মধ্যে নবাব বব্বন সাহেব, নবাব ছব্বন সাহেব, গৌহর মির্জা, আসিক হোসেন, তফজুল হোসেন, আহমদ আলি আর আকবর আলি খাঁ। গান চলছে। এমনি সময়ে বিসমিল্লা বলল, ভাই, গান তো রোজই হয়। এমনি সময় কড়াই চড়াও। কিছু পাক কর। দেখ বর্ষা ঝরছে। আমি উল্টে বললাম, বাজার থেকে প্রাণ যা চায় আনিয়ে নাও।

খুরশিদ : বেশ তো বললে, বাজার থেকে আনিয়ে নাও। নিজের হাতে রান্না করার মজা অন্য রকমের।

আমি : বোন, তোমার তো হাঁড়ি ঠেলতে মজা লাগে, আমি তো কোনোদিন রান্না করিনি, রান্নার কদর কি তাও জানিনে।

বেগা : তবে বাজার থেকেই আনা।

আমি : আহা, তোমাদের কি খিদে পেয়েছে ?

খুরশিদ : আমার তো খিদে পায়নি, বিসমিল্লাকে জিজ্ঞেস কর, উনিই তো পরামর্শটি দিলেন।

বিসমিল্লা : কিছু একটা তো আজ করা যাক।

আমি : বলব ? চল তবে বখশীর দিঘিতে যাই।

বিসমিল্লা : তা ভাই, ভালোই বলেছ।

খুরশিদ : বেশ কাব্য পড়া যাবে।

বেগা : আমিও যাব।

আমি : তবে বন্দোবস্ত কর।

কথা বলতেই তিনটে ভাড়া-গাড়ি এসে গেল। রান্নাবান্নার জিনিসপত্র সব গাড়িতে চাপানো হলো। নবাব বব্বন সাহেবের বাড়ি থেকে এল দুটো তাঁবু সবাই গাড়ি চড়ে রওনা দিলাম। গোমতী নদীর ধারে পৌঁছে সেদিন বেগাজান গাইল :

আম্রশাখায় দোল খেলে গো কার সাথে ?

কেমন সব সুরে সে গাইল, যেন মন ভরে গেল।

শহরের বাইরে বনের শোভা দেখার মতো, যেদিকেই তাকাও সবুজ আর সবুজ। চারিদিকে মেঘ রয়েছে ঘিরে। মাঝারি ধরনের বর্ষণ চলছেই। গাছের পাতা থেকে টপটপ করে জল ঝরে পড়ছে। নদীনালা সব ভরে গেছে, ময়ুর নাচছে, কোকিল কুহু-কুহু ডাকছে। কথাবার্তা বলতে বলতে আমরা পুকুর-ধারে গিয়ে পৌঁছলাম। বাগানবাড়িতে ফরাস বিছিয়ে ফেলা হলো। উনোন ধরিয়ে কড়াই চাপানো হলো, তাতে আমরা পুরি ভাজতে শুরু করলাম। নবাব ছব্বন সাহেব বর্ষাতি পরে শিকারে বেরিয়ে পড়লেন। গৌহর মির্জা ঝুড়িতে আম পেড়ে নিয়ে এল। এই অবসরে চাকর-বাকর রাস্তার পাশে বাগানে তাঁবু খাটিয়ে ফেলল। গাঁ থেকে ওরা খাটিয়া নিয়ে এল। এখানে ছিল আরো মজা। আম টুপটাপ করে পড়ছিল আর এক-একটি আমের পিছনে হুমড়ি খেয়ে পড়ছিল চার-চার জন লোক। কেউ কেউ সাঁতার কেটে জল ছেটাতে লাগল, কেউ কেউ এধার-ওধার দৌড়োদৌড়ি শুরু করল, কেউ কেউ বা নিজেদের মধ্যে কুস্তিতে মেতে গেল। এর মধ্যে যদি কেউ পড়ে যায় তো কাদায় গড়াগড়ি। কিছুক্ষণ বৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে থাকলে যেমন পরিষ্কার ছিল তেমনি হয়ে গেল। বেগাজানের মতো সে খুব সাবধানী সে তাঁবুর মধ্যে বসে রইল। বিসমিল্লা তার পেছন দিক থেকে গিয়ে মুখে আমের রস মাখিয়ে দিল। সে উঠল চিৎকার করে আর অন্য সবাই খিল খিল করে হাসতে থাকল। সে একটি দেখার মতো তামাশা।

কোথা থেকে জানিনে তিনটি জিপসি মেয়ে এসে গেল। ওদের নাচ গান শুরু হয়ে গেল। ওদের সাথে ঢোলকীরা খুব ঢোলক বাজাতে থাকল। ওদের নাচ গান তো আর আমাদের মতো লোকের ভালো লাগার কথা নয়। তবে ঐ সময়ে আর ঐ জায়গায় এটি মন্দ লাগেনি। বেলা প্রায় ঘণ্টা দুয়েক থাকতে আমার বরাত-জোরে আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেল। রোদ উঠল, আমরা আগের থেকে

ভেবেচিন্তেই কাপড়-চোপড় এক জোড়া করে নিয়ে এসেছিলাম, সবাই কাপড় বদলে জঙ্গলের দিকে বেড়াতে বেরলাম।

আমিও একদিকে একা বেরিয়ে পড়লাম। সামনে ঘন জঙ্গল। সূর্য সেই জঙ্গলের আড়ালেই ঢলে পড়তে থাকল। সবুজ রং-এর উপর সোনালি কিরণ এক অপরূপ দৃশ্য সৃষ্টি করেছিল। এখানে সেখানে জংলীফুল ফুটে রয়েছে। সবুজ মাঠের সন্ধানে পাখিরা উড়ছে। সামনের ঝিলের জলে সূর্যের কিরণে যেন গলা সোনা ঝিকমিক করছিল। গাছের পাতায় আড়াল থেকে সূর্যের কিরণ দেখতে সুন্দর লাগল। আকাশে সূর্যের লাল রং ছড়িয়ে পড়েছে আর সময়টি এমন ছিল না যে আমার মতো খেয়ালী মেয়ে তাঁবুতে গিয়ে বসে থাকবে। এই অপরূপ দৃশ্য দেখতে দেখতে কতদূর অবধি যে গিয়েছিলাম তা খোদাই জানেন। হঠাৎ একটি কাঁচা রাস্তা পাওয়া গেল। এই রাস্তা ধরেই যাচ্ছিল কিছু গাঁয়ের লোক। তাদের কারও-বা কাঁধে হাল, কেউ-বা চলেছে বলদ হাঁকিয়ে। একটি ছোট্ট মেয়ে গাই-মহিষ নিয়ে যাচ্ছে, আর অনেক ভেড়া ও ছাগলের পেছনে ছিল একটি ছেলে। এইসব দৃশ্য চোখের সামনে এল আর দৃষ্টিপথ থেকে সরে গেল। আমি আবার একাকী হয়ে পড়লাম। কী চিন্তায় যে ডুবেছিলাম, জানিনে। এখন কিন্তু আমি রাস্তা দিয়ে চলতে শুরু করেছি। ভাবছি এই পথে পুকুরের দিকে যেতে পারব। মেঘ আবার ঘনিয়ে আসছে। সূর্য প্রায় অস্তমিত। আমি দ্রুতপায়ে এগিয়ে যেতে থাকলাম। এগিয়ে যেতেই মিলল একটি ফকিরের ডেরা। এখানে কিছু লোক বসে হুঁকো টানছে। আমি তাদের পুকুর-ধারে যাবার রাস্তার কথা জিজ্ঞেস করলাম। আমার মনে হচ্ছিল যেন লখনৌ যাওয়ার সড়ক ধরে আমি চলেছি। পুকুরের রাস্তা ডাইনে ছেড়ে এসেছি। এখানে আমাকে সড়ক ছেড়ে দিতে হলো। বনপথ দিয়ে এসে একটি রাস্তায় উঠলাম। কিছু দূরে পড়ল একটি নালা। নালাটির ওপারে কিছু দূরে দেখা গেল দু-তিনটে গাছ। আমি দেখি কি, ঐ গাছ-গুলির থেকে কিছু দূরে ময়লা ধুতি আর জামা পরে কোমরে ময়লা একখানি চাদর বেঁধে একজন লোক কোদাল দিয়ে মাটি খুঁড়ছে। আমাদের চোখাচোখি হতেই প্রথমে একটু সন্দেহ হলো। পরে ভালো করে দেখতেই পুরো বিশ্বাস হয়ে গেল, এ সেই-ই বটে। চোখ ফিরিয়ে নিতে চাইলাম, কিন্তু বদমাশ দৃষ্টিটি যেন ওদিকেই আটকে গেল। এবার একদম বিশ্বাস হলো। মনে হলো যেন জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যাব, আর পড়েই যেতাম। এমনি সময়ে দূর থেকে আকবর আলি খাঁর চাকর সালার বখশের ডাক কানে এল। সে আমাকে খুঁজতে বেরিয়েছিল। আমাকে আসতে দেখে দিলবর খাঁ নিড়েনটি রেখে দিয়েছিল। আর আমি ওকে যেমনি দেখছিলাম সেও তেমনি আমাকে দেখছিল, কিন্তু মনে হয় সে আমাকে চিনতে পারেনি। আমি কিন্তু ওকে বেশ ভালো করেই চিনেছিলাম।

সালার বখশের ডাক শুনে সে নালার দিকে পালিয়ে গেল। এরই মধ্যে

সালার বখশ আমার কাছে এল। ভয়ে আমি থরথর করে কাঁপছিলাম। মুখ থেকে শব্দ বেরয়নি। বাকরোধ হয়ে গেল। সালার বখশ আমার এই অবস্থা দেখে বলল, হায়, ভয় পেয়ে গেলেন? আমি ইশারায় তাকে গাছের তলার দিকে দেখিয়ে দিলাম। সে সেদিকে দেখতে থাকল।

সালার বখশ: ওখানে কি একটা গর্ত আর একটি কোদাল পড়ে আছে? আহা, এতেই ভয় পেয়ে গেলেন। আপনি বুঝে যান যে, কেউ সেখানে কবর খুঁড়ছিল। সে গেলই-বা কোথায়?

মুখ থেকে তো কথা বেরল না। হাত দিয়ে দেখিয়ে ইশারায় জানালাম নালার দিকে।

সালার বখশ: হয়ত-বা ফকিরের ডেরায় তামাক খেতে গেছে। বেশ, এখন চলুন, নবাব ছব্বন সাহেব অনেক মুরগী শিকার করে ফিরেছেন। আপনার কোনো পাত্তা নেই। মিঞা সাহেব ওদিকে খুঁজতে গেছেন আর আমি এলাম এদিকে। আপনাকে পেলাম তাই, নইলে আপনি রাস্তা খুঁজে পেতেন না।

আমি হাঁ, না, কিছুই বলিনি। শেষে সালার বখশও চুপ করে গেল। কিছুক্ষণ বাদে একটি মাঠ পার হয়ে পুকুর-ধারে পৌঁছে গেলাম।

রাতে এখানেই থাকা সাব্যস্ত হলো। খাওয়াদাওয়ার পাট চুকলে আমি আকবর আলি খাঁকে সব ঘটনা খুলে বললাম।

আকবর আলি: তুমি ভালো করে দেখেছ তো? এই-ই সেই দিলবর খাঁ? ফৈজাবাদ থাকে? এর নামে তো হুলিয়া, গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারি রয়েছে। আফসোস হচ্ছে, প্রথমেই তুমি একথা বলনি বলে। গিয়ে বদমাশটিকে গ্রেপ্তার করে আনতাম। খুব খ্যাতি হত। সরকার থেকে পুরস্কার পেতাম; এক হাজার টাকা! সে খুঁড়ছিল কী?

আমি: কি জানি, মুখপোড়া কি নিজের কবর খুঁড়ছে?

আকবর আলি: এর নাম শুনেই তোমার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। ও এখন তোমার কী করতে পারে?

আমি: (মন একটু শান্ত করে) নিশ্চয়ই সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে ওখানে কিছু সে পুঁতে রেখেছিল, তাই খুঁড়ে বের করে নিতে এসেছিল।

আকবর আলি: চল গিয়ে দেখি।

আমি: আমি তো যাচ্ছি না।

আকবর আলি: আমি যাচ্ছিই, সালার বখশকেও নিয়ে যাচ্ছি।

আমি: কোথায় যাবে? এখন ওখানে যাওয়া হয়ত নিরর্থক, ও হয়ত সব খুঁড়ে নিয়েও গেছে।

আকবর আলি: আমি অবশ্যই যাব।

একথা সে একটু জোরেই বলল। পাশে ছিল নবাব ছব্বন সাহেবের তাঁবু।

তিনি আর বিসমিল্লা দুজনেই জেগে ছিলেন।

নবাব : খান সাহেব, থাকেন কোথায় ?

আকবর আলি : নবাব সাহেব আপনি এখনো ঘুমোননি ?

নবাব : জি, না।

আকবর আলি : আমি আসছি।

নবাব : আসুন।

আকবর আলি খাঁ আর আমি দুজনেই নবাবের তাঁবুতে গিয়ে সব ব্যাপার বললাম।

নবাব : (আমাকে) আর তুমি এই বদমায়েশটাকে জানলে কেমন করে ?

আমি : (আনুপূর্বিক ঘটনা আর ওকে কী বলব) আমি জানি আর বেশ ভালো করেই জানি. আমিও ফৈজাবাদের মেয়ে।

নবাব : আপনিও ফৈজাবাদের মেয়ে ?

আকবর আলি : কিন্তু ঐ লোকটির ব্যবস্থা তো কিছু একটা করতে হবে! আমি বলছি ও গ্রেপ্তার হলে আশ্চর্য হওয়ার কিছু থাকবে না।

এই বলে তিনি সালার বখশকে ডাকলেন আর কাগজ কলম আনিয়ে নিলেন। পুলিসের থানা ছিল কাছেই। দারোগা সাহেবকে একটি চিরকুট লিখে দিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই দারোগা সাহেব দশ-বার জন সিপাই নিয়ে হাজির হলেন। আমি যা দেখেছিলাম ওঁদের তা সবই বললাম। দারোগা সাহেব গাঁয়ের লোকের সহায়তা নিলেন। প্রথমেই সেই জায়গাটিতে গিয়ে খোঁজা শুরু করলেন। ফকিরের ডেরায় কিছু সন্ধান মিলল, আর একটি সিপাই ওই জায়গা থেকে নবাবী আমলের একটি স্বর্ণমুদ্রা কুড়িয়ে পেয়ে থানার বড়বাবুর কাছে জমা দিল।

দারোগাবাবু : খোদার কৃপায় মাল সমেত গ্রেপ্তার হয়ে যাবে।

দারোগাবাবু পাকা বন্দোবস্ত করে ফেললেন আর সিপাইরাও সোৎসাহে কাজ করে গেল। শেষে রাত তিনটের সময় মক্কাগঞ্জে দিলবর খাঁ ধরা পড়ল। ভোর হতে-না হতেই পুকুর পারে পৌঁছে গেল। তল্লাশিতে তার কাছ থেকে চব্বিশটি স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া গেল আমাকে শনাক্ত করার জন্য ডাকা হলো। আমি ছাড়া দুটি সিপাইও তাকে চিনতে পারল। বেলা দশটায় সময় সে লখনৌ-এ চালান হয়ে গেল।

রুশোয়া : আচ্ছা, তা বিচারে তার কী হলো, তাড়াতাড়ি সে কথাটি শেষ কর।

আমি : হলো কী ? মাস দুয়েক বাদে শুনলাম, তার ফাঁসি হয়ে গেছে, মারা গেছে।

কোথায় মাধুর্য এর সে কথাটি বলোনা আমায়।
আমার এ জীবনের কথা আমি পাই এ লেখায়।।

মির্জা রুশোয়া সাহেব, আপনি যখন আমার এ জীবনকাহিনীর খসড়াটি পর্যালোচনা করার জন্য আমাকে দেন, আমার এমন রাগ হয়েছিল যে এটি ছিঁড়ে ফেলি। বার বার মনে হয়েছে, আমার এ ঘৃণ্য জীবনের মরণের পরও আর কী বাকি থাকবে যাতে লোকে এ কাহিনী পড়ে আমাকে ধিক্কার না দেবে? কিন্তু উপেক্ষার ভাব আর আপনার শ্রমের কথা ভেবেই নিরস্ত হলাম

কাল রাত প্রায় বারটার সময় শুয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ চোখ খুলে গেল। আমি যথারীতি আমার কামরায় একাই ছিলাম। দাস-দাসীরা নীচের ঘরে শুয়ে। আমার শিয়রে দীপটি ছিল জ্বালানো। প্রথম তো অনেক্ষণ এ-পাশ ও-পাশ করলাম যাতে ঘুম আসে। কিন্তু এল না। শেষে উঠে বসলাম। পান সেজে দাসীকে ডাকলাম। তামাক সাজিয়ে নিলাম, আবার খাটের উপর শুয়ে পড়ে হুঁকো টানতে লাগলাম। মনে হলো কোনো বই দেখি। শিয়রে আলমারিতে অনেক গল্প-উপন্যাসের বই রাখা ছিল। একেকখানি বইয়ের পাতা উল্টে-পাল্টে দেখি যেসব বই অনেকবার পড়া হয়ে গেছে। ওতে আর মন বসল না। বইগুলি বন্ধ করে রেখে দিলাম। শেষে এই খসড়াটির উপর হাত পড়ল। এটি ছিঁড়ে ফেলতেই কৃতসঙ্কল্প হলাম। ছিঁড়েই ফেলতে চাই এমনি সময়ে মনে হলো কে যেন কানে কানে বলছে, ধর তুমি এটি ছিঁড়েই ফেললে, পুড়িয়ে দিলে, কিন্তু তাতে কী লাভ হলো? ন্যায়পরায়ণ ও শক্তিমান খোদার আদেশে ফরিস্তা যে সমগ্র জীবনকথা বিশদ ব্যাখ্যা ও উদাহরণ দিয়ে লিখেছেন তাকে নষ্ট করে কে!

এই দৈববাণীতে আমার হাত পা কাঁপতে থাকল, যেন খসড়টি হাত থেকে পড়ে যাবে। কিন্তু এই অবস্থাটি সামলে নিলাম। খসড়াটি ছিঁড়ে ফেলার ইচ্ছেটা মন থেকে একদম দূর হয়ে গেল। যেখানে এটি ছিল, ভাবলাম সেখানেই রাখি, কিন্তু আরেকবার এই খসড়াটি কিছু না ভেবেই পড়তে শুরু করে দিলাম। প্রথম পাতাটি শেষ হওয়ার পর দ্বিতীয় পাতার কয়েকটি লাইন পড়লাম। এবার আমার জীবনটি আমার কাছে এত চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠল যে ভাবলাম যেমন পড়ছি তেমনি পড়ে চলি। আর গল্প পড়ার এমন মজা আমার আর কখনো লাগেনি কেননা, আমার মনে হচ্ছিল এসব মস্তিষ্ক-সঞ্জাত কল্পনা, বাস্তব ঘটনা নয়। কেননা রূঢ় বাস্তব কাহিনীকে উপভোগ্য করে না।

আমার জীবন-কথায় আপনি যা লিখছেন সে সবই আমার জীবনে ঘটেছে। সেসব সময় আর সেসব গান আমার চোখের সামনে ভাসছে। আর তার নানান ধরনের প্রভাব আমার মনের উপর পড়ছিল। যদি কেউ আমার সে সময়ের অবস্থাটি দেখত তাহলে আমাকে নিঃসন্দেহে পাগল ভাবত। কখনো-বা আমার বাঁধভাঙা হাসি আবার কখনো-বা টপ-টপ করে ঝরে পড়া অশ্রু। সংক্ষেপে কথাটি হচ্ছে এই যে, বর্ণনাটি অপূর্ব। আপনি চেয়েছিলেন আমি যেন প্রয়োজনবোধে সংশোধন করি। কিন্তু তার খেয়ালই ছিল না। পড়তে পড়তেই রাত শেষ।

তারপর প্রার্থনার আগে হাত-মুখ ধুয়ে, নমাজ পড়ে আবার কিছুক্ষণ শুয়ে রইলাম। সকালে প্রায় আটটায় চোখ মেলি, তারপর হাত-মুখ ধুয়ে পড়তে বসি। শেষে সন্ধ্যে হতেই খসড়াটি পড়ে শেষ করি।

সমগ্র কাহিনীটির যেখানে আপনি সৎ স্ত্রীলোক আর বদ মেয়েমানুষের পার্থক্যের বিষয়ে বক্তৃতা দিয়েছেন, সেটি আমার খুবই মনোগ্রাহী হয়েছে। সৎ স্ত্রীলোকের যে অহমিকা তাতে আনন্দ আর আমার মতো বাজারি মেয়ের যে অহমিকা তাতে খুবই ঘৃণা হওয়া দরকার। কিন্তু এই কথায় ভাগ্য ও সুযোগ-সুবিধারও বেশ একটি অংশ রয়েছে। আমার নষ্ট হওয়ার কারণই ছিল ওই দিলবর খাঁর শয়তানী। যদি ও আমাকে চুরি করে না নিয়ে যেত আর খানুমের কাছে যদি বিক্রি না করত তাহলে আমার ভাগ্যের লিখন পুরো হয় কী করে?

যেসব অপকর্ম সম্বন্ধে এখন আমার কোনো সন্দেহই নেই আর যে জন্য আমি ক্লান্ত আর অনুতপ্ত সে সময়ে আমার সেসব বিষয়ের আসল রূপটি বোঝার কোনো ক্ষমতাই ছিল না। আমি যেন ওই সব অপকর্ম থেকে বিরত থাকি আর না বিরত হলে শাস্তি পাব এরকম কোনো আইনের কথাও কেউ আমাকে শোনায়-নি। আমি খানুমকে আমার প্রভু ও বিচারক বলে বিবেচনা করতাম। ওঁর ইচ্ছের বিরুদ্ধে কোনো কাজই করতাম না আর করলেও তাঁর মার ও অত্যাচার এড়িয়ে চুপ চুপি করতাম। খানুম অবশ্য জীবনভর আমাকে সামান্য মারও দেননি কিন্তু আমার ছিল সে বিষয়ে ভয়ানক ভয়। যেসব মানুষের মধ্যে আমি প্রতিপালিত হয়েছি আর তাদের যে কায়দা-কানুন সেসব ছিল আমারও। এ সময়ে আমি কখনো কোনো ধর্মীয় নীতির কথা ভাবিনি আমার বিবেচনায় এরকম অবস্থায় তা কেউ করতও না।

পার্থিব ও আকস্মিক দুর্ঘটনাগুলি ঘটার কোনো বাঁধা-ধরা সময় নেই, কিন্তু সেগুলি ঘটলে মন এক ধরনের ভয়ে সমাচ্ছন্ন হয়ে যায়, যেমন প্রচণ্ড মেঘগর্জন, বিদ্যুৎ চমক, ঝড়-ঝঞ্ঝা বয়ে যাওয়া, বাজ পড়া বা ভূমিকম্প হওয়া, সূর্য অথবা চন্দ্রগ্রহণ, দুর্ভিক্ষ মড়ক-মহামারি ইত্যাদি। সব সময়েই আমি এই সব ঘটনা-গুলিকে খোদার ক্রোধের নমুনা হিসেবে ভাবতাম। কিন্তু এ-ও দেখেছি যে, মানুষের কিছু কিছু কাজের ফলে সেসব মিটে গেছে। আবার এটিও দেখেছি, অনেক আপদ-বিপদ খোদার কৃপা, তাবিজ, টোটকা কোনো কিছুতেই ফল হয়নি। এসব ঘটনাগুলিকে মানুষ খোদার মর্জির ফল ইত্যাদি বলে বোঝাত। ধর্মীয় আদেশ-নির্দেশগুলি আমার কাছে স্পষ্ট ছিল না, না কেউ আমাকে ধর্মাধর্মের পুরস্কার-তিরস্কারের ব্যাপারটি বুঝিয়ে দিয়েছে। এরই জন্যে এসব কথার কোনো প্রভাব আমার উপর পড়েনি। নিঃসন্দেহে সেসব দিনগুলিতে আমার কোনো ধর্ম ছিল না। স্রেফ অন্যদের যা করতে দেখতাম আমিও তাই করতাম। ভাগ্যের উপর ছিল খুবই আস্থা। যে কাজ আমি অনায়াসে করতে

পারিনি বা আমার নির্বুদ্ধিতায় খারাপ হয়েছে সেগুলি আমি ভাগ্যের উপর ছেড়ে দিতাম। ফারসি বইপত্তর পড়ার ফলে ভাগ্যের উপর দোষ দেওয়ার অভ্যেসটি আমার আয়ত্তে এসে যায়। আমার কোনো অভিসন্ধি বিফল হলে বা অন্য কোনো কারণে আমার দুঃখ হলে স্থানে-অস্থানে আমি ভাগ্যের উপর দোষারোপ করতাম।

আমারও ক্ষমতা আছে কিন্তু মাত্র
এতটুকু সীমা হলো তারি
বিপাকে কখনো যদি পড়ে যাই তবে
ভাগ্যকে গালি দিতে পারি।

মৌলবী সাহেব, হুসেনি পিসি ও অন্যান্য বুড়োবুড়িরা যখন কথাবার্তা বলতেন তখন মনে হত আগের কালটি কতই-না ভালো ছিল, আর এদের দেখে আমিও বিনা চিন্তা, বিনা যুক্তিতে বর্তমানকেই দোষ দিতাম। হতভাগিনী আমি এই কথাটা বুঝতে পারিনি যে নিজেদের যৌবনের দিনগুলি সবারই ভালো লাগে আর সেই জন্যই দুনিয়াটাও তাদের কাছে ভালো হয়।

নিজে বাঁচলে দুনিয়া বাঁচে আর নিজে মরলে দুনিয়া বরবাদ। বৃদ্ধ বয়সীদের দেখাদেখি যুবারাও এটি রপ্ত করে নিয়েছে, ফলে এই ত্রুটিতে লোক হরদম অভ্যস্ত হয়ে পড়ছে। যৌবনে আমিও আরাম ও আয়েশে প্রলুব্ধ হয়ে পড়ি, এ সময়ে গেয়ে বাজিয়ে পুরুষমানুষকে আকৃষ্ট করাটাই ছিল আমার নিজস্ব পেশা। সমপেশার মেয়েদের সাথে প্রতিযোগিতায় আমার কৃতকার্যতা বা অকৃতকার্যতাই আমার সুখ বা দুঃখের কারণ হত। আমার চেহারা ভালো ছিল না, কিন্তু গানে ও কাব্যচর্চায় আর কবিতা লেখায় সাফল্য লাভ করায় আমি ওদের সবারই উপরে চড়ে বসেছিলাম। আমার সমবয়সীদের মধ্যে আমার নিজের একধরনের বাছ-বিচার ছিল। তাতে ভালোও যেমন হয়েছে, মন্দও হয়েছে। মন্দ হলো এই যে আমার নাম যশ বৃদ্ধির সাথে সাথে একটি অহং ভাবও তৈরি হতে থাকল। যেখানে অন্য রূপোপজীবীনীরা বিলকুল নিজেদের কাজ উদ্ধার করে নিতে পারত আমি সেখানে জবাবের আশায় লোকের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতাম। প্রতিটি লোকের কাছে কোনো-না কোনো কিছুর ফরমাশ করে বসাটা ছিল ওদের সকলেরই একটা কৌশল। এতে আমার লজ্জা হত এই কারণে যে যদি তারা অস্বীকার করে বসে তো আমার অপমান হবে। আর প্রতিটি লোকের কাছেই আমি খুব শিগগির সহজ হয়ে উঠতাম না। আমাদের এই ব্যবসায়ে অন্যরা কেউ এলেই চিন্তা করত যে লোকটি কত দিতে পারে আর তারা কত নিতে পারে। আর আমার অধিকাংশ সময় ব্যয় হত লোকটির পটভূমি আর তার কোন্ বিষয়ে আগ্রহ তার বিচার-বিবেচনায়।

ভিক্ষে চাওয়া আমি খারাপ বলে ভাবতে লাগলাম। এ ছাড়াও অন্যান্য

ব্যাপারেও আমি বেশ্যাপনা করতে পারতাম না। এই জন্য বাঈজিদের মধ্যে ওরা আমাকে কিছুটা উন্নাসিক, আত্মকেন্দ্রিক ও মেজাজী বলে মনে করত, আমি কিন্তু চলতাম নিজের মতো, কারো কথা শুনে নয়।

এরপর এমন একটি সময় এল যখন এই বেশ্যাবৃত্তিকে একটি পাপ ব্যবসায় মনে করে এটি ছেড়ে দিলাম। যার তার সাথে মেলামেশা করা ছেড়ে দিয়ে শুধুমাত্র মুজরো গানের উপরই জোর দিলাম। কোনো ধনী বাঁধা মাইনেয় রাখলে থাকতাম, কিন্তু আস্তে আস্তে তাও ছেড়ে দিলাম।

যেসব কাজ আমি খারাপ বিবেচনা করেছি সেগুলি ত্যাগ করার পর প্রায়ই মনে হয় যে, কোনো পুরুষমানুষের ঘর করি, কিন্তু আবার এটি মনে হয় যে লোক বলবে, বেশ্যা ছিল এখন নিজের কফন দিয়ে পায়জামা বানিয়েছে। মির্জা সাহেব, আপনি নিশ্চয়ই এই বাগধারাটি বুঝতে পারেননি। কথাটির অর্থ হচ্ছে এই যে, এই বেশ্যাটি বৃদ্ধা হয়ে গেলে কারো সংসারে যদি ঢোকে তাহলে চালাক বদবুদ্ধির লোক বলে যে, বেশ্যাটি মড়ার কাপড় দিয়ে পায়জামা বানিয়েছে। অর্থাৎ, মরার সময়ে ও নিজের শবাচ্ছাদনটির ব্যবস্থা করে মরছে যেন তার পয়সা খরচ না হয়। এই উদাহরণ দিয়ে বেশ্যাদের মতলববাজ লোভী আর জলিয়াতির সাক্ষ্য পাওয়া যায়। আমাদের মতো লোক যে এই রকমই হয় সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। যদি মেনে নেন যে আমি সত্যিসত্যিই এইসব পাপ কাজ ত্যাগ করেছি, খুব ভালো হয়ে গেছি, কিন্তু খোদা ছাড়া সেকথা আর জানবে কে? আমার এই সৎ হওয়াটা কেউই বিশ্বাস করবে না। আবার এই অবস্থায় যদি আমি কাউকে ভালবাসি আর সেই ভালবাসাটি যদি নির্দোষ আর সদুদ্দেশ্যমূলকও হয়, তবে যাকে ভালবাসব সে আর সে ছাড়া অন্য যে কেউ দেখবে বা শুনবে তারা কখনই এটি বিশ্বাস করবে না। কাজেই আমার ভালবাসাও নিরর্থক হয়ে পড়বে। লোকে ভাবে আমার টাকা-পয়সা আছে। এই জন্যই আমার এই বয়সেও লোক আমাকে চায়, আর এই জন্য নানারকম ফন্দি আঁটে। কোনো সাহেব আমার সৌন্দর্য আর যৌবনের প্রশংসা করেন, যদিও তারা আমার চেয়েও সুন্দরী স্ত্রীলোকদের সংসর্গ করেন। কোনো সাহেব আবার আমার গানের বড়ই ভক্ত, যদিও তাঁর তাল বা মাত্রার কোনো জ্ঞান নেই। কোনো সাহেব আবার আমার কবিতায় আসক্ত, নিজে কিন্তু কবিতা লেখা তো দূরে থাক একটি লাইনও ঠিক বলতে পারেন না। কোনো কোনো সাহেব আবার নিজেরা লেখাপড়া ভালো জানা সত্ত্বেও আমাকে একজন ধর্মশাস্ত্রজ্ঞ বলে মনে করেন, আর নিতান্ত সাধারণ উপবাসের নিয়ম ও নমাজ সম্বন্ধেও আমার উপদেশ চান যেন তাঁরা বশংবদ শিষ্য। কেউ-বা আবার আমার গুণবাণী বা টাকা-পয়সার দিকে নজর দেন না, নজর দেন আমার স্বাস্থ্যের দিকে। প্রতিটি কথায় তাঁরা বলেন, আল্লা, তাই হোক। আমার হাঁচি হলে

তাঁদের মাথাব্যথা করে, আমার মাথাব্যথা হলে ওদের শত্রুদের দম বন্ধ হতে থাকে। অন্যে আবার উদার সেজে আমাকে ছেলেমানুষ ভেবে উপদেশ-নির্দেশ দেন। এমনভাবে কথাবার্তা বলেন যেন আমি দশ বার বছরের একটি নাবালিকা।

আমি একটি অভিজ্ঞতাসম্পন্না স্ত্রীলোক, অনেক ঘাটের জল খেয়েছি। যে যেভাবে আমাকে তৈরি করতে চেয়েছেন তেমনিভাবে তৈরি হয়েছি। আর প্রকৃতপক্ষে আমিই তাঁদের গড়ে-পিটে তুলেছি। আমার খাঁটি বন্ধু আছেন জনা-কয়েক, যাঁরা সংস্কৃতিমান আর কবিতা, সাহিত্য ও গানের অনুরাগী। তাঁরা এক সুন্দর কথোপকথন ছাড়া আমার কাছে আর কিছুই চান না, আর আমিও চাইনে। এ রকম লোকগুলিকে আমি অন্তর দিয়ে চাই আর ধীরে ধীরে এমনিধারা একটি নিঃস্বার্থ সম্পর্ক গড়ে ওঠে যে এঁদের ছাড়া আমি ব্যাকুল হয়ে পড়ি আর তাঁরাও হন তাই। কিন্তু এঁদের মধ্যে কেউই আমাকে তাঁদের ঘরনী করায় ইচ্ছুক ছিলেন না। হায়! এমনটিই হয়। কিন্তু এ আশাটি এমনই যে কেউ যদি আশা করে, তার আবার যৌবন ফিরে আসুক—এতে কোনো সন্দেহ নেই যে স্ত্রীলোকের জীবন তাদের যৌবন অবধি, যৌবন ফুরিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে যদি জীবনও চলে যেত তবে এমনটি হত না—তা কিন্তু হবার নয়। একেই তো বার্ধক্য সকলের পক্ষেই খারাপ, বিশেষ করে স্ত্রীলোকের বেলায়। বিশেষত বেশ্যাদের পক্ষে বার্ধক্য নরকের নমুনা।

লখনৌ-এর গলি-ঘুঁজিতে যেসব বৃদ্ধ ভিখারিনীদের দেখা পান খোঁজ করলে দেখতে পাবেন তাদের বেশিরভাগই বেশ্যা। কোন্ ধরনের বেশ্যা, না যারা পায়ের নীচে মাটি রাখেননি। শেষ বিচারের দিনটি পায়ের নীচে রেখেছে, এরা হাজার হাজার গৃহস্থের ভরা-সংসার ভাসিয়ে দিয়েছে, শত শত নিষ্পাপ যুবকের প্রাণ হরণ করেছে। এরা যেখানে যেত লোক চোখ মেলে চেয়ে থাকত, আর এখন কেউ এদের দিকে তাকায় না। আগে যেখানে গিয়ে বসত, লোক ভয়ানক উৎফুল্ল হয়ে উঠত, আর এখন সম্মান দেখাতে কেউ নেই। আগে না চাইতেই মিলত মোতি, আর এখন চাইলে ভিক্ষেও মেলে না। এদের প্রায় সকলেই নিজের ধ্বংসের কারণ নিজেই হয়েছে। এক বুড়ি বিবি আমার ঘরে মাঝে মাঝে আসতেন। এক সময়ে ইনি বেশ উঁচুদরের বেশ্যাদের একজন ছিলেন। যৌবনে ইনি হাজার হাজার টাকা কামিয়েছেন আর এঁর মনটিও ছিল আমুদে। এঁর বয়স হয়ে গেলে সেই রোজগার দিয়েই বন্ধুদের খাওয়াতে শুরু করেন। বৃদ্ধ বয়সে একটি নবীন যুবকের ঘরে গিয়ে উঠলেন। একে তো ওর কম বয়স, দেখতে সুশ্রী, এঁকে ও কেন ভালবাসবে? প্রথমে তো বিবি একটু বিগড়ে গিয়েছিল, পরে মিঞা যখন আসল মতলবটি বিবিকে বুঝিয়ে দিলেন তখন সে চুপ করে গেল। এঁর খাতির-যত্ন হতে লাগল। যতদিন টাকাকড়ি ছিল মিঞা বিবি

দুজনেরই ফুসলে খাওয়া চলল। শেষে ইনি গরিব হয়ে পড়লে আর কে মানে! একে বের করে দিল, এখন গলির মধ্যে ইনি ভিক্ষে করে খাচ্ছেন।

কোনো কোনো বুদ্ধিহীনা বেশ্যা আবার কারো মেয়েকে নিয়ে লালন-পালন করে, তাকে ভালবাসে। (অবশ্য এই বোকামিতে ধরা পড়ি আমিও।) কিন্তু সে যুবতী হয়ে গেলে স্রেফ কারো সাথে হয়ত-বা পালিয়ে গেল, নয়ত থাকে যদি তো আস্তে আস্তে সব টাকাকড়ি হাতিয়ে নিয়ে এঁকে বাড়ির তদারকি করার জন্য রেখে দিল।

আবাদীও হয়ত আমাকে হুল বিঁধিয়ে দিতে ছাড়ত না। কিন্তু তার বদ স্বভাবটি প্রথমেই প্রকাশ পেয়ে যায়। নচেৎ সে হয়ত আমাকে লুট করে নিয়ে যেত। কি মরদ আর কি মেয়েমানুষ, বেশ্যাজাতের জীবনের বনিয়াদই এমন যে একের সাথে অন্যের ভালবাসা হতেই পারে না। আর না কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তি তাকে মন সঁপে দিতে পারে, কেননা লোকে জানে যে বেশ্যা কারো নয়, আর কোনো স্ত্রীলোকই এরকম ভালবাসতে পারে না। নাচিয়েরা ভাবে যে রোজগার তো সে-ই করে, বাড়িওলিকে সে দেবে কেন?

কোনো বেশ্যার চেহারা খারাপ হতে থাকলে তার গুণগ্রাহীদের উৎসাহে ভাটা পড়তে থাকে। আবার এদিকে এর ছোটখাট খোশামোদ শুনতে শুনতে এমনই অভ্যেস হয়ে যায় যে পরে যদি আর কেউ সে রকম না করে তবে ভীষণ চটে যায়। তখন পুরুষমানুষও আস্তে আস্তে উদাসীন হয়ে যেতে থাকে আর সেও সব পুরুষমানুষকেই দোষারোপ করে।

প্রথম প্রথম আমিও অন্যান্য বাঈজিদের কাছ থেকে পুরুষমানুষের বিশ্বাস-ঘাতকতার কথা শুনে কিছু না বুঝেই ওদের তালে তাল দিতাম। গৌহর মির্জা আমার সাথে যে ব্যবহার করেছে আর নবাব সাহেবটি আমি যে তাঁকে বিয়ে করেছি বলে অপবাদ রটিয়েছিলেন, সে সবই আপনি শুনেছেন। কিন্তু তবুও আমি বলব যে পুরুষমানুষকে বিশ্বাসঘাতক বলতে পারিনে।

স্ত্রীলোকও কিছু কম বিশ্বাসঘাতিনী নয়, বিশেষত বাজারি স্ত্রীলোক। ভালবাসার ব্যাপারে (মাফ করবেন) পুরুষ হয় হামেশাই বেকুব আর স্ত্রীলোক চালাক। প্রায়শ পুরুষমানুষ খাঁটি ভালবাসাই দেখায় আর স্ত্রীলোক হামেশাই দেখায় মেকী ভালবাসা। এর কারণ এই যে পুরুষমানুষ যে অবস্থায় ভালবাসা জানায় সে অবস্থাটি তাকে ক্ষিপ্ত করে তোলে আর স্ত্রীলোক অত তাড়াতাড়ি প্রেমে মজে না। কেননা, পুরুষমানুষ চট করে মেয়েমানুষের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে তার জন্য পাগল হয়ে পড়ে আর স্ত্রীলোক এ ব্যাপারে অনেক সতর্ক হয়ে পড়ে। এই জন্যই পুরুষের প্রেম খুব তাড়াতাড়ি ছুটে যায় আর স্ত্রীলোকের ভালবাসা টিকে থাকে। কিন্তু একসঙ্গে বসবাস করার মধ্য দিয়ে এঁদের জীবনে এক ধরনের সমতা আসতে পারে এই শর্তে যে এদের একজনকে অন্তত বোধশক্তি রাখতে

হবে। আসলে পুরুষ সহজেই বিশ্বাস করে বসে আর মেয়েদের বিশ্বাসটি কার্যকরী হয় খুব ধীরে ধীরে। আমার বিবেচনায় বিশ্বাসের এই কমতিটি সঠিক। কেননা স্ত্রীলোক দুর্বল চিত্ত। তাই তার কয়েকটি গুণ আবার এমন আছে যাতে এই কমতিটি পূরণ হয়ে যায়। সামগ্রিকভাবে বিচার করলে এটিকে অনেক গুণাগুণের একটি বলা যায়, এমনকি আমি বলতে পারি এইটিই একমাত্র গুণ। জানোয়ারদের মধ্যেও এর উদাহরণ মেলে। দুর্বল জানোয়ারদেরও এই কৌশলটি প্রশংসার যোগ্য।

পুরুষমানুষ হরদম বলেন যে স্ত্রীলোক সুন্দরী। আমি কিন্তু এই মতটি মানিনে। আসলে স্ত্রী কিংবা পুরুষ কেউই নিজে নিজেই রূপে সুন্দর নয়। প্রত্যেকেরই এমন একটি সৌন্দর্য আছে যা অন্যের ভালো লাগতে পারে। যেসব স্ত্রী-পুরুষের ছিরিছাঁদ ভালো তাদের সকলেই পছন্দ করে। কিন্তু স্ত্রীলোকের আসল সমঝদার হচ্ছে পুরুষ আর পুরুষের হচ্ছে স্ত্রীলোক। একজন সুন্দরী স্ত্রীলোক আরেকজন সুন্দরী স্ত্রীলোকের নিকট একটি সুন্দর রঙিন ফুল ছাড়া আর কিছুই নয়, তাতে নেই কোনো সুগন্ধ। আবার একটি কুশ্রী পুরুষমানুষও একজন সুন্দরী স্ত্রীলোকের বিবেচনায় চমৎকার ফুলের মতোই মনোগ্রাহী হতে পারে, তা যদি তার চেহারায় ও রংএ কোনো বৈশিষ্ট্য না-ও থাকে। ভালবাসার ব্যাপারে দোষ কেবল একজনেরই থাকে না। উভয়েই এই সূক্ষ্ম বৈশিষ্ট্যটি বুঝতে পারে না। দুজনের ভালবাসায় বাস্তবতার তফাত রয়েছে। পুরুষমানুষ যে-চোখে স্ত্রীলোকদের দেখে স্ত্রী পুরুষকে সে-চোখে দেখে না। যার বয়স কম বা যে পুরুষ ধনবতী ও রূপবতী মহিলার ভালবাসা পেয়েছে সেই কেবলমাত্র মেয়েদের ভালবাসার কিছুটা আন্দাজ করতে পারে। কিন্তু বর্ষিয়সী কোনো মহিলা কেন এদের চান। কোনো সন্দেহ নেই যে জোয়ান মানুষের প্রতিই একটু বেশি ঝোঁক দেখান। কিন্তু এর কারণটি শুধুমাত্র এই নয় যে তার রূপ ও যৌবন আছে। বিপরীতে কারণটি একমাত্র এই যে স্ত্রীলোক অবলা, এই জন্য সব সময়েই স্ত্রীলোক এমন একজনের উপর ভরসা রাখতে চায় যে বিপদের সময় তাকে বাঁচাতে পারে। বৃদ্ধদের চেয়ে যুবকরাই শক্তি-সামর্থ্য বেশি রাখে আর সৌন্দর্য তো যৌবনের সাথেই থাকে। আর এই দুটি কারণই একসঙ্গে মিশে স্ত্রীলোকের কামনা অনিবার্য করে তোলে।

সংক্ষেপে পুরুষদের ভালবাসায় থাকে তৃপ্তির চাহিদা আর মেয়েদের ভালবাসায় থাকে তৃপ্তির সাথে নিরাপত্তারও আকাঙ্ক্ষা। যেহেতু কথাটি চালু আছে যে ভালবাসায় কোনো অভিসন্ধি থাকে না আর স্ত্রীলোকের ভালবাসায় এটি বেশি করে চালু তাই তারা এটিকে ঢেকে রাখার চেষ্টা করে। এখানে যে কথাগুলি ব্যাখ্যা করলাম হয়ত-বা কেউ বলবেন পুরুষ বা মেয়েদের ব্যাপারে এমন কোনো পার্থক্যের প্রভাব নেই। তাহলে আমি তা স্বীকার করে নেব আর বলব যে এই-

সব কথাগুলি পুরুষ আর মেয়েলোকের জন্মলগ্ন থেকেই রয়েছে আর সে কারণেই এদের এবিষয়ে আক্কেল থাকারও কোনো প্রয়োজন নেই।

আমি সারাটি জীবন ধরে পরখ করে এইসব ব্যাপারে স্থিরনিশ্চয় হয়েছি আর আমার সাথে যে লোক এবিষয়ে বিবেচনা করবেন তিনিও এতে একমত হতে পারবেন।

আমি প্রায়ই দেখতে পাই যে, স্ত্রীলোক আর মূর্খ পুরুষ এসব কথা ভাবে না! আর এই জন্যই এদের জীবনে অনেক বকবক ঝকঝক করতে হয়।

আমি মনে করি স্ত্রী পুরুষ উভয়েই যদি নিজেদের সীমাবদ্ধতা আর তারা কী চায় তা জানত তবে আর নিজেদের মধ্যে মন কষাকষি হত না, অনেক জিনিসই ঘটত না আর অনেক ব্যাপার দূর হয়ে যেত।

কিন্তু মুশকিলটি এই যে কাউকে কাউকে কথাটি বুঝিয়ে দিতে গেলে হামেশাই জবাব আসে, আরে মশাই, কপালে যা আছে, হবেই। এর মতলব হলো এই যে, যার যা মনে চায় সে তাই করুক, বাধা দিও না। কারো কিছু করা বা না করায় কিছু যায় আসে না, অর্থাৎ বদকর্মের কোনো ফলাফল নেই। যা কিছু হবে তা ভাগ্যের দোষেই হবে, যা কিছু ফলাফল হবে তা করুণাময় খোদার তরফ থেকেই হবে। এইসব অর্বাচীন কথাবার্তার আগের কালে হয়ত-বা কিছু অর্থ ছিল, কেননা তখন দৈবক্রমেই অল্প সময়ের মধ্যে কিছু একটা ঘটত। এই প্রসঙ্গে আমার নবাবী আমলের একটি গল্প মনে আসছে:

নবাবী আমলে পরিবর্তনের কিছু নমুনা প্রায়ই দেখা যেত। লোকের অবস্থার বদল ঘটত আকস্মিকভাবেই।

একদিন হলো কি যে এক সিপাই ছেঁড়া ন্যাতা পরা অবস্থায় মোতিমহলের উঠোনে ঘুমিয়ে পড়েছিল। কপালের লিখন, ভোরের নমাজ পড়ার পর বাদশাহ বেড়াতে বেরিয়েছেন। সেদিন আবার দৈবক্রমে তার সাথে কেউ ছিল না, জানিনে তাঁর মনে কী হয়েছিল, উনি তাকে জাগিয়ে দিলেন। সিপাইটি চোখ ডলতে ডলতে উঠে পড়ল। জাঁহাপনার উপর নজর পড়তেই প্রথমে তো ভয়ানক ঘাবড়ে গেল। পরক্ষণেই সামলে নিয়ে বাদশাহকে তলোয়ারটি উপঢৌকন দিল। তলোয়ারটি ছিল খুব পুরনো, খাপ থেকে খোলা হলো অতি কষ্টে। বাদশাহ নজরানাটি নিয়ে ভালো করে দেখলেন, তারপর নিজের কোমরে সেটি বাঁধলেন। তিনি তাঁর নিজের বিলাতি তলোয়ারখানি কোমরবন্ধ সমেত উপহার দিলেন সিপাইকে। সে তলোয়ারের বাঁট ছিল সোনার আর কোমরবন্ধটিও রত্ন খচিত। এরই মধ্যে এসে গেলেন অযোধ্যার প্রধানমন্ত্রী আলি খান। জাঁহাপনা ঐ সিপাই আর তার তলোয়ারটির প্রশংসা করলেন।

বাদশাহ: ওহে দেখ, সিপাইটির কেমন পোশাক-আশাক আর তলোয়ারটিও কি অপূর্ব ছিল! (তিনি নিজের কোমর থেকে তলোয়ারটি খুলে) নাও, দেখ।

মন্ত্রী : দুনিয়ার মালিক, খোদার করুণা। কিন্তু হুজুরের মতো জহুরী আর মুরুব্বিও তো রয়েছে, এমন লোক আর এমনিধারা জিনিস হুজুর পেয়েছেন।

বাদশাহ : ওহে দেখ, আমিও এমন কিছু খারাপ জিনিস ওকে দিইনি।

মন্ত্রী : হুজুরের তলোয়ার আর খারাপ কী।

বাদশাহ : কিন্তু জোয়ানটির পোশাক-আশাক ভালো না। (এ সময়ের ভিতরেই সভাসদগণ, চাকরবাকর, দণ্ডধর, শস্ত্রধর সবাই উপস্থিত হয়েছে, সভাটি কেমন জমে উঠেছে)।

মন্ত্রী : ভালো পোশাক দেওয়ার হুকুম হয়েছে।

বাদশাহ : বেশ, আমার কাপড়-চোপড় একে পরিয়ে দেখা যাক।

এই হুকুমটি পাওয়ার সাথে সাথেই পোশাকের বাকসটি হাতে হাতে এসে গেল। বাদশাহ নিজের পোশাক ছেড়ে সিপাইটিকে দিলেন পরতে। আর দিলেন অঙ্গাভরণ। (সিপাইটি কাপড় পরার পর) বাদশাহ হাঁা, এবার দেখ।

মন্ত্রী : বাস্তবিকই চেহারা বদলে গেছে। মোসাহেবরা আর অন্যরা প্রশংসা করতে লাগল। বাদশাহ এখানে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর গাড়ি এলে হাওয়া খেতে বেরিয়ে পড়লেন।

সিপাই মহানন্দে ঘরে ফিরল। মহাজন, দালাল রত্ন ব্যবসায়ীরা সব তার পিছন পিছন চলল, এরা সব বলাবলি করতে থাকল, পঞ্চাশ/ষাট হাজার টাকা দাম হবে।

সিপাইয়ের অবস্থাটি শুনুন : ও কোথাও ভালোমানুষদের দলে একজন তিন টাকা মাস মাইনের সিপাই ছিল। রাতে খাওয়ার সময় বিবির সাথে ঝগড়া করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে খোদা জানেন, সারা রাত কোথায় ঘুরে মরেছে। ভোরবেলায় মোতিমহলের পাশে ক্লান্ত হয়ে বসে পড়ে। শেষে আসে ঘুম। সকালে ভাগ্যদেবী দিল ওকে ঘুম ভাঙিয়ে, আর তারপর এই অত্যাশ্চর্য ঘটনা। নিমেষেই সে গরিব থেকে ধনী হয়ে গেল।

এই ধরনের ঘটনা হামেশাই ঘটত নবাবী আমলে। আর যেখানে সরকারি শাসনরশি আর অর্থ ভাণ্ডার একজনের হাতে, যিনি আইনকানুনের উপরে, সে আমলে এরকমটি হওয়াই স্বাভাবিক। তিনি দেশকে নিজের জমিদারি ভাবেন আর সরকারি অর্থকে ভাবেন নিজের তহবিল।

ইংরেজ আমলে এধরনের অপব্যয়ের কোনো সুযোগ নেই। কেউ যদি বিনা কারণে বিনা যুক্তিতে কাউকে অর্থ দেয় তো তাকে একরকম অপব্যয়ই বলা চলে। যে রাজত্বে সুলতান থেকে ফকির পর্যন্ত একই আইনের শৃঙ্খলে বাঁধা সেখানে এসব চলে না। কিন্তু এই গুণটি না থাকলে কোনো কাজই হবে না, এই কালে ভাগ্য হয়ে পড়েছে শক্তিহীন, যা কিছু হচ্ছে তা হচ্ছে তদবিরের জোরেই।

নবাব ছব্বন সাহেবের অবস্থাটি শুনুন। (তিনি আমার আত্মজীবনীর পৃষ্ঠা

থেকে বাদ গিয়েছিলেন)। আসলে তিনি নদীতে ডুবে মরতেই গিয়েছিলেন। উপরে আর ভেসে ওঠার ইচ্ছে না নিয়েই তিনি ডুব দিয়েছিলেন। কিন্তু প্রাণ বড়ই প্রিয়। কিছুক্ষণ জলের নীচে থেকে দম বন্ধ হয়ে আসার উপক্রম হলে মনে হলো এবার উপরে উঠে একটু নিশ্বাস নেওয়া যাক। জলের উপর ভেসে উঠে তিনি স্বতঃস্ফূর্তভাবেই সাঁতার কাটতে লাগলেন। আবার মরার ইচ্ছে নিয়ে ডুব দিলেন। আবার ওই একই কারণে ভেসে উঠলেন। শেষে এই চেষ্টা করতে করতে তিনি ছত্রমঞ্জিল পর্যন্ত ভেসে এলেন। দৈবক্রমে সেই সময়ে বর্তমানে প্রয়াত আলি অহদ বাহাদুর নিজের কয়েকজন মোসাহেবের সাথে বজরায় নদীতে ভ্রমণ করছিলেন। ওঁর নজরে পড়তেই ভাবলেন কেউ ডুবে যাচ্ছে। মাঝি-মাল্লাদের হুকুম দিলেন শিগগির জল থেকে তুলে আনতে। উনি ওদের বাধা দেবার অনেক চেষ্টা করলেন। মাঝিরা ঘাবড়ে গেল। শেষে জোর জবরদস্তি করে নদীর তীরে নিয়ে এল। মির্জা আলি অহদ ওঁকে তাঁর সামনে ডেকে পাঠালেন। কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর বুঝলেন যে লোকটি সম্ভ্রান্তবংশীয়। ওকে কাপড়-চোপড় পরিয়ে নিজের প্রাসাদে নিয়ে এলেন।

ছব্বন সাহেব ছিলেন সুপুরুষ, সভ্যভব্য ও আদবকায়দায় অভিজ্ঞ আর কিছুটা শিক্ষিতও। আবার রসিকও ছিলেন। বলতে-কি সবরকমেই শাহজাদার সঙ্গী হওয়ার উপযুক্ত ছিলেন তিনি। খুব শিগগির পরিষদের দলে ভর্তি হয়ে গেলেন একটি নির্দিষ্ট মাসোহারায়। উপস্থিতমতো কিছু অত্যাবশ্যক জিনিসপত্র কেনার জন্যও কিছু সাহায্য মিলল। চাকর-বাকর, পালকি, সবই সরকারিভাবে দেওয়া হলো। আগের চেয়েও এখন তাঁর ঠাটবাট বেড়ে গেল।

এবার যখন তিনি চকের দিকে বেরলেন তখন তো আরও জৌলুষ দেখা গেল। নবাব ছব্বন সাহেব হাতিতে সওয়ার হয়েছেন। পঞ্চাশজন বরকন্দাজ আগে আগে দৌড়চ্ছে। বিসমিল্লা আর আমি দুজনেই স্বচক্ষে দেখলাম, প্রথমে তো বিশ্বাসই হয়নি। মিঞা মখদুম বখশও পিছনে পিছনে যাচ্ছিলেন। তাঁকে ইশারায় ডেকে এনে বর্তমান অবস্থাটি জেনে নিলাম।

এরপর তাঁর কাকার সাথেও বিবাদ মিটে গেল। তাঁর বিয়েও হয়ে গেল। বিয়েতে আমাদেরও নিমন্ত্রণ হয়। খানুম সাহেবাকে একজোড়া উৎকৃষ্ট শাল আর রুমাল দিলেন। কিন্তু সেইদিন থেকে আমাদের ঘরে আর কখনও আসেননি বা বিসমিল্লার সাথে কোনো ভাবভালবাসা রাখেননি।

সংক্ষেপে নবাবী আমলে এমন সব আকস্মিক ঘটনা ঘটত, এখন ইংরেজ আমলে সেসব আর কোথায়! সে দিন চলে গেছে। বিশস্ত লোক এখন নিঃস্ব হয়ে পড়েছে। শুনে এসেছি যে টাকাকড়ি অন্ধ। এখন মনে হচ্ছে যেন কী একটি অজানা জ্ঞান তার চোখ খুলে দিয়েছে আর তার ফলে কে উপযুক্ত বা অনুপযুক্ত সে বিবেচনা এসে গেছে।

নবাবী আমলে যে নির্বোধ, অশিক্ষিত আর যাদের অক্ষর পরিচয় পর্যন্ত ছিল না তারা উঁচু পদে নিযুক্ত হত। আমি ভাবছি কাজ চলত কী করে। খোজাদের উপর ছিল অশ্বারোহী আর পদাতিক সেনাদের ভার—ভেবে দেখুন তো কথাটি হাসির কিনা?

আমি ভাগ্য আর চেষ্টা করার বিষয়টির মধ্যে বহুদিন ধরে ঘুরপাক খেয়েছি। শেষে বুঝতে পেরেছি এই 'ভাগ্য' শব্দটিকে লোক যে সম্পর্কে ব্যবহার করে সেটি নিতান্তই ধোঁকা। খোদা শুরু থেকেই আমাদের বিষয়ে সব জানেন একথায় আমার কোনো সন্দেহ নেই। এতে অবিশ্বাসীরা বিধর্মী। কিন্তু মানুষ, খোদা রক্ষে করুন, নিজেদের তাবৎ দুষ্কর্মগুলিকে ভাগ্যের উপর ঠেলে দেয়। তাতে খোদার ক্ষমতার উপর অপবাদ আসে। এটি নিতান্তই পাপ।

আফসোস হচ্ছে যেসব কথাগুলি এখন আমি বুঝতে পেরেছি সেসব কথা যদি শুরুতেই বুঝতাম তবে ঘটনাটি হত অন্যরকম। কিন্তু সে সময়ে আমাকে বুঝিয়ে দেবারও কেউ ছিল না আর নিজেরও এমন ক্ষমতা ছিল না যে নিজেই সব বুঝতে পারব। মৌলবী সাহেব যে দুটি অক্ষর পড়িয়ে দিয়েছিলেন তাতে আমার অনেক উপকার হয়েছিল। (খোদা তার মঙ্গল করুন) সেকালে আমি এর মর্যাদা দিইনি। টাকা-পয়সার সাচ্ছল্য আর শরীরের আরাম করা ছাড়া আর কোনো কাজ ছিল না। এছাড়াও আমার পৃষ্ঠপোষকরা ছিলেন এমনই যে কোনো ফুরসৎ মিলত না। যখন ঐসব পৃষ্ঠপোষক একে একে খসে পড়তে শুরু করেন তখনই কিছুটা অবসর আমার মিলল। আর এই সময়টিতেই আমার পড়ার ইচ্ছেটি বাড়ে। কেননা এছাড়া আমার আর অন্য কোনো বিষয়ে মনোনিবেশ করার উপায় ছিল না।

সত্যি বলছি যদি এই আগ্রহটা না থাকত তবে আমি বাঁচতাম না। যৌবন হারিয়ে যাওয়া আর পুরনো পৃষ্ঠপোষকদের দুঃখ কবেই শেষ করে ফেলত। কিছুদিন আমি গল্প কাহিনীতে মন ঢেলে দিলাম। একদিন পুরনো বইগুলি রোদে দেবার সময় দেখি 'গুলিস্তাঁ' বইখানি এগুলির মধ্যে রয়েছে। এখানি মৌলবী সাহেব আমাকে পড়িয়েছিলেন। আমি বইখানির পাতা ওলটাতে থাকলাম। প্রথমে আমি বইখানি পছন্দ করিনি। একে তো এই কারণে যে তখন আমার শিক্ষার সবে শুরু. পাঠ বড় কঠিন মনে হয়েছিল। তারপর বুদ্ধি ছিল না তাই বুঝতে পারিনি। এখন সে অসুবিধে দূর হয়ে গিয়েছিল তাই মন দিয়ে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কয়েকবারই পড়লাম। মনে দাগ কেটে গেল। তারপর জনৈক সাহেবের কাছে শুনি 'একলাখ-ই নাসিরী'র প্রশংসা। বইটি পড়ার ইচ্ছে হওয়ায় তাঁর কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে পড়ে ফেললাম। প্রকৃতপক্ষে এর উদ্দেশ্যটি বোঝা ছিল বেশ কঠিন। আরবি শব্দ ছিল এতে প্রচুর। তাই এটি বুঝতে বেশ বেগ পেতে হয়। কিন্তু একটু একটু করে অনেকদিন ধরে পড়ে বইখানি শেষ করি।

তারপর 'দানেশনামা গিয়াস মনসুর' নওল কিশোরের প্রেসে ছাপা হয়। এটিও পড়লাম, পরে একবার 'সগরা' ও 'কুবরা' পড়ি, আর যেসব জায়গা বুঝতে পারিনি সেগুলিতে অন্যের সাহায্য নিই।

এইসব বই পড়ে আমার মনে হলো যেন দুনিয়ার সব রহস্য আমার কাছে উন্মুক্ত হয়ে যাচ্ছে। প্রতিটি কথা বুঝতে পারলাম। এরপর এই ধরনের উর্দু, ফারসি অনেক বই পড়েছি। এতে আমার মন খুব সমৃদ্ধ হতে থাকে। এর পর আনোয়ার খাকানির 'খোদার প্রশস্তি', কশিদা, কিছু কিছু পড়ি। কিন্তু মিথ্যে খোশামোদের কথা এখন আর আমার ভালো লাগে না। তাই সেগুলি আলমারিতে বন্ধ করে রেখে দিলাম। সম্প্রতি কিছু কিছু খবরের কাগজ আমার কাছে আসে। এগুলি দেখে দুনিয়ার অবস্থা বুঝতে পারছি। গান গেয়ে আমি যে পয়সা রোজগার করি তাতে এখানে আমার জীবন চলে যাবে। ওখানকার মালিক আল্লা। আমি অনেকদিনই অকপটে সব ত্যাগ করেছি। আর সাধ্যমত রোজা রাখি, নমাজ পড়ি। বেশ্যার মতো থাকি বটে তো খোদা চাইলে মারতে পারেন, চাইলে রাখতেও পারেন। আমি তো পর্দায় ঢাকা থেকে যেতে পারব না। কিন্তু পর্দানশিনদের জন্য খোদার আশিস চাইব, তাঁরা স্বামী-সংসার নিয়ে সুখে থাকুন আর দুনিয়ায় থাকা পর্যন্ত পর্দার আড়ালে থাকুন।

এই সুযোগে আমি আমার সমপেশার সাথীদের দিকে চেয়ে একটি সৎপরামর্শ দিতে চাই, তারা সেগুলি নিজেদের মনের মধ্যে গেঁথে নিক। ওরে নির্বোধ বেশ্যা, কখনও এই মিথ্যে আশায় ভুলিসনে যে কেউ তোকে প্রকৃতই ভালবাসতে পারে। প্রেমিক, তোর জন্য যে প্রাণ দিচ্ছে, কিছুদিনের মধ্যেই তার চলাফেরায় বোঝা যাবে তা কতখানি ঠিক। সে কখনই তোকে নিয়ে থাকতে পারে না আর তা থাকার যোগ্যও তুই নস। সত্যিকারের প্রেমের স্বাদ তারই ন্যায্য প্রাপ্য যে খাঁটি স্ত্রীলোক একজনের মুখ দেখে আর অন্যের মুখ দেখে না। তোর মতো বাজারি মেয়েমানুষকে এরকম পুরস্কার দেওয়ার ক্ষমতা খোদার নেই।

যাক, আমার কপালে যা ছিল তা কেটে গেছে। এখন কেবল জীবন কবে যাবে তার দিন গুনছি। যতদিন পৃথিবীর হাওয়া খাওয়ার কথা ততদিন খেয়ে যাচ্ছি। আমার মন আমি বেশ বুঝে নিয়েছি। আমার সব আশাই পূরণ হয়েছে। অবশ্য এই আশা এমনই খারাপ জিনিস যে দেহে প্রাণ থাকতে কাউকে ছাড়তে চায় না। আমার বিশ্বাস আমার জীবনী থেকে কিছু-না কিছু উপকার হবেই, এই পঙক্তিটি দিয়ে আমার এই জীবনালেখ্যটি শেষ করছি। আমি সবারই করুণাপ্রার্থী :

হয়ত আমার মৃত্যুর দিন এসেছে ঘনিয়ে
হে জীবন, মন পুরোপুরি তৃপ্ত, সব আশা দিয়েছ মিটিয়ে।